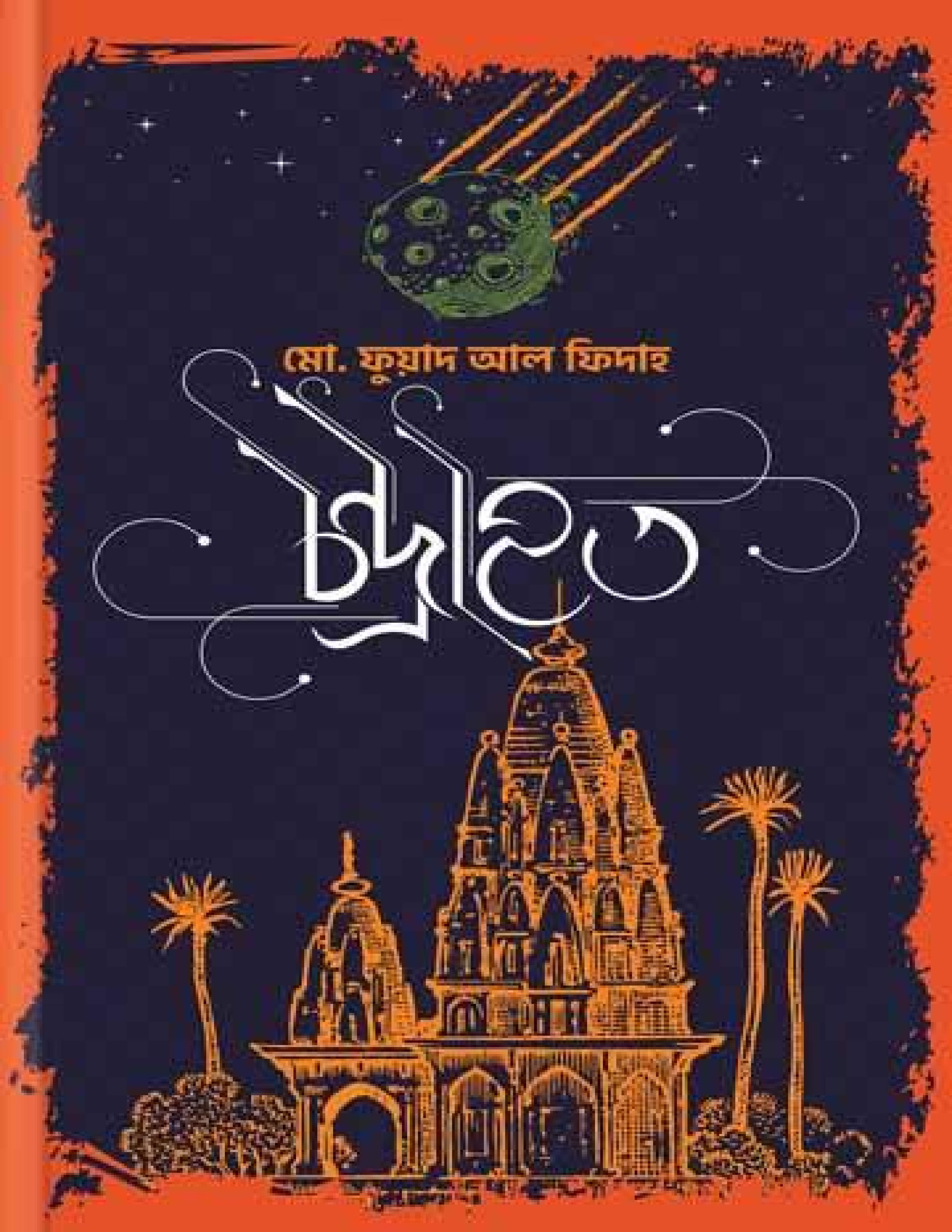
মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

চন্দ্রাহত



চন্দ্রাহত

মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

চন্দ্রাহত

-মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

ই-বুক প্রকাশক
বইঘর
ই. বি. সল্যুশন্স লিমিটেড

প্রথম বইঘর সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ২০২২

উৎসর্গ

শরীফ মোহাম্মাদ–
আমার পাঠাভ্যাস বদলে দেওয়ার জন্য এ ব্যক্তিই দায়ী

তৌফির হাসান উর রাকিব–
লেখালেখিকে নেশা বানাবার দোষটা আপনার ঘাড়েই পড়বে

***

In my years fighting crime, I've learned one truth…that every villain is the hero of his own story.

–Batman, Injustice 2

ভূমিকা

মৌলিক হিসাবে তৃতীয় বই লেখা শেষ হলো। আলহামদুলিল্লাহ্।

উপন্যাস নাকি এমন এক সাহিত্য কর্ম, যেটাকে নিয়ে লেখকের মনে খুঁতখুঁতানি রয়েই যায়। সম্ভবত বিশ্বের সব লেখকেরই হয় এমনটা। বারবার মনে হয়–কিছু একটা নেই। কিছু একটা যোগ করলে আরও ভালো হতো!

তিন নম্বর বই হলেও, লেখক হিসেবে নিজেকে বড়ো নবীন মনে করি। যা-ই লিখি না কেন, পরে পড়লে মনে হয় ছাইপাঁশ। সেই ছাইপাঁশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অংশটুকু নিয়ে এই বই। ছাইপাঁশই আছে না কিছু উন্নতি হয়েছে, তা বিচারের ভার পাঠকের।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অংশ অনেক বড়ো হওয়া উচিত। কিন্তু করব না, আমি আপনাদের বা তোমাদের কাছে ঋণী হয়েই থাকতে চাই।

বইটির বর্ণিত কাহিনি আমার কল্পনাপ্রসূত। পুরোটাকে একটা পরাবাস্তব জগৎ হিসেবে ধরে নিলেই ভালো হবে। বিশেষ করে পৌরাণিক অংশগুলো কখনও ঘটেনি, সেগুলোর এক বিন্দুও সত্যি নয়, আর কিছু ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য।

ডা. মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ
ঢাকা, ২০১৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অবর্ণনীয় এক অনুভূতি সঙ্গে নিয়ে লিখছি এই লাইনগুলো।

কেন?

কারণ বহুদিন হলো কেবল মনের আনন্দের খোরাক হিসেবে বই পড়াটাকে ভাবতে যেন ভুলেই গিয়েছি!

সে কারণেই চন্দ্রাহতের মতো প্রায় অখ্যাত বইয়ের নতুন সংস্করণ অবাক করার মতো বিষয়ই বটে। তবে তার জন্য ধন্যবাদ এবং পুরোটা ক্রেডিট প্রাপ্য পাঠকদের।

কৃতজ্ঞতা পাঠকদের প্রতি...আশা করি ভবিষ্যতেও সঙ্গে থাকবেন তারা।

ডা. মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ
কক্সবাজার, ২০২০

পুরাণ থেকে নেওয়া

পুরাণকে কি ইতিহাস বলা যায়?

হয়তো পুরোপুরি যায় না। কেননা এমন অনেক পৌরাণিক কাহিনিই আমাদের সামনে আসে, যা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে মেনে নিতে বড়ো কষ্ট হয়। যেখানে মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার হলো হেলিকপ্টার, সেখানে আজ থেকে হাজার-হাজার বছর আগে রাবণের পুষ্পক রথ অবিশ্বাসের জন্ম দেয় বইকি! যেখানে আজও আমরা বিষাক্ত অনেক সাপের বিষ কাটাবার মতো ওষুধ খুঁজে পাইনি, সেখানে বেহুলা-লখিন্দরের গল্প কার না মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে?

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে যদি দেখা যায়, তাহলে সম্ভবত এক অস্বাভাবিক ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে। কেন যেন একই রকম ঘটনা, একই নাটকের কুশীলব, নানা নামে আর নানা আকৃতিতে বিভিন্ন দেশের পুরাণে ঘোরাফেরা করছে!

গ্রিক পুরাণের একটা বহুল প্রচলিত গল্পের কথা ধরা যাক: পার্সিয়াস আর অ্যান্ড্রোমিডার গল্প। ইথিয়োপিয়ার রানি, ক্যাসিয়োপিয়ার মেয়ে ছিলেন অ্যান্ড্রোমিডা। মেয়ের রূপের গর্বে মাটিতে পা পড়ত না রানির। এতটাই গর্বিত ছিলেন যে একদিন বলেই ফেললেন, ‘আমার মেয়ে জলপরীদের চাইতেও সুন্দর।’

তা জলপরীরা এই কথা মেনে নিলে তো! সাথে-সাথে গিয়ে তারা বিচার দেন দেবতা পোসাইডনকে। নিজের আশ্রিতাদের অপমানের কথা শুনে পোসাইডনও খ্যাপে বোম। পাঠিয়ে দেন বিরাট এক সাপকে, যে সাপের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে ইথিয়োপিয়া।

অ্যান্ড্রোমিডার বাবা, রাজা সিফিয়াস, চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিউসের কাছে এর প্রতিকার চেয়ে ফিরলেন আরও কালো মুখ নিয়ে। দেবরাজ জানিয়ে দিয়েছেন, এর প্রতিকার মাত্র একটা: অ্যান্ড্রোমিডাকে বিসর্জন দেওয়া। নির্দিষ্ট দিনে তা-ই করতে হলো রাজা-রানিকে। আদরের মেয়েকে সাপের খাবার হবার জন্য ফেলে আসা হলো সমুদ্রের ধারে। তারপর? তারপর অনেক গল্প। সংক্ষিপ্ত হলো এই যে, পার্সিয়াস এসে হত্যা করেন সাপটিকে, উদ্ধার পান অ্যান্ড্রোমিডা।

এবার জাপানের পুরাণের দিকে নজর দেওয়া যাক। এই গল্প ওরোচি আর দেবতা শুশানোর। শুশানোকে কোনো এক কারণে নির্বাসন দেওয়া হয় স্বর্গ থেকে। অনেক পথ ঘুরে তিনি এসে পৌঁছান হাই নদী, যা কি না তখন বিশাল বড়ো এক নদী ছিল, তার সামনে। দেখতে পান, একজোড়া নারী-পুরুষ তাদের মাঝখানে এক মেয়েকে নিয়ে কান্না করছেন। কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, হিংস্র সাপ ওরোচির মুখের গ্রাস হয়েছে তার সাত মেয়ে। এই অষ্টম মেয়েকেও তার হাতেই তুলে দিতে হবে। শুশানো মুখোমুখি হলেন আট মাথা আর আট লেজ বিশিষ্ট ওরোচির। মুক্ত করে আনলেন মেয়েটিকে। নাম শুনবেন তার? ইনাডা।

পদ্ধতিতে বেমিল থাকলেও, শুরু আর শেষের মাঝে অনেকটা মিল কি খুঁজে পাওয়া যায় না? হয়তো আসলেই ছিল এমন কোনো সাপ, ছিল এমন কোনো বীর আর এমন কোনো নারী।

কে বলতে পারে?

নানা দেশের পুরাণের মাঝে এমন মিল আরও অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন মিশরে রা আর অ্যাপোফিসের যুদ্ধের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ব্যবিলনের মারদুক আর টিয়ামাতের যুদ্ধের, গ্রিক পুরাণে জিউসের সাথে টাইফুনের, ক্যানানাইটদের দেবতা বা'লের সাথে ইয়ামের, হিট্টিদের তারহাণ্টের সাথে ইলুয়ানকা অথবা ভারতীয়

পুরাণে ইন্দ্রের সাথে ভিত্রের। মজার ব্যাপার হলো, পরবর্তীতে গ্রিকরা বা'ল আর জিউস একই অস্তিত্ব বলে শিকার করে নেন। আবার জিউস, ইন্দ্র, তারহান্ত আর বা'ল চারজনই ছিলেন হয় বায়ু, বজ্র অথবা ঝড়ের দেবতা! কাকতালীয়? হতেও পারে।

পুরাণ ঘাটলে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো প্রতিটা পুরাণে সাপ বা সর্প-দেবতার প্রবল উপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে এই সর্প-দেবতা বা দেবীকে দেখানো হয় উপকারী হিসেবে: যেমন মায়ান কুলকুলাকান, অ্যাজটেক কেটজালকোয়াটাল বা ভারতীয় বাসুকি। অনেক ক্ষেত্রে এরা ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করেন: যেমন নর্ডিক জরমুনগান্ড, মিশরের অ্যাপোফিস, জাপানে ওরোচি। কিছু-কিছু জায়গায় আবার তারা আছেন ভিন্ন এক রূপে, যারা ভক্তদের জন্য সব কিছু করতে রাজি...যাদের ওপর ক্ষিপ্ত হোন, তাদের সর্বনাশেও যাদের অরুচি নেই।

এমন দুজন দেবীর নাম এখন উল্লেখ করব, যাদের প্রার্থনা-স্থলের মাঝে হাজার-হাজার মাইলের পার্থক্য থাকলেও, বর্ণনা আর কার্যপ্রণালীর মাঝে রয়েছে বিশাল মিল। একজন মিশরের সর্প-দেবী ওয়াজেত বা ওয়াজেঠথ, আর অন্যজন আমাদের উপমহাদেশেরই মনসা।

ওয়াজেঠথ আর মনসা দেবীর মাঝে সবচাইতে বড়ো মিল হলো, তারা দুজনেই সর্প-দেবী। দুজনেই এক হিসেবে অনার্য, অর্থাৎ প্রথম থেকেই দেবী হিসেবে সম্মান পাননি। ওয়াজেঠথ ছিলেন 'পের-ওয়াজেঠথ'-এর স্থানীয় দেবী। মূর্তিগুলোতে তাকে দেখানো হতো কোবরার আদলে। কখনও-কখনও দুই মাথাধারী সাপ, আবার কখনও সর্পিল দেহ অথচ মানবীর চেহারায়। মাথায় থাকে ইউরেয়াস বা সর্প-তাজ, যা পরবর্তীতে মিশরের ফারাওদের মাথাতেও শোভা পায়। নিজের ভক্তদের জন্য একেবারে অন্তঃপ্রাণ এই দেবী। আবার যারা

তাকে অমান্য করে, তাদের কপালে জোটে দেবীর তীব্র প্রতিশোধ। প্রতি বছর জুন মাসের শেষের দিকে আর মার্চের মাঝামাঝিতে এই দেবীর পুজো করার চল ছিল মিশরে।

আশ্চর্য হলেও সত্য, সবচেয়ে বিখ্যাত মনসা পূজার মুহূর্ত নাগ পঞ্চমী তিথিতে। হিন্দু পঞ্জিকার সাথে মিলিয়ে দেখা যায়, এই সময়টা পড়ে জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে!

দেবী ওয়াজেঠথের মতো, দেবী মনসাও কিন্তু লৌকিক দেবী। সাধারণত তার পূজা করা হয় সীজ বৃক্ষের শাখায়, ঘটে বা সর্প-অঙ্কিত ঝাঁপিতে। তবে মূর্তি পূজার অনেক উদাহরণও প্রচলিত আছে। অসম রাজ্য এবং বাংলাদেশের নিচু বর্ণের হিন্দুদের মাঝে এখনও তার পূজা দেখা যায়। মূর্তিতে তিনি এক চোখ কানা রমণী...যার মাথার তাজ হয়েছে সাপের ফণা।

দেবী মনসার জন্ম কীভাবে হয়েছে, তা নিয়ে রয়েছে অনেক মতবাদ। তবে জন্ম যেভাবেই হোক না কেন, প্রথম থেকেই তাকে দেবত্ব দেওয়া হয়নি। বড়ো হবার পর জানতে পারেন, একমাত্র মানুষের মাঝে পূজা শুরু হলেই তিনি দেবত্ব অর্জন করবেন। চাঁদ সওদাগরকে মনে ধরে তার, ঠিক করেন এর হাতেই পূজা নিবেন। অথচ চাঁদ সওদাগর শিবের ভক্ত ছিল বলে একজন দেবীকে পূজা দিতে অস্বীকার করে। এর ফল হিসেবে একে-একে সওদাগরের ছয় পুত্রকে ডুবিয়ে বা সাপে কাটিয়ে মেরে ফেলেন মনসা। সর্বশেষ সন্তান লখিন্দরও তার শিকারে পরিণত হয়। কিন্তু লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলার তপস্যায় তুষ্ট হওয়া শিবের আদেশে, আর অবশেষে চাঁদ সওদাগর তাকে পূজা করতে নিমরাজি হওয়ায় তিনি লখিন্দরসহ সওদাগরের সব পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেন। এ নিয়ে পরবর্তীতে লেখা হয়েছে বিখ্যাত ‘মনসা মঙ্গলকাব্য’ যা ইলিয়াড বা অডিসির চাইতে কোনো অংশেই কম উপভোগ্য নয়।

যাই হোক, মনসা দেবীর মাঝেও দেখা যায় ওয়াজেঠথের মতো ভক্তদের প্রতি অনুরাগ আর অভক্তদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। মনসা দেবীও প্রথমে উঁচু তবকার দেব-দেবীদের মাঝে আসন পাননি। আস্তে-আস্তে সেটা তাকে অর্জন করে নিতে হয়।

ওহ, আরেকটা কথা–মনসা ছিলেন সাপ, বসন্ত থেকে আরোগ্য, প্রজননের দেবী। আর ওয়াজেঠথ? তিনি ছিলেন সাপ, রাজাদের সুরক্ষাদাতা, প্রজনন ও রোগ থেকে আরোগ্যের দেবী!

কে বলতে পারে, হয়তো প্রাচীন কালের ওয়াজেঠথ দেবীই ভারতে এসে রূপধারণ করেছেন মনসার। অথবা মনসা মিশরে গিয়ে রূপ ধারণ করেছেন ওয়াজেঠথের!

যদি টাইফুনের ভয়ে লেজ গুটিয়ে মিশরে পালিয়ে যেতে পারেন গ্রিক দেবতারা, চেহারা লুকিয়ে ডায়োনিয়াস হয়ে যেতে পারেন ওসাইরিস বা অ্যাপোলো হয়ে যেতে পারেন হোরাস, তাহলে...?

কে বলতে পারে?

হয়তো বা...

পুরোভাষ

কে বিশ্বাস করবে যে এই মুহূর্তে শিকদারের দুই হাঁটু বাড়ি খাচ্ছে?

তাও আবার ভয়ে!

যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন, উত্তরটা নিঃসন্দেহে না-ই হবে। অথচ অবিশ্বাস্য ঘটনাটা এখন...এই মুহূর্তেই ঘটছে! সারা দেশ যে অপরাধীর নাম শুনলে কাঁপে; পুলিশের সদস্যরা যার নাম শুনলে কিছুই শুনিনি ভাব করে এড়িয়ে চলে, সেই শিকদারের পা এখন ঠক-ঠক করে কাঁপছে! বেচারার বয়স যদি খুব কম বা খুব বেশি হতো, তাহলে হয়তো প্যান্টই ভিজিয়ে ফেলত...

আবছা আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে ঘরটাকে। বছর পাঁচেক আগের কথা, বাংলাদেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডের ত্রাস, ডন ওয়াসা আনু পুলিশের হাতে মারা যাবার পর, অপরাধ জগতে সৃষ্টি হয় শূন্যতার। সেই শূন্যতা পূরণের জন্য উদগ্রীব ছিল অনেকেই। অন্যান্য দেশ যেমন মিয়ানমার, ভারত আর দুবাইয়ের মাফিয়া বসদের নজরও পড়ে এই দেশে। কিন্তু না, তারা কেউ সফল হতে পারেনি। সবাইকে হারিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে অপরাধ-জগতের প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় একটা দল–অহিংশ। গুন্ডা দলের দারুণ নামই বটে! সেই দলের প্রধান এনফোর্সার এই শিকদার। যদিও সেই সম্পর্কটা খুব কম মানুষই জানে। সবার ধারণা, শিকদার নিজের যোগ্যতাতেই আসীন হয়েছে ডনের আসনে।

গলির গুন্ডা ছিল লোকটা, তবে নিজ দলের সবাই ছিল ‘শিকদার ভাই’ বলতে পাগল। হঠাৎ একদিন ছিনতাইয়ের দায়ে গ্রেফতার হয় সে। সেই সাথে অভিযোগ ছিল–ঘটনার শিকার পালাবার চেষ্টা করলে

বেচারাকে ছুরিকাঘাতও করেছে! অথচ এই কাজটা ওর ছিল না! নকল কেস যে সত্যি কেসের চাইতে বেশি শক্ত হয়–সেটা প্রমাণ করতেই যেন ছয় বছরের সাজা হয়ে গেল শিকদারের। দলের ছোটো ভাইদের মাঝে অনেকেই চেয়েছিল, নিজের ঘাড়ে দায় তুলে নিতে–শিকদারকে এতটাই ভালোবাসত তারা। কিন্তু শিকদার তা করতে দেয়নি।

জেলেই একদিন এক উকিল এসে দেখা করে ওর সাথে। সাদা-কালো ডোরাকাটা পোশাকটা ততদিনে গায়ে কুটকুটানির জন্ম দিয়েছে। গালে কয়েক সপ্তাহের না কামানো দাড়ি, দুশ্চিন্তায় চোখ বসে গিয়েছে কোটরে, গায়ের বোঁটকা গন্ধে পাশে থাকা দায়। সেদিন অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল জেলখানায়। দেখা করার কক্ষে অবস্থিত টেবিলের এক পাশে বসে ছিল নোংরা শিকদার, আর অন্য পাশে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা উকিল।

প্রস্তাবটা দিতে খুব বেশি সময় নেয়নি কৌঁসুলি। শিকদার চেয়ারে বসতে না বসতেই বলে দিয়েছিল। ওর বিরুদ্ধে করা রায়ের ব্যাপারে উচ্চতর আদালতে আপিল করা হবে। যেভাবেই হোক, খালাস করে নিয়ে আসা হবে ওকে।

'বিনিময়ে আমাকে কী করতে হবে?' প্রস্তাবটা যে ওর মনে নতুন করে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে, তা কণ্ঠে প্রকাশ না করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল শিকদার।

'এখন যা করছেন, তাই। আইনের বিপক্ষে অবস্থান করা। তবে–'

'তবে কী?'

'এখন আপনি সব কিছু করেন নিজের বুদ্ধিতে। যদি রাজি হোন, তাহলে আপনাকে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলতে হবে আমাদের সব আদেশ।'

‘আমাদের বলতে?’ জানতে চেয়েছিল শিকদার।

‘রাজি হলে আপনাকে সবই জানানো হবে, আর যদি রাজি না হবার ভুল সিদ্ধান্তটা নেন...’ শ্রাগ করেছিল উকিল।

‘ধরুন আমি আপাতত রাজি হলাম; কিন্তু পরবর্তী প্রতিজ্ঞা রাখলাম না, তাহলে?’

উত্তরে কেবল মুচকি হেসেছিলেন উকিল। সেই হাসিই উত্তর হিসেবে ছিল যথেষ্ট। আর কিছু দরকার হয়নি শিকদারের। বুঝে গিয়েছিল, প্রতিজ্ঞা না রাখাটা ওর ইচ্ছার ওপর। কিন্তু যদি না রাখে, তাহলে জীবনের ওপর আর তার কোনো অধিকার থাকবে না।

পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহ যেন চোখের পলকে কেটে গেল। কোত্থেকে নতুন-নতুন সাক্ষী এসে উদয় হলো! শিকদারের পক্ষে একের-পর-এক সাক্ষ্য দিয়ে গেল ওরা। নতুন প্রমাণে জানা গেল, ও সেদিন ঢাকাতেই ছিল না! অবশ্য এই দাবিটা প্রথমবারেও করেছিল ওর উকিল, প্রমাণ করতে পারেনি। এবার পারল। বেকসুর খালাস হলো শিকদার।

জেল থেকে বেরিয়েই দেখতে পেয়েছিল সেই কেতাদুরস্ত উকিলকে, আনমনে সিগারেট খাচ্ছিল লোকটা। ভাবখানা এমন যেন শিকদারকে দেখতে পায়নি। নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়েছিল ও।

‘এটা রাখুন,’ একটা মোবাইল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওর হাতে। ‘আমার বস এটার সাহায্যে আপনাকে সব নির্দেশ দেবেন। খুব দরকার না হলে এই নাম্বারে ফোন করবেন না অথবা দেখা করার চেষ্টা করবেন না। আর এই হলো আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর। বিশ কোটি টাকা দেওয়া আছে। সামনে আরও দেওয়া হবে। ওহ হ্যাঁ, জরুরি কিছু হলে স্যার নিজেই আপনাকে দেখা করতে বলবেন। কোথায়, সেটা তিনিই জানিয়ে দেবেন।’

এ কথাগুলো বলেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল লোকটা।

কয়েক মাসের মাঝেই দেখা গেল, শিকদার ঢাকার অপরাধ জগতের প্রায় প্রতিটা স্তরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। নেতা হিসেবে শিকদারকে যথেষ্ট ক্যারিশম্যাটিক বলা চলে। তাই দলের কর্মীরাও অন্তঃপ্রাণ।

ক্ষুরধার মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া বুদ্ধি, অগণিত টাকা আর নিবেদিত কর্মী–আন্ডারওয়ার্ল্ড কেন, চাইলে দেশও দখল করে নিতে পারত শিকদার।

তবে সেই মস্তিষ্কের মালিকের সাথে দেখা হয়েছে হাতে গোনা চারবার কী পাঁচবার। কোনোবারই চেহারা দেখার সুযোগ হয়নি ওর। কণ্ঠও যে বিকৃত করা হয়েছে, তা-ও বুঝতে পেরেছে। এই তো, চোখের সামনেই আছে রহস্যময় সেই আদেশ দাতা। এমনিতেই ঘর আলোছায়ায় ভরা, তার ওপর একটা পর্দার আড়ালে বসে কথা বলছে সে...অনেকটা ক্যাথলিক চার্চের কনফেশন বুথের মতো। দুই পক্ষই একে-অন্যের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে, শুনতে পারে। কিন্তু চেহারা অদেখাই রয়ে যায়।

‘টেবিলের ওপর একটা হলুদ খাম আছে,’ গমগমে কণ্ঠটা বলে উঠল, তবে একটু যান্ত্রিক। যেন একটা যন্ত্র ব্যবহার করে কথা বলা হচ্ছে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে অবয়বটা, চেয়ারে বসা। পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে বলে লোকটার সম্পর্কে কিছুই আঁচ করতে পারছে না শিকদার। না তার উচ্চতা, আর না দেহের গড়ন।

এগিয়ে এসে খামটা হাতে নিলো শিকদার। উপুড় করতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ছবি আর কিছু কাগজ। আটাশ-উনত্রিশ বছরের একটা মেয়ের ছবি ওটা। ছোটো করে কাটা কালো চুল, রোদচশমা চোখে। বাংলাদেশে সাধারণত আটাশ বছর বয়সি মেয়েরা

দুই-তিন বাচ্চার মা হয়ে যায়। দেহের বাঁধুনি বলতে কিছু থাকে না। তবে এই মেয়ে বেশ...যৌবনবতী!

'মেয়েটা যেন দুই-তিন দিনের মাঝে মারা যায়, সে ব্যবস্থা করো।'

চমকাল না শিকদার, আগের যে কয়বার দেখা হয়েছে, সে কয়বারও কাছাকাছি ধরনের নির্দেশ পেয়েছে।

ভীত হতে পারে ও, কিন্তু বোকা না। প্রতিবার খুন করার পর নজর রেখেছে পত্রিকার পর্দায়। চেয়েছে যদি কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায় রহস্যময় এই দল আর ততোধিক রহস্যময় এই মনিবের ব্যাপারে। যদি খুনের শিকার হওয়া সবার মাঝে কোনো যোগসূত্র পাওয়া যেত, তাহলে লোকটার ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করা যেত হয়তো। কিন্তু না, কোনো মিল বা যোগসূত্র পায়নি অনেক খুঁজেও। তাই রহস্যটা হয়ে গিয়েছে আরও গভীর।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অপরাধ করতে নামা মানুষকে বোঝা সহজ। লক্ষ্যচ্যুতি হয়, এমন কাজ তারা করে না। সমস্যা হয় এসব আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্যহীন মানুষের কাজ করতে। এরা হয়তো মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়, আর নয়তো হয় প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী।

ক্ষমতাশালী লোকের চাকর হয়ে থাকা সম্ভব, কিন্তু সেই নাগপাশ থেকে বেরোন সম্ভব না। আর বেরোতে না পারলে, শিকদারের একচ্ছত্র অধিপতি হবার স্বপ্ন অধরাই রয়ে যাবে।

মুখে এসব কিছুই বলল না ও। 'আমি আমার সেরা ছেলেটাকে–'

'নাহ!' গর্জে উঠল যেন কণ্ঠটা। 'তুমি নিজ হাতে কাজটা করবে!'

চমকে উঠল শিকদার। এমন আদেশ আগে আসেনি। 'কিন্তু আমি যে নিজে অপারেশনে যাওয়া বাদ দিছি!' আমতা-আমতা করে বলল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রহস্যময় কণ্ঠ। এই নীরবতাটুকু যেন হাজারো ঢোলের চাইতেও বেশি জোরে এসে লাগল শিকদারের কানে। যখন মনে হচ্ছিল, আর সহ্য করতে পারবে না...তখন কথা বলে উঠল কণ্ঠটা। ‘আমরা কি তাহলে ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলাম?’

চুপ হয়ে গেল শিকদার।

‘পারবে, নাকি অন্য কাউকে দেখব?’ কণ্ঠটা যেন ওর মৃত্যুদণ্ড শোনাচ্ছে।

‘না, স...স্যার।’ ঢোক গিলে গলা পরিষ্কার করে নিলো শিকদার। ‘আমি পারব।’

‘গুড,’ বলে বাতি নিভিয়ে দিল কণ্ঠের মালিক। ইঙ্গিত পরিষ্কার, বেরিয়ে যাও।

মানে মানে কেটে পড়ল শিকদার।

তবে মনে-মনে ভাবল, প্রথম সুযোগে...একদম প্রথম সুযোগে পেঁদিয়ে তোদের ভূত ছাড়াব!

পর্ব ১: উন্মেষ

এক

২৫ জানুয়ারি, ২০১৬

রাত এগারোটা

আকাশে চাঁদ নেই, নিকষ কালো রাজপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে এক যুবক। বয়স টেনে-টুনে পঁচিশ হবে, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা দেহটা পেটানো। মাথায় ঘন কালো চুল, মুখে একটা স্টার সিগারেট।

চেহারা বা দেহসৌষ্ঠবের সাথে কমদামি সিগারেটটা যায় না; তবে পরনের ইউনিফর্মটা দেখলে বোঝা যায় তার কারণ। চারপাশ অন্ধকার হলেও, সিগারেটের আলোতে নীলচে পোশাকটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। বুক পকেটের লোগো থেকে বোঝা যায়, দেশ-সেরা এক বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কর্মচারী ও।

ঢাকা শহরে সাধারণত রাত এগারোটাকে রাত হিসাবে গণ্য করা হয় না। মানুষ জনের পদচারণায় চারপাশ মুখরিত না থাকলেও, গাড়ি-ঘোড়া চলে। খোলা থাকে মুদীর দোকান আর টঙের দোকানও। রাতের ঢাকা যেন আরও সুন্দর, জনসংখ্যার ভারে পিষ্ট নগরী তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ছিনতাইকারীরা এই সময়টায় বের হবো-হবো করে, গণিকাদের খদ্দের খোঁজা পুরোদমে শুরু হয় আরও একটু পরে। নেশাখোরদের অধীনে শহর চলে যাবার আরও ঘণ্টা দুয়েক দেরি আছে।

তিন শিফটে কাজ করতে হয় যুবক, ওরফে সানিদের। সকাল, দুপুর, রাত–এই তিন শিফটের মাঝে দুপুরেরটাই বেশি বিরক্তিকর লাগে ওর

কাছে। ওমর সানির সাথে নাম মেলে বলে নিজেকে তার মতোই মনে করে যুবক। চুলও রেখেছিল স্বপ্নের নায়কের মতো, বড়ো বড়ো...কাঁধ পর্যন্ত। চেহারার প্রতি আলাদা যত্নটাও সে কারণেই। দুপুরে ঘুমালে দেহের বাঁধন ঠিক থাকে, রাতে না ঘুমালে কালি জমে চোখের নিচে। তাই সানির চেষ্টা থাকে সবসময় সকালের শিফট নেবার। দুপুরের শিফট শেষ হতে-হতে রাত দশটা। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে এগারোটা-বারোটা। এদিকে বের হতে হয় সেই দুটোয়। খেয়ে-দেয়ে একটু গড়িয়ে নেবারও উপায় নেই। বিরক্ত বদনে তাই সিগারেট টেনে চলছে বেচারা।

সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও, মেয়ে পটাবার জন্য অসাধারণ। আলাদা একটা স্টাইল আর আভিজাত্য এনে দেয় ঠোঁটের এক কোণে পুড়তে থাকা বিষ। অন্তত সানির সেটাই ধারণা।

মৌসুমীর কথা মনে পড়তেই মেজাজ খিঁচরে গেল ওর। গত কয়েকদিন ধরে মেয়েটার স্বামী বাড়িতে। চোরের বৌ নাকি সবার বৌ, অন্তত মৌসুমীর ক্ষেত্রে তেমনটাই হতে যাচ্ছিল। মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে থাকে সানি। ভাড়া বাড়ি, দোতলাটা মেস বানিয়ে নিয়েছে বাড়ির মালিক। নিচ তলায় থাকে নিজেই। পাশের বাড়ির নিচতলায় থাকে বিহারী মেয়েটা। আসলে নামে বিহারী, জন্ম আর বেড়ে ওঠা বাংলাদেশেই। স্বাধীনতার পর জন্মগ্রহণকারীদের বারবার নাগরিকত্ব দেবার প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও, কোনো এক অদ্ভুত কারণে বিহারীরা তা নেয়নি। নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা অল্প বয়সেই জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এলাকার সব পাণ্ডাদের কাছে তাই এখানকার যুবক সমাজ যেন এক সোনার খনি। মৌসুমীর স্বামী হারুনও তেমনই এক কম বয়সে ভুল পথে পা বাড়ানো যুবক।

এখন প্রায়শই পুলিশ আসে ওর খোঁজে। প্রথম কিছুদিন ছিনতাই, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি করলেও, এখন হারুনের অপরাধ নেমে এসেছে ছিঁচকে চুরিতে। বিয়ে করেছে একদম অল্প বয়সে, মেয়েও এখানকারই। একদিন ছিনতাই করতে গিয়ে মাতাল হারুন ছুরি ঠেকিয়ে বসে পুলিশেরই এক কনস্টেবলকে। আর যায় কোথায়। কথায় বলে, পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু পুলিশকে ছুঁলে যে ঘা দেবার জায়গাও অবশিষ্ট থাকে না, তা হাড়ে-হাড়ে টের পেল হারুন। পাক্কা দশদিন হাজতে থাকার পর যখন বাইরে বেরুল, তখন বেচারার এক পা ভেঙে গিয়েছে। সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় এখন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় বেচারাকে।

শিক্ষা-দীক্ষা নেই; এতদিন যে গর্ব ছিল শরীর নিয়ে, সেটাও এখন সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। কামানোর ফন্দি তাই এখন একটাই–চুরি। একবার পুলিশের খাতায় চোর হিসেবে নাম লেখালে আর রক্ষা নেই। আশপাশের ছিঁচকে চুরি থেকে পুকুর চুরি পর্যন্ত যাই হোক না কেন, পুলিশ একবার হারুনের খোঁজে আসবেই। আর এলে চোরের সুন্দরী বউ মৌসুমীকে নিয়েও চলে হালকা টানাটানি।

সবই জানে সানি। পাশের বাড়ির সুন্দরী গৃহবধূ ওর নজরেও পড়েছে। নামটাও করেছে আকর্ষণ। একদিন তাই মেয়েটার এই অবস্থা দেখে এগিয়ে আসে ও। সানি যেখানে চাকরি করে, সেখানে ওর ইউনিট প্রধান এক্স-র‍্যাব। সাধারণত ইন্টার পাস একজন সাধারণ প্রহরীর, সিকিউরিটি ফর ইউ বা এস.এফ.ওয়াই.র ইউনিট প্রধান পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সুন্দর চেহারা আর চুলের প্রতি অস্বাভাবিক যত্নের প্রবণতাটা সারা ইউনিটের কাছেই সানিকে পরিচিত করে তুলেছে। আজমল স্যারও তার ব্যতিক্রম নয়।

যাই হোক, মৌসুমীকে বিব্রত হতে দেখে এগিয়ে আসে সানি। প্রথম-প্রথম খুব চোট-পাট দেখাচ্ছিল পুলিশের কনস্টেবল। কিন্তু সে তো

আর জানে না, সানি দোতালা থেকে নামার আগেই তার স্যারকে সব জানিয়ে এসেছে। তিনি আবার অধীনস্থদের প্রতি খুব অনুরক্ত। তাই পদক্ষেপ নেন সাথে-সাথে। থানার ও.সি.র ধমক ওয়্যারলেসে ভেসে আসা মাত্র ভেজা বেড়াল বনে গেল বেচারা কনস্টেবল। মৌসুমীর সামনে তো বটেই, পুরো মহল্লায় নাম ছড়িয়ে গেল সানির।

ওর এই পরোপকার যে একেবারে নিঃস্বার্থ ছিল না, তা অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও, মৌসুমী বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল। আসলে মেয়েদের স্রষ্টা বানিয়েছেন বিশেষ এক ক্ষমতা দিয়ে। কোনো পুরুষের দৃষ্টি অথবা স্পর্শ অথবা কর্মকাণ্ডের পেছনের কারণটা কী, তা তারা খুব সহজেই ধরে ফেলে। মৌসুমী তাও আবার লেখাপড়া জানা, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া। সানির আচরণের অর্থ সে ধরতে পেরেছিল প্রথমেই। অন্য সবার মতোই, আরেকজন ভাবী-ভক্ষক হিসেবে সে ধরে নিয়েছিল যুবককে। তাই এড়িয়ে চলত প্রথম-প্রথম।

ভুল হয়েছিল মেয়েটার। সানি সত্যিকার অর্থেই প্রেমে পড়েছিল মেয়েটির। আসলে যতটা না মেয়েটির দেহের বা চেহারার, তার চাইতে বেশি প্রেমে পড়েছিল মেয়েটির আচরণের। চোরের বউ অপবাদ মাথায় নিয়ে খুব কম মেয়েই তার শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মা জ্ঞানে সেবা করতে পারে। মৌসুমী সেই বিরল প্রজাতির একজন।

এই ঘটনা বছর দেড়েক আগের, এরপর আর কোনো পুলিশ বিরক্ত করেনি হারুনের পরিবারকে। হারুনের কথা অবশ্য ভিন্ন, প্রায়শই তাকে পালিয়ে থাকতে হয়। মাসে-দুমাসে একবার বাসায় আসে। এক-দুই দিন থেকেই আবার উধাও হয়ে যায়। যা রেখে যায় তা দিয়ে হয়তো দিন পনেরো চলে, বাকিটা থাকতে হয় আধ পেটা খেয়ে।

হারুনের মা একদিন সখেদে এসব কথা বলছিল সানিকে। এদিকে সানির পরিবারে সদস্য বলতে কেবল মা। জায়গা-জমি খুব একটা

নেই, তবে যা আছে তা দিয়ে আয়েসে চলে যায় ওর মার গ্রাম্য জীবন। বেতনের টাকা জমাচ্ছে সানি, ইচ্ছা একদিন গ্রামে ফিরে গিয়ে বড়ো-সড়ো এক মুদির দোকান দেবে।

যখন ছেলেটা জানতে পারল, দুই বুড়ো-বুড়ি এক সপ্তাহ ধরে প্রায় আধপেটা খেয়ে আছে, নিজেকে আর থামাতে পারল না। সাথে-সাথে কয়েক কেজি চাল, ডাল আর গোটা চারেক মুরগি কিনে আনল। মৌসুমী তখন বাড়ির বাইরে, কোথাও ধার-টার বা কাজ পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজছে। সদাইগুলো রান্নাঘরে রেখে চলে গেল অফিসে, ডিউটি করতে।

ফিরে এসে মেসের সঙ্গীর কাছে শোনে, নিচে নাকি কুরুক্ষেত্র বেঁধে গিয়েছিল। গর্বিত মৌসুমী আধা-পেটা কেন, খালি পেটে থাকতেও রাজি আছে। কিন্তু সানির সাহায্য নিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্ক-বিতর্কের পর চুপ করে মেয়েটি। বৃদ্ধা শ্বশুর-শাশুড়ির মুখ চেয়ে রান্নাও করে সে। কিন্তু এক লোকমা খাবার নাকি নিজের মুখে নেয়নি।

তখনই আরও বেশি করে প্রেমে পড়ে যায় সানি ওর। সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক মেয়েটাকে তার চাই। নাহ...লোভ চরিতার্থ করার জন্য নয়, নয় দেহটাকে ভোগ করার জন্য। চাই স্ত্রী রূপে, ঘরণী আর অর্ধাঙ্গী রূপে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সানি অপেক্ষায় থাকে হারুনের পরবর্তী আগমনের। লোকটা আসার ঠিক পনেরো দিন পর, এক ছুটির দিনে বসে যায় জানালার পাশে। মৌসুমী বাইরে বেরোনো মাত্র ছুটে চলে যায় নিচে। আগেরবারের মতো এবারও কিছুক্ষণ হারুনের বুড়ি মার পাশে কাটিয়ে রওনা দিল দোকানের দিকে। বাজার সদাই করে দিয়ে চলে এলো ঘরে।

বিকালের দিকে দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। মেস ফাঁকা, কেউ নেই। সবাই চাকরিজীবী। আসতে আসতে সেই রাত আটটা-নয়টা। উঠে তাই দরজা খুলে দিল সানি। মৌসুমীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আঁতকে ওঠার ভান করল ও, অথচ মনে-মনে মেয়েটার অপেক্ষাই করছিল।

'আসবার পারি?' দিনের-পর-দিন আধপেটা খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া মেয়ের কণ্ঠ যে এতটা সুললিত হতে পারে, জানা ছিল না সানির।

'অবশ্যই, আসেন।'

ভেতরে পা রাখল মেয়েটি, চারপাশে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কেউ নাই?'

'না।'

'ভালো।' কিছুটা দৃঢ় কণ্ঠে বলল মৌসুমী।

মনে-মনে প্রস্তুত হয়ে নিলো সানি, বুঝতে পারছে মেয়েটা ঝগড়া করার জন্যই এসেছে। কিন্তু এরপর সে যা করল, তাতে হতবাক হয়ে গেল ও।

চৌকাঠের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে লাগিয়ে দিল দরজা। এরপর সানির দিকে ফিরে একটানে খুলে ফেলল শাড়ি।

অষ্টাদশী নারীর অর্ধ-নগ্ন শরীরের সামনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যুবক!

সম্বিত ফিরল মেয়েটার পরের কথায়, 'দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কী দেখ? এইডাই তো চাও, তাই না? লয়া লও।'

মাথার ভেতর হাজারটা কথা খেলে গেল সানি। যতই সাজুগুজু করুক আর হিরোগিরি দেখাক, নারী দেহের সাথে পরিচয় নেই ওর। এদিকে

মেস পুরো ফাঁকা। চাইলেই সামনে দাঁড়ানো এই নারীকে আপন করে নিতে পারে। চাইলেই সানি অবগাহন করতে পারে মৌসুমীতে।

কাঁপা-কাঁপা হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা শাড়ির আঁচল তুলে নিলো ও, এরপর জড়িয়ে দিল মৌসুমীর দেহে। এরপর তারচেয়েও কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'যা আমি করছি, তোমারে ভালোবাসি বইল্যাই করছি। ভোগ করার লাইগ্যা না।'

অবাক হয়ে সানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মৌসুমী। নায়ক-নায়িকার নামধারী দুই যুবক-যুবতির প্রেম হলো ছায়াছবির মতো ঘটনা দিয়েই। এই এক আচরণ দিয়েই নায়িকার মন জয় করে নিলো নায়ক।

এরপর থেকে মৌসুমী নিজেও যেন হার মেনে নিলো। সানি বাজার-সদাই করে দিলে আর আগের মতো চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে না। প্রায়শই নিচ থেকে রান্না করা খাবার আসতে শুরু করলো সানির মেসে। মেসবাসীরা তো ঠুঁটো জগন্নাথ নয়, জল্পনা-কল্পনা আর কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল পুরোদমে।

ঘটনা উঠে গেল হারুনের কানেও। পঙ্গু হারুন খ্যাপে উঠল, বন্য প্রাণীর আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্ত্রীর ওপর। সে রাতে পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এলো সপাং-সপাং বেতের আওয়াজ। আর সেই সাথে হারুনের চিৎকার, 'চিল্লাছিস না কেন, মাগী? তোর ভাতারকে শোনা। দেখি এসে তোকে বাঁচায় কি না।'

সানির ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে চলে যায় নিচে। হারুনের মতো দুই চারটা পঙ্গুকে সে সকাল-বিকাল চিবিয়ে খেতে পারে। কিন্তু করল না, মৌসুমীর আত্মসম্মানবোধের কথা চিন্তা করেই করল না।

পরেরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে গেল হারুন। সূর্য একটু গরম হবার পর মৌসুমী কাপড় শুকাতে বাইরে এলো। মেয়েটার কালশিটে পড়া

চেহারা আর কালো হয়ে ফুলে ওঠা চোখ দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারল না সানি। এক ছুটে চলে এলো প্রেমিকার কাছে। ‘আর কতো সহ্য করবা? আমি তো তোমারে কইছি, ওই চোট্টার কথা ভুইল্যা যাও। আমার সাথে গ্রামে চলো। মাকে তোমার কথা সব বলছি, বলছি হারুন কতো অত্যাচার করে তার কথাও। মার আপত্তি নেই।’ একমাত্র পুত্রের বিয়ে এক তালাক-প্রাপ্ত মেয়ের সাথে হবে, একথা কল্পনাও করতে পারছিল না সানির মা। কিন্তু পুত্র বিষ খাওয়ার হুমকি দিলে আর অমত করেনি সে। একথা ভুলেও মৌসুমীকে জানাল না ও। ‘কাইলক্যাই তালাকের জন্য আবেদন করো। তোমারে যেমনে মাইর দিছে, তাতে পাইতে সমস্যা হবে না।’

চুপ করে রইল মেয়েটা, জবাব দিল না কোনো।

‘কী হইল, কথা কও!’ তাড়া দিল সানি।

‘হারুনের লগে আমি থাকবার চাই না। কিন্তু আমি গেলে আব্বা-আম্মার কী হইব?’ বেশ কিছুক্ষণ পর জবাব দিল মেয়েটা।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সানি, কিন্তু আজ একটা না একটা হেস্ত-নেস্ত করেই ছাড়বে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে। ‘দেখ, দিনের-পর-দিন তোমারে এমন কষ্ট করতে দেখবার পারুম না। আমারে একটা জবাব তোমার দিতেই হইব। তুমি গেলেগা চোট্টা আরেকটা বিয়া করব, ওই বুড়া-বুড়ির সমস্যা হইব না।’

চুপ করে রইল মৌসুমী, সে নিজেও একটা বিহিত চায়। কিন্তু এদিকে শ্বশুর-শাশুড়িকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। ‘আমারে একমাস সময় দাও।’

‘এক মাস!’ আঁতকে উঠল যুবক। ‘এতদিন দেওয়া যাবে না। বড়ো জোর এক সপ্তাহ দিবার পারি।’

এই ঘটনার পর পার হয়ে গিয়েছে ছয়দিন। আজকেই সেই সপ্তম দিন। আজকেই মিলবে প্রশ্নের উত্তর।

অন্যান্য দিন অফিস থেকে বেরিয়েই লেগুনায় ওঠে। গিয়ে নামে বাড়ির কাছে, মেইনরোড থেকে ওর বাড়িটা মাত্র মিনিট দশেকের হাঁটা দূরত্ব। কিন্তু আজকের কথা ভিন্ন। ভয় আর আশার দোলাচলে পেন্ডুলামের মতো দুলছে ওর মন। একবার মনে হচ্ছে, মৌসুমীর চলে আসাটা প্রায় নিশ্চিত। আরেকবার মনে হচ্ছে, নিজের সুখের চাইতে দুই বুড়া-বুড়িকে যদি বেশি গুরুত্ব দেয়?

বিকাল থেকে একের-পর-এক সিগারেট টানছে সানি। এমনিতে ডিউটি আওয়ারে সিগারেট খাওয়াও নিষেধ। তবে দিনের বেলা একেক পোস্টে দুই-তিন জন করে থাকে বলে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাইরে গিয়ে খেয়ে আসা যায়।

মাথা পরিষ্কার করার জন্য আজ হেঁটেই বাড়ির পথ ধরেছে। তবে বিপদ কোন দিক থেকে আসছে, সেটা আন্দাজ করতে পারলে হয়তো বাড়িতেই ফিরত না।

যদি মেয়েটা রাজি হয়, তাহলে কালকে প্রথমেই যেতে হবে কোনো উকিলের কাছে। নাকি নারী নির্যাতন নিয়ে কাজ করে–এমন কোনো এন.জি.ও.তে যাবে? এসব ভাবতে-ভাবতে বেখেয়ালে চিন মৈত্রীর সামনের রাস্তা ধরল ও। ওদিকে সন্ধ্যায় পা রাখাটাই একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, রাতের বেলা তো প্রশ্নই আসে না। বিখ্যাত এই স্থাপনার ঠিক সামনের রাস্তাটায় আলোর ব্যবস্থা ভালো মতোই আছে। তবে সেখান থেকে একটু এগোলেই, অন্ধকার গিলে নেয় এলাকাটাকে।

ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছে সানি, পেছন থেকে আসা পদশব্দটা শুনতেও পেল না। অন্ধকার মতো একটা জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল সিগারেট। মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই...উঠে পড়বে মিরপুর রোডে।

আরেকটা ধরাবার জন্য প্যাকেট বের করল যুবক। দুই ঠোঁট দিয়ে শলাকা চেপে ধরে হাতে নিলো লাইটার। বাতাস বইছে; আগুনের শিখা যেন নিভে না যায়, সেজন্য এক হাত দিয়ে ঢাকল আগুন। সিগারেটের শলায় ছুঁইয়ে প্রাণ ভরে টানল একবার। আগুন বন্ধ করে ওপরের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়ল।

কিন্তু মুখ আর নামাবার সময় হলো না, তার আগেই চাঁদিতে শক্ত কিছুর আঘাত পেয়ে টলে উঠল নিজেকে নায়ক ভাবা সানি। জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল ব্যস্ত নগরীর আপাত শান্ত পিচ ঢালা রাস্তায়।

*

প্রথমে ফিরে এলো দৃষ্টিশক্তি। আছন্নভাবটা রইল আরও কিছুক্ষণ। বারবার মাথা ঝাঁকাল সানি, নড়ার প্রয়াস পেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! মাথা নাড়াতে পারলেও, দেহটাকে নড়াতে পারল না এক ইঞ্চিও।

চোখের ঠিক সামনে ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটা বাতি জ্বলছে। ওটার হলুদ আলোয় চারপাশটা দেখে নিলো। ছোটো একটা ঘরে আছে ও, বসে আছে একটা চেয়ারে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। দুই পা বেঁধে রাখা হয়েছে চেয়ারের দুই পায়ার সাথে। বুকের ওপর টের পাচ্ছে দড়ির বাঁধন।

চোখ বাঁধা নেই, তাই একটু শান্ত হয়ে চারপাশে তাকাল ও। একটা মাত্র জানালা রয়েছে ঘরটায়। ওটা দিয়ে আলো আসছে না একদম। কতক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে সানি, সেটা বুঝতে পারছে না। হতে পারে কয়েক ঘণ্টা, আবার এক দিন পেরিয়ে আরেক রাত হয়ে

যাওয়াটাও অসম্ভব না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, তবে আটকানো পাল্লা একদম অল্প ফাঁক হয়ে আছে। বাইরেও অন্ধকার, মানে রাত চলছে।

মুখ বাঁধেনি অপহরণকারীরা। আবার চোখও বাঁধেনি। এর অর্থ দুটোর একটা হতে পারে, হয় অপহরণকারী এতটাই ক্ষমতাশালী যে ওর কিছু দেখে ফেললেও যায় আসে না। আর নয়তো ওকে আর ফিরতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু কোনোটাই আসলে ঠিক মিলছে না। এমন কারও সাথে ওর শত্রুতা নেই, যে ওকে একেবারে মেরে ফেলতে চাইবে। একটু-আধটু সাইজ করা ভিন্ন কথা, সেটা তো চাইলে হারুনও করতে পারে। কিন্তু ছিঁচকে একটা চোর এত কিছু করার সাহস পাবে না।

আর রইল ফিরতে না পারার কথা, সেক্ষেত্রে ও এখানে কেন? শেষ যে স্মৃতিটা মনে পড়ছে, তা তো চিন মৈত্রীর পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাবার স্মৃতি। ওকে খুন করতে চাইলে তো সেখানেই করতে পারত। অন্য কোথাও টেনে আনার কী অর্থ!

‘কেউ আছে?’ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে যখন কোনো কূল-কিনারা পেল না, তখন চিৎকার করে উঠল ও। ‘হ্যালো, শুনতেছেন?’

মিনিট পাঁচেক চিৎকার করেও যখন লাভ হলো না কোনো, তখন হাল ছেড়ে দিল বেচারা। চুপচাপ বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। খুব উঁচুদরের না হলেও, কিছু প্রশিক্ষণ আছে ওর। ঠিক করল, বসে থেকে দেখা যাক।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পর, হুট করে খুলে গেল সামনের দরজা। মাঝারি আকৃতির এক লোক এসে দাঁড়াল ওখানটায়। লোকটার চেহারা দেখার জন্য পিট-পিট করে তাকাল। কিন্তু বাতির আলো সরাসরি চোখে এসে পড়ছে বলে পারল না। ভেতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল

লোকটা, দাঁড়াল বাতির ঠিক কাছেই। ঘাড় তুলে তাকাতে হচ্ছে এখন সানিকে। কিন্তু আলো আরও বেশি করে চোখে পড়ছে বলে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই।

'কেডা আপনি? কী চান?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল সানি।

উত্তর দিল না আগন্তুক। তবে ঝুঁকে এলো একটু, লোকটার চেহারা এবার দেখতে পেল যুবক। চেহারাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।

সাথে-সাথে বুঝতে পারল সানি, এখান থেকে আর জান নিয়ে ওকে ফিরতে হচ্ছে না।

গলা শুকিয়ে এল বেচারার, এতক্ষণ অনেক কষ্টে শান্ত রেখেছিল নিজেকে। এখন আর পারল না, ভয়ে কেঁপে উঠল ওর বুক। 'কী চান আপনে? আমারে ধইর্যা আনছেন ক্যান? আমি কী করছি?'

উত্তর না দিয়ে ঘোঁত করে হেসে উঠল লোকটা।

'আ...আমি...' কিছু একটা বলার প্রয়াস পেল সানি। কিন্তু পরমুহূর্তে ডান চোয়ালের ওপর বেমক্কা মারের আঘাত পেয়ে চুপ হয়ে গেল। নোনতা রক্তের স্বাদে ভরে উঠেছে মুখটা। আঘাতটা খালি হাতে করা হয়নি, ইস্পাতের নাকল পরে মারা হয়েছে।

মাথাটা টলে উঠল বেচারার। কিন্তু সামলে নেবার সুযোগ পেল না, তার আগেই আরেকটা ঘুসি খেল, এবার বাঁ চোয়ালে। ব্যথার প্রচণ্ডতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও।

এবার যখন জ্ঞান ফিরল, তখন প্রথম অনুভূতিটা পেল ব্যথার। তীব্র ব্যথা ওকে যেন গিলে খেয়েছে। এতক্ষণ খোলা ছিল মুখটা, কিন্তু কে যেন রুমাল গুঁজে বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য না দিলেও ক্ষতি ছিল না। ভাঙা চোয়াল নিয়ে বড়োজোর গুঙিয়ে উঠতে পারত বেচারা, চিৎকার করতে পারত না।

পরবর্তী আধা ঘণ্টায় আরও কয়েকবার জ্ঞান হারাল সানি। প্রতিবার জ্ঞান ফিরে পেল পানির ছোঁয়ায়, শান্তি মতো অজ্ঞানও হতে দিতে চায় না অপহরণকারী। বাছা-বাছা মারে সারা শরীর ফুলে উঠেছে। একে-একে ওর দুই হাত ভেঙে ফেলা হয়েছে, পাঁজরের কয়েকটা হাড়ও রেহাই পায়নি। ভেঙে ফেলা হয়েছে দুই পা-ও।

তীব্র আক্রোশ নিয়ে যেন অপহরণকারী আছড়ে পড়েছে বেচারার ওপরে।

মনে-মনে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছে এখন যুবক। মাথা থেকে মৌসুমীর চিন্তা কবে উধাও হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে পালাবার স্বপ্নও দেখছে না ও। মনে-প্রাণে চাইছে, মৃত্যু এসে ওকে মুক্তি দিক।

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো ছেলেটার।

কিন্তু চোখ দুটো উপড়ে ফেলার আগে নয়!

*

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

রাত এগারোটা পঞ্চান্ন

'ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...'

আদ্যিকালের মোবাইলে বেজে ওঠা অ্যালার্ম শুনে ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল সুমন। ডিউটি শুরু হয় রাত দশটায়, শেষ সেই সকাল

আটটায়। এর মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে জানলে, আর চাকরি করতে হবে না।

অবশ্য বেচারার দোষ নেই খুব একটা। মাত্র সতেরো বছর বয়সি ছেলেটা এস.ফর.ইউ. কোম্পানিতে জয়েন করেছে মাত্র কয়েকদিন আগে। ট্রেনিং শেষ হবার আগেই কী এক বিশেষ কারণে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তুলনামূলক নিরাপদ একটা প্রতিষ্ঠানে। মহাখালীর কমিউনিকেবল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার বা সি.ডি.আর.সি.র নিচতলায় কাজ করছে ও। রিসার্চার বা গবেষকরা যেখানে বসেন, সেই ঘরগুলো প্রহরায় ব্যস্ত।

প্রতিষ্ঠানটা আধা-সরকারি, বিদেশি সাহায্যও আসে প্রচুর। প্রায় চার হাজার কর্মচারী কাজ করে এখানে। সাততলা বিল্ডিংটার নিচতলাটা একটু আলাদা। চতুর্ভুজ আকৃতির এই বিল্ডিংটার একদম নিচতলায় দুটো অংশ। এক অংশ হাসপাতাল, ওখানে কেবল সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীরা থাকে। দেড়শো বিছানার হাসপাতাল হলেও, রোগীর সংখ্যা কখনওই পাঁচশোর কম থাকে না।

অন্য অংশটায় বসেন গবেষকরা। তাদের ঢোকার পথ, বেরোবার পথ-সব আলাদা। হাসপাতাল আর এই অংশটা তাই পাশাপাশি অবস্থান করলেও, বিশেষভাবে নির্মিত দরজা দিয়ে দুটোকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। কী-কার্ড ব্যবহার না করে দরজাগুলো খোলাই যাবে না। একমাত্র হাসপাতালের ডাক্তার আর সুমনদের, মানে গার্ডদের কাছে রয়েছে সব দরজা খোলা যায় এমন কী-কার্ড। গবেষকদের মাঝে যারা হাসপাতালের সাথে সম্পর্কযুক্ত নন, তারা হাসপাতালে ঢোকা যায়, এমন দরজাগুলো খুলতে পারেন না।

সুমন যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে সদর দরজা দেখা যায় না। ওখানে ডিউটি দিচ্ছেন ইলিয়াস ভাই। ভাগ্য ভালো দেখা যায় না, নইলে ইলিয়াস ভাইয়ের মতো কড়া লোক নিশ্চিতভাবেই ওর চাকরি

খেয়ে নিতেন। একটু এগিয়ে দৃষ্টি পথের প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। অবাক হয়ে খেয়াল করল, ইলিয়াস ভাই স্টেশনে নেই।

দুশ্চিন্তায় ভরে গেল ওর মন। এ কী? ভাই কী তাহলে ওকে ঘুমাতে দেখেছেন? বিচার দিতে গিয়েছেন শিফট ইন-চার্জের কাছে?

পরে ভাবা যাবে ওসব নিয়ে, এখন আপাতত সামনের ঝামেলা মেটানো যাক। এই ভেবে গবেষকদের দরজার কাছে এসে সোজা দাঁড়াল সুমন। রাত ঠিক বারোটা থেকে বারোটা পনেরো পর্যন্ত সবাইকে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

কেন, জানতে চেয়েছিল ও। উত্তরে জানানো হয়েছে, ইউনিট প্রধান নাকি রাত ঠিক বারোটায় একবার সার্ভারে লগ-ইন করে সি.সি. ক্যামেরার ফুটেয দেখেন। সাত তলায় প্রায় দুইশো ক্যামেরা, অবশ্য নিচতলাতেই তার অর্ধেক। একেক শিফটে পাহারা দেয় ষাট জন প্রহরী। সবার অবস্থা দেখে লগ-আউট করেন চিফ।

সত্যিটা যে কতটা ভিন্ন, তা যদি জানত সুমন।

আচমকা সামনে থেকে এক আগন্তুককে আসতে দেখল ও। ওর পাহারা দেওয়া দরজাটা বিল্ডিং-এর ঠিক মাঝখানে। ও যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, একটু সামনে এগিয়ে বাঁ দিকে তাকালেই গবেষকদের ঢোকবার-বেরোবার স্থান নজরে পড়ে। দরজাটা যে দেওয়ালের সাথে লাগানো, সেটার দুই পাশে দুই ঘর থাকায়, কেবল সামনের দিকটাই দেখতে পায় ও। যাই হোক, ডান দিকে একটা করিডর আর সোজা আরেকটা দরজা। ডান দিকের করিডরের মাথার দরজা আর সামনেরটা মিলেই এই ছোটো অংশটাকে হাসপাতাল থেকে আলাদা করে রেখেছে।

আগন্তুক যেহেতু সামনের দিক থেকে আসছে, তাই হয় সে রোগীর লোক আর নয়তো হাসপাতালের কর্মচারী–আন্দাজ করল সুমন। রোগীর লোক হলে তো দরজা খুলতে পারবে না, কিন্তু হাসপাতালের কর্মচারী হলে পারবে। আজকে ওর দ্বিতীয় দিন, তাই কর্মচারীদের সবাইকে চিনে ওঠার প্রশ্নই আসে না।

হাট করে যখন সামনের দরজাটা খুলে গেল, তখন ঘড়িতে বাজে রাত বারোটা দুই।

লোকটা ডান-বাঁয়ে না তাকিয়ে সরাসরি চলে এলো সামনে, সুমনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'উমা ম্যাডাম আছে না?'

'উমা ম্যাডাম?' থতমত খেয়ে গিয়েছে বেচারা প্রহরী, গবেষকদের কাউকেও চেনে না।

'চেনো না? নতুন এসেছ?' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল লোকটা।

'জ...জি।'

'ওহ, যাও তাহলে। দেখে এসো ম্যাডাম আছে কিনা।'

গ্রামের ছেলে সুমন, এরকম ভারিক্কি স্বরের আদেশ শুনতেই অভ্যস্ত। সেসব আদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা ওর ধাতে নেই। আর তাছাড়া, হাসপাতালের কর্মচারীকে সন্দেহ করার কথা ওর কল্পনাতেও আসেনি। 'অবশ্যই, স্যার।' বলে এগিয়ে গেল নিজের দরজার দিকে।

আচমকা পেছন থেকে ওকে চেপে ধরল কেউ, ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গেল বেচারা।

গলাটা যখন ছোরার ধারাল ফলায় ফাঁক হয়ে গেল, তখনও সেই বিহ্বলতা কাটেনি।

*

কাগজ-পত্র গোছাচ্ছে বিশিষ্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট, সি.ডি.আর.সি.র জুনিয়র সায়েন্টিস্ট উমা চক্রবর্তী। আগামীকাল রাতের ফ্লাইটে জেনেভা যেতে হবে ওকে। নতুন এক যুগান্তকারী আবিষ্কার তুলে ধরতে হবে বৈজ্ঞানিকদের সামনে। সেজন্যই রাত বারোটার বেশি বেজে যাওয়া সত্ত্বেও, এখনও অফিস থেকে বেরোয়নি। অবশ্য অফিস আওয়ার নয়টা-পাঁচটা হলেও, কাজ পাগল মেয়েটা কখনও রাত নয়টার আগে বের হয় না। মাঝে-মাঝে দশটাও বেজে যায়।

মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে এমন একটা বিশাল সংস্থার জুনিয়র সায়েন্টিস্ট হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এরজন্য দরকার স্থিরতা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দুটোর কোনোটারই অভাব নেই উমার। বিয়ে করেনি, নেই কোনো বন্ধু-বান্ধবও। বন্ধু না থাকার কারণটা বেশ অদ্ভুত। কেমন একটা নাকি বোটকা গন্ধ পাওয়া যায় ওর গা থেকে, অন্তত ঘনিষ্ঠ জনেরা তাই বলে। চেপে ধরে পাপার মুখ থেকেও কথাটা বের করিয়েছে ও। যখন পাপা স্বীকার করলেন, তখন আর সত্যিটা বলেনি সে।

বলেনি ও নিজেও অন্য সবার কাছ থেকে কেমন একটা যেন বোটকা গন্ধ পায়।

হাজার ডাক্তার দেখিয়েও লাভ হয়নি, বারবার যকৃত আর হরমোন পরীক্ষা করে দেখেছে। সমস্যা নেই ওগুলোর কোথাও। মরণব্যাধি ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠার পর, এই পর্যন্ত আর কোনো রোগে আক্রান্ত হয়নি উমা।

...শুধু এই একটা সমস্যা বাদে...

কাগজ গোছাতে-গোছাতে সামনে থাকা সালাদের পাত্র থেকে এক চামচ লেটুস আর পালং শাক তুলে মুখে পুরল উমা। শাকাহারী ও, মাছ-মাংস একদম ছোঁয় না। প্রতিদিন তাই বাসা থেকে নিয়ে আসতে হয় খাবার।

টুং-টাং আওয়াজ হলো একটা বাইরে থেকে, নিশ্চয়ই ড্রাইভার অধৈর্য হয়ে ভেতরে এসেছে ওকে নেবার জন্য। পাপার নিয়োগ করা এই ড্রাইভার কাজ করছে মাত্র মাস দুয়েক হলো। কিন্তু ভাবে মনে হয়, উমাই তার কর্মচারী।

'আসছি বাবা, আসছি,' মনে-মনে বলল মেয়েটা। ঠিক করল, আজকে যদি ড্রাইভার উলটা-পালটা কিছু বলে তো পাপাকে বলে কালকেই ছাড়িয়ে দেবে। বেয়াদবি একদম সহ্য করবে না। দরজায় নকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে কাজের গতি আরও বাড়িয়ে দিল ও।

'খোলাই আছে।' চিৎকার করল ও। 'তবে আসতে হবে না। আমার কাজ শেষ, বাইরে দাঁড়াও। আসছি।'

কিন্তু আধ মিনিট পর যখন দরজা খুলে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে চোখ তুলে চাইল ও। 'বললাম তো আসছি,' মুখ তুলতে-তুলতে বলল উমা। 'শুনতে পাও না...'

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল উমার। সামনে দাঁড়ানো লোকটা ওর ড্রাইভার নয়। কালো রুমালে মুখ ঢেকে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে উদ্যত অস্ত্র।

ধুপ-ধুপ।

নিকষ কালো গহ্বররূপি পিস্তলটা দুবার অনল বর্ষাল।

কপালে টিপ নিয়ে যখন মেঝেতে আছড়ে পড়ল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী উমা চক্রবর্তী, তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে আট।

দুই

সকালের নরম, মিষ্টি রোদ এসে ভিড় জমিয়েছে ব্যালকনিতে।

বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রাফসান বিন সেলিম। অফিসের দেরি আছে। নয়টায় শুরু, তবে সিনিয়র বিজ্ঞানী বলে মাঝে-মাঝে একটু দেরি করে গেলেও ক্ষতি হয় না। সেটা অবশ্য প্রায় প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অফিস থেকে বের হয় বলে পুষিয়ে যায়। আজ কেন যেন ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছা করছে না।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা যুবক। অবশ্য যুবক বলা চলে ওকে বিদেশি স্ট্যান্ডার্ডে। বাংলাদেশি সমাজে ত্রিশোর্ধ্ব পুরুষকে মাঝবয়সি ধরে নেওয়া হয়। কারণও আছে। লোকে বলে, খাবারের নাকি অভাব বিশ্বে। কিন্তু উপমহাদেশের ত্রিশোর্ধ্ব পুরুষ বা নারীদের দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

খাবারের কারণে না যতটা, কায়িক পরিশ্রম না হবার কারণে তারচাইতে বেশি মোটা হয় লোকে। খাওয়ার সময় হুঁশ থাকে না যে এই ক্যালরিটুকু ব্যায়াম করে বের না করে দিলে, মেদ হয়ে অবস্থান নেবে কোমরে আর বুকে। দামি, মুখরোচক খাবার খেয়ে-খেয়ে সবাই তাই শুধু ফোলে আর ফোলে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, অথচ এখনও স্বাস্থ্য সচেতন, তেমন লোক আর যেখানেই হোক না কেন, বাংলাদেশি মধ্যবিত্ত সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবে রাফসানের ব্যাপারটা আলাদা। প্রায় পাঁচ বছর বিদেশে কাটিয়ে আসায়, এখনও স্বাস্থ্য ধরে রেখেছে ও। পুলিশের চাকরি বাদ দিয়ে

আমেরিকায় গিয়েছিল পড়তে, পি.এইচ.ডি. শেষে এখন যোগ দিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড়ো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সি.ডি.আর.সি.তে।

জন হপকিন্সে ওর পড়ার বিষয় ছিল এপিডেমিয়োলজি বা রোগের-বিস্তার সংক্রান্ত বিদ্যা। আজকাল শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নতুন-নতুন রোগ। ফলশ্রুতিতে নিজের গবেষণা তো আছেই, অনেক সহকর্মীর গবেষণাতেও নজর বোলাতে হয় ওকে। তাই পেশাগত দিক থেকে ওকে সফল বলতেই হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারটা আলাদা।

প্রথম প্রেম নিতুর কাছ থেকে কষ্ট পাবার পর, নতুন করে আর কারও দিকে মুখ তুলে চায়নি ও। বাঙালি কবিরা নানাভাবে বাঙালি নারীর রূপের গুণের বর্ণনা করে গিয়েছেন। তারা সম্ভবত কোনোদিন বিদেশে গিয়ে দেখে আসেননি। নইলে বাঙালি পুরুষ, যদি লম্বা হয় আর স্বাস্থ্য সচেতন হয় আরকি, অন্যদের চোখে কীভাবে ধরা পড়ে তার বিস্তারিত অনেক বর্ণনা আমাদের সামনে থাকত। রাফসান লম্বায় ভালোই, দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়, চোখে-মুখে মায়া। লোকে বলে, এই মায়া নাকি উপমহাদেশের বৈশিষ্ট্য–এখানকার সবাই অপুষ্টিতে ভোগে বলে!

সে যাই হোক, এই মায়া যে নজরকাড়া, তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই!

আমেরিকা থাকতেও প্রেমের নানা প্রস্তাব পেয়েছে রাফসান। কখনও আমেরিকানদের কাছ থেকে তো কখনও আফ্রিকানদের কাছ থেকে। কানে তোলেনি। ওর একমাত্র চিন্তা ছিল তখন লেখাপড়া।

দেশে ফিরে এসেও নানাভাবে বিয়ের কথা শুনতে হয়েছে ওকে। আব্বা-আম্মা তো সরাসরিই বলেছিলেন, বলিয়েছিলেন রিমুকে দিয়েও। কিন্তু সেসবও কানে তোলেনি। বিশেষ করে আব্বু, প্রখ্যাত

ডা. সেলিম যখন শয্যা নিলেন, তখন জোর চাপ দেওয়া হয়েছিল ওকে।

কিন্তু টলেনি রাফসান।

প্রায় ছয় মাস রোগে ভুগে মারা গেলেন ডা. সেলিম। ডাক্তার, সে যত দক্ষ বা যত নামকরাই হোক না কেন, দিন শেষে তো মানুষই। একদিন-না-একদিন তাকেও মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতেই হয়।

এরপর থেকেই কাজের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ও। ল্যানসেট, নিউ ইংল্যান্ড, প্লস ওয়ানসহ বড়ো-বড়ো সব জার্নালে ছাপা হয়েছে ওর লেখা। ডানে-বাঁয়ে ফিরে তাকায়নি কখনও।

আজ-কাল মাঝে-মাঝেই বিষণ্ন সময় কাটে বেচারার। আব্বার কথা, নিতুর কথা, আর বিশেষ করে আদনানের কথা মনে পড়ে খুব করে।

এখন চোখ বন্ধ করলে ছেলেটার রক্তাক্ত চেহারা দেখতে পায় সে, এখনও দেখতে পায় ছেলেটার দুষ্টুমি ভরা হাসি। রাতে কাঁপতে-কাঁপতে অহরহ ভেঙে যায় ঘুম।

আমেরিকায় ব্যায়াম করার অভ্যাসটা পোক্ত করেছিল। আজকাল জিমে যাবার সময় পায় না। তাই সকাল-সকাল উঠে অনেকটা রাস্তা দৌড়ে নেয়। সমস্যা হলো, জিমে ব্যায়াম করা দেহ শুধু দৌড়-ঝাঁপে মানতে চায় না। তার দরকার আরও শক্তিক্ষয়। তাই দেহের মধ্যাঞ্চলে হালকা একটু স্ফীতভাব লক্ষ্য করছে আজ কদিন হলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে-মুছতে বারান্দায় এসে বসল রাফসান। সকালে প্রায় দেড় ঘণ্টা দৌড়ে ব্যয় করেছে। এখন ফ্যানের নিচে বসলে বা গোসলে ঢুকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। তাই ঘাম একটু শুকিয়ে নেওয়া দরকার।

ওর ফ্ল্যাটটা ঢাকা শহরের অন্যতম দামি জায়গা...মানে গুলশানে হলেও, সামনে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। বাচ্চারা দিনের বেলা ওখানে খেলে। অবশ্যই ক্রিকেট; ফুটবল কম সময়ের উত্তেজনাকর খেলা হলেও, বাংলাদেশে ক্রিকেটেরই জয়-জয়াকার। কে জানে, সামনে খেলতে থাকা বাচ্চাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের মাশরাফি, সাকিব অথবা তামিম!

বাচ্চাদের খেলা দেখতে ভালোই লাগে। প্রায়শই দেখা যায়, কে ব্যাটিং করবে আর কে বোলিং–সেই চিল্লাপাল্লা লেগে খেলাই ভন্ডুল হয়ে গিয়েছে। এমনিতেই ব্যস্ত সময়ে সকালে খেলার সময় পায় না বাচ্চারা, শুধু ছুটির দিনে যা একটু সুযোগ পাওয়া যায়।

আজ শুক্রবার, স্কুল ছুটি। তবে রাফসানের ছুটি নেই। আর দশটা চাকরির মতো নয় ডাক্তারি, তার সাথে গবেষণা যোগ হলে তো কোনো কথাই নেই। এখনও চারটা প্রজেক্ট চলছে ওর, প্রজেক্টের আন্ডারে ভর্তি রোগীদের দেখে আসতেই হবে।

খানিকক্ষণ খেলা দেখে গোসল সেরে নিলো রাফসান, আগেই স্যুট-বুট বের করে রাখা আছে। গোসল থেকে বেরিয়ে পরে নিলো সেগুলো। এরপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আম্মার ঘরে ঢুকল।

স্বামী মারা যাবার পর, মিসেস রোখসানা একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছেন। রাতে তারও ঘুম হয় না। জীবন অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামীকে খুব একটা বেশি কাছে পাননি, অথচ তিনি চলে যাবার পর যেন ভদ্রলোকের অভাবটা আরও বেশি করে বোধ করছেন। ফজরের আজান ঘুম ভাঙায় তার। এরপর নামাজ পড়ে খুলে বসেন কোরআন শরীফ। নাস্তা খাবার আগে আর ওঠেন না। বাড়ির কাজ দেখার জন্য লোক রেখে দিয়েছেন, সেই দেখে সব কিছু। প্রতিদিন সকালের নাস্তা আর রাতের খাবারটা তাই

বাড়িতে খাওয়ার চেষ্টা করে রাফসান। নইলে হয়তো সারাদিন মায়ের সাথে দেখাই হবে না।

তবে অধিকাংশ দিন চুপচাপে খাওয়া সারে দুজন। টুকিটাকি কথা হয় কখনও, কখনও হয় না। আজ হলো না। খাওয়া শেষে কফির কাপ টেনে নিলো রাফসান। ওটা শেষ করে যখন চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন বেজে উঠল কলিংবেল।

'কে এলো!' বলতে-বলতে উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকাল রাফসান। উঠতে হলো না ওকে, কাজের বুয়া গিয়েই খুলে দিল দরজা।

ঝামেলা হয়েছে কোনো, মনে-মনে বলল রাফসান। কেননা দরজা খুলে দিয়েই সটান দাঁড়িয়ে গেল বুয়া। কিছু একটা দেখে চমকে না গেলে অমনটা হবার কথা না।

বিড়বিড় করতে-করতে উঠে দাঁড়াল ও, ভয় পায়নি একবিন্দুও। পুলিশের চাকরি ছেড়েছে তা-ও বছর পাঁচেক হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। একবার ভাবল, শোবার ঘরের দিকে এগোবে কিনা। সরকারি অস্ত্র জমা দিয়েছে বটে, কিন্তু সরকারি ট্রেনিং তো আর জমা দেয়নি! নিজের নামে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আগেই করিয়ে রেখেছে। একটা ওয়ালথার পি.পি.কে. আছে বাসায়। প্রতিদিন না হলেও, সপ্তাহে দুবার অন্তত পরিষ্কার করে অস্ত্রটা। আর মাসে একবার শুটিং ক্লাবে গিয়ে হাতের টিপ ঠিক করে আসে।

অবশ্য এখন অস্ত্র আনা বা না-আনা সমান কথা। যদি বিপজ্জনক কেউ দরজায় এসে থাকে, তাহলে ও শোবার ঘরে পৌঁছাবার আগেই যা হবার হয়ে যাবে। আর নইলে তো অস্ত্রটার দরকারই নেই।

মুচকি হাসতে-হাসতেই এসব ভাবল রাফসান। ডাক্তারি জীবন ওকে সম্মান এনে দিয়েছে। কিন্তু রোগী আগের মতো এত বেশি দেখতে হয় না বললেই চলে, তাই উত্তেজনা বলে যে একটা কথা আছে, সেটা প্রায় ভুলতেই বসেছে ও। আমেরিকা থাকতে মাঝে-মাঝে জিমে গিয়ে, কখনও বা বক্সিং ক্লাবে গিয়ে শিরায় অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহটা বাড়িয়ে আনত সে। কিন্তু এখন তো আর সেই সুযোগ নেই। তাই অল্পতেই অনেক সাত-পাঁচ ভেবে ফেলে।

শুয়ে-বসে দেহের পাশাপাশি মাথাতেও মেদ জমাতে শুরু করেছে রাফসান।

যাই হোক, উৎসুক চোখে দরজার দিকে এগোল সে। এদিকে বুয়া তখনও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায় দশ সেকেন্ড পর দরজা খুলে সরে এলো মহিলা। রাফসানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইজান, পুলিশ।' ভয়ে গলা দিয়ে বেচারির কথা বেরোতে চাইছে না। নতুন কাজে রাখা হয়েছে বলে ওর 'ভাইজানের' অতীত পরিচয়ও জানা নেই। 'আপনারে চায়।'

শান্ত হয়ে গেল রাফসানের স্নায়ু। পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা–বাংলাদেশের মানুষের সেটাই বিশ্বাস। কিন্তু নিজে এককালে এ.এস.পি. ছিল বলে ও ভালো করেই জানে–অধিকাংশ পুলিশই সৎ আর ভদ্র। দেশের অন্য সব পেশার মতো এই পেশারও নাম খারাপ করেছে গুটিকতক কিছু অসাধু কর্মকর্তা আর দেশের সিস্টেম। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

কী আশ্চর্য! দরজার ওপাশে অপেক্ষা করছেন ওর-ই এককালের বস, সৈয়দ মারুফ!

রাফসানকে দেখে হাসি ফুটে উঠল তার চেহারায়। ও চাকরি ছাড়ার পর, খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। অবশ্য এর পেছনে সৈয়দ

মারুফের পদোন্নতিও একটা বড়ো কারণ। বর্তমানে তেজগাঁও জোনের দায়িত্বে আছেন তিনি, উপ-কমিশনার পদে। জলপাই রঙের পূর্ণ উর্দি পরে এসেছেন আজ। একেবারে ছোটোখাটো জিনিসও বাদ দেননি। এমনকি কোমরের পাশে ঝুলছে পুলিশ-ইস্যু-কালো-বন্দুক! সদাহাস্য লোকটার চোখজোড়ায় কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তা আর বিষাদের ছাপ দেখতে পেল রাফসান।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোককে বসার ঘরে বসাল সে। তবে তার আগে একবার দেওয়ালঘড়ি দেখে নিতে ভুল করল না। শনিবার রাস্তা ফাঁকাই থাকে। ঘড়িতে এখন আটটা। আধা-ঘণ্টা পর রওনা দিলেও অসুবিধা নেই।

বেচারার জানা নেই, এখন ভাগ্যের বোনা যে জালে জড়াতে চলেছে, তা ওর সামনের কয়েক সপ্তাহের পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে দেবে!

অজ্ঞাত কাল আগের কথা

অনেকক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রাখার পর, আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে বসল ওয়াজেথ।

আটাশ বছরের যুবক এই মিশরীয়ের আসল নাম অবশ্য ওয়াজেথ না, ঠিকঠাকভাবে উচ্চারণ করলে যে নাম দাঁড়াবে, তা লেখা সম্ভব না অক্ষরেও। তবে কাছাকাছি যাওয়া যায়, পের-ওয়াদজেঠথ। বেশ ভারী একটা নাম, জন্মস্থানের নামানুসারে রাখা হয়েছে। অর্থটাও দারুণ, ওয়াজেঠথ দেবীর আলয়।

নাম যতই সুন্দর আর অর্থবহ হোক না কেন, এই বাঙাল মুলুকের কারও জিহ্বার আগায় তা আসে না। আর নামের বিকৃতি ঘটার চাইতে, নাম পরিবর্তন করে নেওয়াই ভালো!

তাই চম্পক নগরীর আপামর জন সাধারণের কাছে ওর নাম– ওয়াজেথ।

মাটির এক তলা বাড়িটাতে ঘর মাত্র তিনটি। একটায় ও ঘুমায়, একটায় খায় আর অন্যটা আলাদা করে রেখেছে প্রার্থনার জন্য। বিয়ে-থা করেনি এখনও, অবশ্য স্থানীয় মেয়েরা ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা কম করেনি। মেয়েদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? সম্ভ্রান্ত বংশ ছাড়া এমন ছয় ফুট লম্বা, সুদর্শন যুবক দেখা যায় নাকি?

জন্ম ওর মিশরের পের-ওয়াদজেঠথ শহরে, তবে বর্তমানে বাস করতে হচ্ছে চম্পক নগরীতে। তবে বড়ো হয়েছে পের-ওয়াদজেঠথ থেকে অল্প কিছুটা দূরের এক মরূদ্যানে। বাপ-মা আর পাঁচ ভাইবোনের সাথে আরামে না হলেও, আয়েশেই কাটছিল দিনকাল।

কিন্তু সুখ কপালে সইল না। একদিন বেদুঈন দস্যুরা আক্রমণ চালাল ওদের গ্রামে। ছোটো-ছোটো বাচ্চা আর যুবতিদের আলাদা করে, অবশিষ্ট সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করল! এরপর বেচে দেওয়া হলো ওদেরকে।

ওয়াজেথ, আপাতত এখানে এ নামেই তাকে ডাকা হোক, পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছিল বলেই মনে হয়। তবে স্রষ্টা সম্ভবত শেষ মুহূর্তে দয়া পরবশ হয়েছিলেন। তাই পারস্যের এক বিখ্যাত বণিকের ব্যক্তিগত দাসে পরিণত হয় সে। অন্যান্যদের ভাগ্য ততটা ভালো ছিল না। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে তারা হয় মিশরের আর নয়তো পারস্যের অন্যান্য কামুক ধনীদের লালসার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

ওয়াজেথের মালিক অন্য ধরনের মানুষ, তিনি দাসদের প্রতি অস্বাভাবিক সদয় আচরণ করতেন। অনেকে বলে, আসলে তার মা ছিল এক দাসী। কিন্তু তার বাবা সেটাকে গোপন রেখে নিজের আর তার স্ত্রীর সন্তান বলেই চালিয়ে দিয়েছিলেন জারেক্সকে। তবে জারেক্স সবই জানতেন। তাই পরবর্তীতে তিনি যখন পিতার সম্পত্তির মালিক হোন, তখন দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন।

খলের যুক্তির অভাব হয় না। জারেক্সের ভালোমানুষি আর সম্পদকে ঈর্ষার বিষে নীল হয়ে যাওয়া লোকগুলোরও হয়নি।

যদি কথাটা সত্যি না-ই হবে, তাহলে জারেক্সের জন্মের দুই মাসের মাথায় তার মা, মানে পিতার স্ত্রী আত্মহত্যা করবেন কেন?–এই হলো তাদের যুক্তি।

যেহেতু নাটকের কুশীলবরা কেউই এখন আর বেঁচে নেই। তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা কী লাভ? উত্তর তো আর মিলবে না।

যাই হোক, আসল কথা হলো–জারেক্স মানুষ হিসেবে ভালো, আর মনিব হিসেবে অসাধারণ।

লোকটা নিজেও ছিলেন নিঃসন্তান, তাই যেন ওয়াজেথকে সবসময় কাছে রাখতেন। হাতে ধরিয়ে শিখিয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্য। বছর কয়েক ঘুরতেই দেখা গেল, জারেক্সের ব্যবসার অর্ধেক দেখ-ভালের ভার এসে পড়েছে তরুণের ওপর!

মনিবকে অসম্ভব ভালোবাসত আর শ্রদ্ধা করত ওয়াজেথ, তাই কখনও কাজে গাফলতি করেনি। বয়স যখন ওর একুশ, তখন থেকে সমুদ্রপথেও জারেক্সের সাথে ভ্রমণে অংশ নিতে শুরু করে।

এমনই এক ভ্রমণে ঘটে যায় বিপর্যয়। তখনকার দিনে তো আর এখনকার মতো ম্যাপ-চার্ট এসব ছিল না। তাই আন্দাজেই জাহাজ চালাতে হতো ক্যাপ্টেনকে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ক্যাপ্টেনরা তা করতেনও। সমস্যা হতো যখন প্রলয়ংকরী কোনো ঝড়ে পড়ত জাহাজ, তখন। অনেক সময় দেখা যেত, ঝড়ের প্রকোপে দিক হারিয়ে জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে পানিতে। কোথায় যাচ্ছে, সামনে কী আছে–এসব ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই ক্যাপ্টেনের।

এই ভ্রমণেও তাই হলো। সাগরে জাহাজ ভেড়ানোর ঠিক সপ্তম দিনের মাথায় উঠল ঝড়। সেই উথাল-পাথাল ঝড়ে, দিক-টিক সব গুলিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। পাঁচ দিন পর যখন ঝড় থামল, তখন দেখা গেল সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে ভাসছে জাহাজ। রাত নামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে শুরু করল সবাই। হয়তো আকাশে তারার অবস্থান থেকে নিজস্ব অবস্থান আঁচ করা যাবে।

কিন্তু না, সবাইকে হতাশ করল ক্যাপ্টেন রুস্তম। জানাল, তার পরিচিত বা তার কাছে থাকা ম্যাপের সাথে আকাশের তারার অবস্থান মেলে না।

শুরু হলো আস্তো ভিদাতের সাথে লড়াই। মৃত্যু না স্থল, কোনোটা আগে আসে তা দেখার প্রতীক্ষা। যদি খাবার আর পানি শেষ হয়ে

যাবার আগে স্থল না পাওয়া যায়, তাহলে আস্তো ভিদাতের ফাঁস এসে লাগবে গলায়।

ঝড়ের কবলে পড়ে বিশ জনের দলটার সংখ্যা এমনিতেই নেমে এসেছিল নয়-এ। এখন আস্তে-আস্তে সেটা আরও কমতে শুরু করল।

প্রথমেই ঝরে পড়ল বয়স্করা। সেটাই স্বাভাবিক। জারেক্স ছিলেন এদের মাঝে। কোনোদিন কষ্ট সহ্য করতে হয়নি যে দেহকে, সে দেহ কষ্টের মাঝে টিকতে পারবে–এমনটা আশা সম্ভবত তিনিও করেননি।

নয় থেকে কমতে কমতে যখন তিন-এ নামল জীবিতদের সংখ্যা, তখন শুরু হলো বিপদ।

ঝামেলা যে একটা পাকতে যাচ্ছে, তা আরও আগে থেকেই বুঝতে পারছিল ওয়াজেথ। পুরো জাহাজে বেঁচে আছে কেবল ও, ক্যাপ্টেন আর দারিয়ুস। ক্যাপ্টেন আর দারিয়ুসের মাঝে অনেক দিনের পুরনো সম্পর্ক। একসাথে জাহাজ ভাসিয়েছে কম করে হলেও এক দশক। আর তাই প্রথম-প্রথম ওদের এক হয়ে গুজুর-গুজুর করাটাকে সন্দেহের চোখে দেখেনি ওয়াজেথ।

এদিকে জাহাজ আরব সাগরে ভেসে চলছে উদ্দেশ্যহীনভাবে, মুখ সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ধীরে-ধীরে কমে আসছে পানি, খাবার, রসদ। সেই যে ঝড় বন্ধ হয়েছে, তারপর আর এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। স্বভাবতই, টান পড়েছে সবকিছুতে। দুই ক্ষুধার্ত মুখের তাই আস্তো ভিদাতকে ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তিন মুখ থাকলে? একেবারেই কম। অবশ্য এক মুখ হলে সেই সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। থাক, আগে একটু তো বাড়ুক সুযোগ।

তারপর নাহয়...

সেই ভাবনা থেকেই একদিন আচমকা ডেকের ওপর হণ্টনরত ওয়াজেথের ওপর তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুস্তম-দারিয়ুস।

ওয়াজেথ নিজেও কম চালু না। হোক না মনিব ভালো, কিন্তু আদপে তো সে একজন দাস। পনেরো বছর থেকে দাসত্বের বোঝা বয়ে বেড়ানো যুবক ভালোভাবেই জানে তির্যক দৃষ্টির আর ফিসফিসানি আলোচনার অর্থ। আর তাছাড়া, জীবিতের সংখ্যা কমাবার চিন্তা যে ওর মাথায় খেলে যায়নি, সে কথা বললেও ভুল হবে। আর তাই বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কোমরে পারস্যের যুবকদের কাছে জনপ্রিয় দুধারী তলোয়ার ঝোলাতে শুরু করেছে। তা-ও আবার সেদিন সকাল থেকেই, হয়তো সেজন্যই ওর হাতে অস্ত্রটা দেখে চমকে উঠল দুই আক্রমণকারী। এক পা পিছিয়ে এলো একটু। ভেবেছিল, ফাঁকা মাঠে গোল দেবে। কিন্তু গোল রক্ষক যে দাঁড়িয়ে আছে, তা আঁচ করতে পারেনি!

মেঘহীন দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে ঝিকিয়ে উঠছে তলোয়ার। সূর্যের দিকে মুখ দিয়ে আছে ওয়াজেথ, আলোর ঔজ্জ্বল্যে দেখতে একটু কষ্টই হচ্ছে ওর। কিন্তু যখন বুঝতে পারল যে আক্রমণ হতে যাচ্ছে, নিজের তলোয়ারের সেই আলো প্রতিফলিত করে ফেলল দারিয়ুসের চোখে। একসাথে দুজন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেও তাই ব্যর্থ হলো সে প্রচেষ্টা।

তবে ক্যাপ্টেনের থামার কোনো কারণ নেই। এগিয়ে এসে ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর চালিয়ে দিল নিজ তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা।

তলোয়ারের খেলায় ওয়াজেথ একেবারে ফেলনা নয়, দক্ষতার সাথে নিজের তলোয়ার দিয়ে আঘাতটা এক পাশে সরিয়ে দিতে পারল ও। কিন্তু ক্যাপ্টেনও কম যায় না, সাথে-সাথে পাশ থেকে কোপ দেওয়ার ভঙ্গিতে আবার আঘাত হানল। পরপর দুটো এমন মারণ আঘাতকেও আয়াসের সাথে থামিয়ে দিল ওয়াজেথ।

এরপরই শুরু হলো আসল হামলা, কেননা দারিয়ুস ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে-ও যোগ দিল জীবন-মৃত্যুর এ খেলায়। দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে ক্যাপ্টেন একটু সরে যেতেই সে জায়গাটা দখল করে নিলো সে। হাতের তলোয়ারটা একদম সোজা চালিয়ে দিল।

চোখের কোনা দিয়ে শত্রুর ওপর নজর রাখছিল ওয়াজেথ, এক পা পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষা করল সে। না হলে পাকস্থলীতে ইয়া বড়ো এক ছিদ্র নিয়ে ডেকে পড়ে থাকতে হতো ওকে। এরপর পাশ থেকে আসা আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল তলোয়ার দিয়ে। দেহটাকে এক পাক দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, ফলে জায়গা পরিবর্তন হলো দুই যোদ্ধার। দারিয়ুসের আগের অবস্থানে এসেই প্রথম আঘাতটা হানল ওয়াজেথ, শত্রুর মতোই পাকস্থলী লক্ষ্য করে আঘাত হানল ও। দারিয়ুসের তলোয়ার সেটাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে দিল না।

ক্যাপ্টেন ঘাগু লোক, অনেক যুদ্ধ দেখেছে। লড়েছেও অনেক যুদ্ধে। আর পুরনো দিনের সহকর্মীর সাথে বোঝাপড়াও আছে। এমনটা হতে পারে তা আগেই ধারণা করেছিল সে। তাই একটু সামনে এসে সুবিধাজনক জায়গা করে নিয়েছে। দারিয়ুস আর ওয়াজেথের তলোয়ার আলাদা হতেই যার যার অবস্থান থেকে একটু সরে দাঁড়িয়েছে দুই যোদ্ধা। যুবকের দেহ এখন ক্যাপ্টেনের হাতের নাগালে। কালক্ষেপণ না করে তার ঊরু লক্ষ্য করে আঘাত হানল রুস্তম। সরে আসতে গিয়ে ওয়াজেথের তলোয়ার ওপরে উঠে এসেছে, তাই মাথা লক্ষ্য করে আঘাত হানলে কোনো লাভ হতো না।

আফসোস, হিসেব করতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের। আর তাই মাংসের গভীরে না গিয়ে, শুধু চামড়া স্পর্শ করেই ফসকে গেল তার তলোয়ার। যুবকের ঊরু থেকে উষ্ণ শোণিত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

হিসেবে ভুল করায়, তলোয়ার চালাবার ফলে সৃষ্ট জড়তা ক্যাপ্টেনকে বাধ্য করল এক পা সামনে এগিয়ে আসতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেল ওয়াজেথ। দারিয়ুস আঘাত হেনে ঝামেলা শেষ করার জন্য তলোয়ার উঠিয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন মাঝখানে এসে পড়ায় সেই চিন্তা বাদ দিতে হলো।

সৌভাগ্যের স্পর্শে উপহার হিসেবে পাওয়া এই দুইটা মুহূর্তের মাঝেই নিজেকে সামলে নিলো ওয়াজেথ। আঘাত খুব কড়া বলে মনে হচ্ছে না, চামড়ার গভীরে যেতে পারেনি তলোয়ার।

তবে রক্তের দেখা ওকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। সাথে-সাথে ডান-বাঁয়ে তলোয়ার চালাতে শুরু করল ও, লক্ষ্য ক্যাপ্টেন। গায়ের জোরে হানা তৃতীয় আঘাতটাও লোকটা যখন ঠেকিয়ে দিল, তখন নতুন এক উপায়ে এগোল ও। বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ক্যাপ্টেনের ডান হাত। নিজের তলোয়ার ধরা ডান হাত সর্বশক্তিতে এগিয়ে দিল ক্যাপ্টেনের চেহারার দিকে।

তলোয়ার লড়াইতে অভিজ্ঞ হলেও, হাতাহাতি লড়াই-এ খুব একটা দক্ষ না ক্যাপ্টেন। বেচারা নাবিক থাকা অবস্থায় প্রায়শই মারামারি করত বটে, কিন্তু ক্যাপ্টেন হবার পর আর ওসব কাজে হাত গন্ধ করতে হয়নি। অনভিজ্ঞতা অথবা দীর্ঘদিন ধরে চর্চা না থাকার ফল ভোগ করতে হলো বেচারাকে।

যথেষ্ট দ্রুত নড়ে উঠতে না পারায়, ওয়াজেথের তলোয়ারের হাতল এসে গুঁড়িয়ে দিল লোকটার নাক। টলে উঠল তার দুনিয়া, রক্তে চেহারা ভেসে গেল নিমিষে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল।

সেটাই হয়তো ভালো হলো তার জন্য। আস্তো ভিদাতের কাছে ওকে পাঠিয়ে দেবার জন্য চালানো তলোয়ারের ফলাটার লিক-লিক করে ওঠা দেখতে হলো না।

হৃৎপিণ্ডে মস্ত বড়ো এক ক্ষত নিয়ে ডেকের ওপর আছড়ে পড়ল রুস্তম ক্যাপ্টেন।

বসের এই অবস্থা দেখে ভড়কিয়ে গেছে বেচারা দারিয়ুস। ক্যাপ্টেন সাহেব ওর দেখা সেরা তলোয়ারবাজ। তারই যখন এই অবস্থা তখন...

কিন্তু পিছিয়ে আসাটাও যে অসম্ভব!

আহুরা মাজদার নাম নিয়ে এগিয়ে গেল ও।

উচ্চতায় দারিয়ুস খাটো। গরিব ঘরে জন্ম ওর। বেড়ে ওঠার সময়টায় না পেয়েছে পর্যাপ্ত খাবার, আর না পেয়েছে পর্যাপ্ত পুষ্টি। এদিকে মিশরীয় ওয়াজেথের বড়ো হয়ে ওঠা জারেক্সের প্রাসাদে। যেখানে খাবারের নেই কোনো কমতি। প্রায় এক মাথা লম্বা তাই সে দারিয়ুসের চাইতে।

দুই যোদ্ধা এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল একে-অন্যের দিকে।

'ক্যাপ্টেন বলছিলেন বলে...' শুরু করতে গেল দারিয়ুস। আশা, যদি পার পেয়ে যাওয়া যায়।

বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়ল ওয়াজেথ। দারিয়ুস বুঝে গেল, খোদ আস্তো ভিদাত দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

যা আছে কপালে ভেবে এক পা এগিয়ে এসে আঘাত হানল দারিয়ুস। কে জানে, ভয় না পেলে হয়তো জিতেই যেত ও। আকারের খামতিটা পুষিয়ে নিতে পারত অমানুষিক শক্তি দিয়ে। কিন্তু চোখের সামনে রুস্তমের মৃত্যুটা ওকে ভীত খরগোশ বানিয়ে ফেলেছে।

আয়াসের সাথে ডান দিক থেকে আসা আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল ওয়াজেথ, বাম দিকেরটা থামাতেও বেগ পেতে হলো না। হয়তো আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে যেত যুদ্ধ। কিন্তু পায়ের ক্ষতটা বড়ো ব্যথা

করছে, রক্তপাত বেড়ে দুর্বল হয়ে পড়ে কিনা–এই ভেবে শেষ আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

বাঁদিকের আঘাত হেনে ব্যর্থ দারিয়ুস এবার দুহাতে কোপ দেবার ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলল তলোয়ার, নামিয়েও আনল দক্ষতার সাথে। তারচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখিয়ে আঘাতটাকে ব্যর্থ করে দিল ওয়াজেথ। পুরোপুরি না থামিয়ে একটু বাঁ-পাশে সরে গেল ও, তলোয়ারের পাশটা দিয়ে নামতে থাকা অস্ত্রটা অল্প একটু সরিয়ে দিল ডান দিকে। বাতাস কেটে ওটা নিচে নেমে যাবার সাথে-সাথে খালি হাত দিয়ে শত্রুর হাতল ধরা দুই হাতে আঘাত হানল ও। একে তো লক্ষ্যভেদ হয়নি, তার ওপর ওয়াজেথের থাবা–দুইয়ে মিলে ডেকের সাথে গেঁথে গেল দারিয়ুসের দুধারী তলোয়ার। ভারসাম্য সামলাতে নিজেও এগিয়ে এলো একটু।

ডেকের কাঠের সাথে তলোয়ার গেঁথে যাওয়ার আওয়াজটা শোনামাত্র দারিয়ুস বুঝতে পারল, জীবনের শেষ সূর্যোদয়টা দেখে ফেলেছে ও। সময়মতো তলোয়ারটা বের করতে পারবে না। এক সেকেন্ড হলেও সময় লাগবে ওর, আর শত্রুকে এমন লড়াইতে এক সেকেন্ড সময় দেবার মতো বোকা না ওয়াজেথ।

আসলেই তাই, একটুও দেরি করেনি যুবক। দারিয়ুসের হাতে আঘাত হানার সাথে-সাথেই নিজের তলোয়ারটা ঠেলে দিয়েছে সামনে। ও জানে, তাল সামলাতে না পেরে সামনে ঝুঁকবেই লোকটা।

দারিয়ুসের পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো তলোয়ারের ফলা। বেচারার মুখ দিয়ে যেন রক্তের বাণ ছুটল।

চোখ তুলে হত্যাকারীর দিকে তাকাল দারিয়ুস, চোখে কী একটা প্রার্থনা...বোঝাবার আকুল আপ্রাণ চেষ্টা।

ধুঁকে-ধুঁকে মরতে চায় না ও, চায় দ্রুত মৃত্যু।

‘তাই হোক,’ শত্রুর কানে ফিসফিস করে বলল ওয়াজেথ। বুকে ধাক্কা দিয়ে খুলে আনল তলোয়ার। এদিকে দারিয়ুসের হাত থেকে ওর নিজের তলোয়ারের হাতল ছুটে গিয়েছে। সব ধরনের অবলম্বন হারিয়ে হাঁটু গেড়ে ডেকের ওপর আছড়ে পড়ল বেচারা।

‘শান্তিতে মরো।’ বলে তলোয়ারের এক আঘাতে দারিয়ুসের গর্দান কেটে ফেলল ওয়াজেথ।

জাহাজে জীবিত প্রাণী বলতে এখন একমাত্র সে একাই অবশিষ্ট আছে!

তিন

চুপচাপ কিছুক্ষণ সোফার ওপরে বসে রইলেন সৈয়দ মারুফ।

উশখুশ করতে শুরু করল রাফসান, অবশ্য লাভ নেই কোনো। কথা গুছিয়ে নেবার আগে মুখ খুলবেন না সৈয়দ সাহেব।

'গতকাল রাতে,' ভদ্রলোকের এই ব্যাপারটা ভালো লাগে রাফসানের। সরাসরি কাজের কথায় এসে পড়েন, ফালতু কথায় সময় নষ্ট করা তার ধাতে নেই। 'তোমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে!'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাফসান, বলে কী!

'ঠিকই শুনেছ,' ওর হতভম্ব অবস্থা টের পেলেন মারুফ সাহেব। 'তা-ও আবার একটা না...দুটো। একজন সিকিউরিটি গার্ড আর অন্যজন বিজ্ঞানী। আমাদের ধারণা, ওই বিজ্ঞানীই ছিলেন আসল টার্গেট। সিকিউরিটি গার্ডকে খুন করা হয়েছে পথের কাঁটা সরাবার জন্য।'

কথাগুলো হজম করতে একটু কষ্টই হচ্ছে রাফসানের। কয়েকদিন পর পর নতুন করে সব সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। টাকাও খরচ করা হয় দেদারসে। সেই জায়গায় এমন ঘটলে তো বিপদ! এমনিতেই বিদেশি ফান্ডিং কমে আসছে। তার ওপর যদি এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না।

একই লাইনে সম্ভবত পুলিশ কর্মকর্তা সৈয়দ মারুফ আর সি.ডি.আর.সি.র চিফ সায়েন্টিস্ট, সাজিদ রহমানও চিন্তা করছেন। অন্তত ভদ্রলোকের পরের কথায় তেমনটাই মনে হলো। 'আমরা আপাতত প্রেসকে দূরে রেখেছি। নিহত বিজ্ঞানীর নাম উমা চক্রবর্তী। তার বাবা প্রীতম চক্রবর্তী–'

‘আমি স্যারের নাম শুনেছি, বিখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট।’ সৈয়দ মারুফকে থামিয়ে বলে উঠল রাফসান।

‘হুম,’ মাথা নেড়ে মেনে নিলেন তিনি। ‘নিজেও বিজ্ঞানী হওয়ায় আপাতত চুপ থাকার অনুরোধ মেনে নিয়েছেন। তবে দুই-তিন দিনের বেশি চুপ থাকবেন বলে মনে হয় না। যে সিকিউরিটি গার্ড মারা গিয়েছে, সে অনাথ। তাই তাকে নিয়েও সমস্যা হবে না।’ সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি। ‘ব্যাপারটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?’

তা পারছে রাফসান। উমা মেয়েটাকেও সে ভালো করেই চেনে। আদর্শবাদী, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক; তবে প্রচণ্ড প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী। কাজ করে ওর সাথেই। তবে অফিস আলাদা। রাফসানের অফিস তিন তালায়। আর উমা বসে...মানে বসত, নিচতলায়। যতদূর শুনেছে, নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করেছিল মেয়েটা। কী, তা বলেনি কাউকে। শুধু সে জানত আর সাজিদ রহমান জানতেন। আজকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা সেমিনারে যাওয়ার কথা ছিল মেয়েটার। সেখানেই প্রথমবারের মতো সারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার কথা ছিল নিজের আবিষ্কার। ভাসা-ভাসা ভাবে শুনেছে–এই নয়া আবিষ্কার নাকি ওষুধ শিল্পের চেহারাই পালটে দেবে। কথাটা অবশ্য খুব একটা বিশ্বাস করেনি রাফসান। উমা মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ। রিকম্বিনেন্ট ডি.এন.এ. বা এই টাইপ ছাড়া ওর গবেষণার সাথে ওষুধ শিল্পের খুব একটা সম্পর্ক থাকার কথা না।

যাই হোক, মারা গিয়েছে মেয়েটা। তাই বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় আসার কথা ছিল, সেটাই করল ও। ‘গবেষণার কাগজ-পত্র কোথায়? আছে সব ঠিকমতো?’

সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন সৈয়দ মারুফ। ‘নাহ।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। ‘তুমি কি ব্যস্ত? এতো উশখুশ করছ কেন? কোথাও

যাবার কথা থাকলে ক্যান্সেল করে দাও। লম্বা সময় কথা বলতে হবে।'

*

আধ-ঘণ্টা পরের কথা। অফিসে যেতে দেরি হবে, এ কথা জানিয়ে বসার ঘরে ফিরে এলো রাফসান। বুয়া এরইমধ্যে নাস্তা দিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সেগুলো ছুঁয়েও দেখেননি সৈয়দ মারুফ। ওকে বসতে দেখে শুরু করলেন আবার।

'আমাদের সমস্যাটা সেখানেই। ভেতরে তেমন কাজের কোনো ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি। গতকাল রাত বারোটার দিকে ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা সন্দেহ করছি। অফিসের সময় শেষ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত অফিসেই থাকত এই বিজ্ঞানী। নিজস্ব গাড়ি ছিল বলে যাতায়াতে অসুবিধা হতো না। প্রায় একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তার বের হবার লক্ষণ দেখতে পেল না ড্রাইভার, তখন খোঁজ নিতে শুরু করে। ওর চোখেই প্রথম ধরা পড়ে সিকিউরিটির লাশ। এরপর আরেকজন সিকিউরিটিকে খুঁজে বের করে বসের অফিসে ঢুকতেই দেখে, টেবিলের পাশে পড়ে আছে মেয়েটির মরদেহ।

'প্রায়শই ভেতরে ঢুকতে হতো তাকে। মেয়েটির নাকি শুচিবায়ু ছিল, বাসা থেকে খাবার আনাত। সেটা এনে দিতে হতো এই ড্রাইভারকেই। বাইরে থেকেও মাঝে-মাঝে সালাদ আনিয়ে খেত নাকি।'

পুলিশের কর্মকর্তা দম নেবার জন্য একটু থামতেই রাফসান বলে উঠল। 'শুচিবায়ু নেই। থাকলে বাইরের খাবার খেতে পারত না। আমি যতদূর জানি, মেয়েটা শাকাহারী ছিল। আর জানেনই তো বাঙালির স্বভাব, অন্যরকম কিছুই আমাদের সহ্য হয় না।'

মাথা নেড়ে মেনে নিলেন সৈয়দ মারুফ, সম্ভবত দুটো কথাই। 'যাই হোক, লোকটার ভাষ্য মতে, বিগত কয়েকদিন হলো তার ম্যাডামকে খুব শঙ্কিত মনে হচ্ছিল। অফিস থেকে সব কাগজ-পত্র সরিয়ে নাকি বাসায় নিয়ে গিয়েছিল সে। শুধু একটা ফাইল থাকত টেবিলের ওপরে। লেখাপড়া জানে না লোকটা, তাই ফাইলের নাম-ধাম কিছু বলতে পারেনি। এতটুকু নিশ্চিত করেছে যে দুপুরের খাবার দিতে যাবার সময় ওই ফাইলটা টেবিলেই ছিল। এখন নেই।'

'ঘরের ভেতরটা–'

এবার রাফসানকে থামিয়ে দিলেন মারুফ। 'ভেতরে ফিঙ্গার প্রিন্ট খোঁজা হয়েছে কিনা? হয়েছে। এসব জ্ঞান অর্জনের জন্য তো তোমার কাছে আসিনি রাফসান।' পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, কথাটা একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। 'দুঃখিত, কিছু মনে করো না। চাপে আছি।'

মাথা নেড়ে রাফসান বোঝাল, ও কিছু মনে করেনি। চাপেই থাকার কথা। বাইরের বিশ্বে বাংলাদেশি গবেষণা-সংক্রান্ত যে-কয়টা প্রতিষ্ঠানের নাম আছে, তাদের মধ্যে সি.ডি.আর.সি. অন্যতম। এখানে কোনো ঝামেলা হলে সরকারের সবচেয়ে উঁচু মহল থেকে চাপ আসাটাও অস্বাভাবিক না।

'আমি কী করতে পারি, স্যার?' জানতে চাইল ও।

'তুমি তো জানোই, সরকারিভাবে আমাদের ওপর খুব একটা ভরসা রাখা হয় না,' শুরু করলেন মারুফ। 'তাই তোমার সাহায্য দরকার। একে তো তুমি ওই প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করো–আমাদের লিয়াজোঁ হতে

পারবে। তার ওপর ডন ওয়াসা আনুকে নির্মূল করার পেছনে তোমার যে কৃতিত্ব, সেটা ওপরের মহলের এখনও স্মরণ আছে। তুমি যদি কনসালটেন্ট হতে রাজি হও, তাহলে সম্ভবত কেসটা আমরা পাব। এই কেস দুই-তিন দিনেই সমাধান করার মতো দক্ষতা যে তোমার আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সেই সাথে আমার পূর্ণ সমর্থন পাবে। এবারে তো আর সেই আগেরবারের মতো অবস্থা নেই। আমি সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করতে পারব। তাই আমার অনুরোধ, তুমি কনসালটেন্ট হিসেবে থাকো।'

হতবাক হয়ে গেল রাফসান। এরকম কিছু আশা করেনি ও, অবশ্য করা উচিত ছিল। এই অনুরোধ ছাড়া ওর কাছে কেন আসবেন সৈয়দ মারুফ?

'কিন্তু, স্যার,' শুরু করল ও। 'গতবারের ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে সফলতা বলেন? মানছি, ডনকে শায়েস্তা করতে পেরেছিলাম আমরা। কিন্তু তার বিনিময়ে আমাদেরকেও তো একজন অফিসার হারাতে হয়েছে, তাই না? তাছাড়া ওসব অনেক আগের কথা। পাঁচ বছর ধরে এসবের সঙ্গে নেই। মাথায় এখন কিছু খেলবে বলে মনে হয় না।'

'সেসব আমিও জানি। কিন্তু দেখ, গতবার কিন্তু তোমার প্রফেশনাল নলেজের কারণেই আমরা নাদু গুন্ডার খুনিকে ধরতে পেরেছিলাম। এই কেসে লিড নিতে না চাও তো নিয়ো না। কিন্তু তোমার জ্ঞানটাকে তো ধার দাও। তোমার মতো বিজ্ঞানী আরও অনেকেই আছেন, মানছি সে কথা। কিন্তু তাদের কারও মাঠ-পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। তাই অনুরোধ করছি আবারও, না কোরো না।'

অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বেড়ে গিয়েছে রাফসানের দেহে। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু এদিকে গবেষণা আর ওদিকে আদনানের ব্যাপারটা বাধা দিচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সৈয়দ মারুফ।

'তোমার বসের সাথে আমি কথা বলে নেব। তিনি অমত করবেন না, প্রজেক্ট আছে তোমার শুনেছি। আশা করি ওগুলো সহকারীকে দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে। আর রইল বাকি আদনানের ব্যাপার–' একটু বিরতি দিলেন তিনি। 'এখন যদি আদনান উপস্থিত থাকত, তাহলে কী করতে বলত?'

'আরে ভাই,' উত্তর দিল রাফসান। 'ঝামেলা না করে রাজি হয়ে যান তো!'

আর কিছু বললেন না মারুফ।

'ঠিক আছে, আমি রাজি।' জানাল রাফসান। 'তবে আমার কিছু শর্ত আছে। এক, সরাসরি আপনার কাছে জবাবদিহি করব আমি। যদি আপনাকে কোনো কারণে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমিও থাকব না। দুই, আমি সর্বময় ক্ষমতা চাই। আমার আদেশ বিনা প্রশ্নে সবাইকে মানতে হবে। আর তিন, আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী দিতে হবে একজন। এস.আই. হলেই ভালো হয়।'

'আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম,' উত্তর দিলেন সৈয়দ মারুফ। 'আমি রাজি। আর আমার সাথে করেই নিয়ে এসেছি আমার দেখা সবচেয়ে চালাক এস.আই.কে।' মুচকি হাসলেন তিনি। 'তবে ওর সামনে কখনও বলিনি কথাটা। একটু মাথা গরম। যাই হোক–পরিচয় করিয়ে দেই, নিচেই দাঁড়িয়ে আছে।' বলে পকেট থেকে ফোন বের করলেন তিনি। নম্বর ডায়াল করে বললেন, 'ওপরে এসো, শিহান।'

মিনিট তিনেকের মাঝেই পালিত হলো সেই আদেশ। রাফসানের বাসায় প্রবেশ করল পঁচিশ বছর বয়সি এক যুবক। ওর সমান না হলেও, লম্বায় কম যায় না–পাঁচ ফুট আট-নয় তো হবেই, পেটা শরীর। চেহারায় ছেলেমানুষিভাব। স্যালুট ঠুকল যুবক।

‘শিহান, এ হচ্ছে রাফসান। সি.ডি.আর.সি.র কেসটায় আমাদের কনসালটেন্ট।’

হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। ‘আমি আশিকুর রহমান, স্যার। ডাক নাম শিহান।’

করমর্দন করল রাফসান। ‘চলো তাহলে, কাজে নামা যাক।’

*

চোখের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ছে, অথচ নড়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই ওয়াজেথের দেহে।

ক্যাপ্টেন রুস্তম আর নাবিক দারিয়ুসের সাথে লড়াই করার কয়েকদিন পরের ঘটনা। পায়ে পাওয়া আঘাতটা বেশ টাটাচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে যা-যা করা দরকার, করেছে ও। প্রথমেই একটা পাত্রে প্রস্রাব করে নিয়ে সেটাকে ঢেলে দিয়েছে ক্ষতের ওপর। আহত স্থানে পচন ধরা আটকাতে এই পদ্ধতি মিশরে অহরহ ব্যবহার করত।

এরপর পরিষ্কার কাপড় ধুয়ে নিয়ে, সেটা দিয়ে ক্ষতের জায়গাটা বেঁধে রেখেছিল ও। কিন্তু কাজে যে দেয়নি এসব টোটকা, তা এখন পরিষ্কার।

পরেরদিনই গা কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। আসি-আসি করছিল রাত থেকেই। ভাগ্য ভালো, জাহাজের মুখ যেন পরিবর্তন না হয় সেজন্য আগেই হালটাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল ও। একটা পরিষ্কার কোণ বেছে নিয়ে মজুদ করেছিল পানি, খাবার আর বাড়তি কম্বল। পরের দিন বিকাল থেকেই আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটছে ওয়াজেথের দিন। এই জ্ঞান পাচ্ছে, আবার হারাচ্ছে। নড়তে-চড়তে পারছে না একদম। এই কদিন চেহারা আলোর স্পর্শ পেয়েছে কিনা, জানে না ও। অবশ্য

কয়েকদিন পার হয়েছে, নাকি একদিন, তা-ও নিশ্চিত করে বলতে পারবে না।

বাবা-মা আর ভাইবোনদের কথা খুব মনে পড়ছে হঠাৎ করে।

বাবা রাশভারী ছিলেন খুব, কথা বলতেন কম। পেশায় ছিলেন মূর্তি নির্মাণকারী, নেশায় কবি। অমিশুক ছিলেন বলে পের-ওয়াজেঠথ শহরটা খুব কাছাকাছি হলেও, হাতে গোনা কয়েকবার পা রেখেছিলেন ওখানে। তা-ও কাজের প্রস্তাব পেলে তবেই।

খুব নাম ছিল বাবার হাতের মূর্তির। তার ছোঁয়ায় ওগুলো যেন প্রাণ পেত। বাড়ির এক পাশেই ছিল ওর কাজ করার জায়গা। সেখানে বেশ কয়েক রাত 'পথ ভুলে' উপস্থিত হয়েছিল কিশোর ওয়াজেথ। মনে আছে, বীভৎস লাগত তখনকার অর্ধ-বানানো মূর্তিগুলো। মনে হতো যেন প্রবল আক্রোশে কেউ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মিশরের দেবতারা স্বভাবেও ছিলেন এমন। পান থেকে চুন খসলেও নেমে আসত তাদের অভিশাপ।

বাবা এতটাই নামকরা ছিলেন যে যখন পের-ওয়াজেঠথের পাশে উল্কাপাত হলো, তখন তাকেই পাঠানো হলো সেই উল্কার অংশ নিয়ে আসতে। হুকুম দেওয়া হলো–ওয়াজেঠথ দেবীর এক মূর্তি বানাতে হবে ওই পাথর কেটে।

অদ্ভুত ছিল সেই পাথরটা। অবশ্য মহাকাশ থেকে যা এসেছে, তা অদ্ভুত হবারই কথা। কালো মিশমিশে দেহ ছিল ওটার; যেখানে পড়েছিল তার আশপাশের অনেকটা অংশ জুড়ে, এমনকী দিনের তপ্ত সূর্যের নিচেও শীতলতা অনুভব করা যেত। যে কাউকে আনতে পাঠালেই হতো হয়তো, কিন্তু সমস্যাও ছিল। শীতলতা আর ছায়া পেয়ে ওই পাথরের চারপাশ ছেয়ে গিয়েছিল সাপে! অগণিত সাপ যেন আঁকড়ে ধরেছিল পাথর খণ্ডটাকে।

বাবা কীভাবে কাজটা পেরেছিলেন, তা আজও বুঝে পায় না ওয়াজেথ। অবশ্য দেবী ওয়াজেঠথের মূর্তি বানাবার জন্য যেহেতু কাজে লাগান হবে উল্কাপিণ্ডটাকে, তাই হয়তো দেবী নিজ হাতে বাবাকে রক্ষা করেছিলেন। হাজার হলেও, সাপের দেবী তো তিনি নিজেই।

অনেকটা পাথর নিয়ে এসেছিলেন বাবা। একবারে বইতে পারেননি বলে কয়েক বারে আনতে হয়েছিল। কালো পাথর কুঁদে অসাধারণ এক মূর্তি বানিয়েছিলেন দেবীর। ওটার দেহ ছিল সাপের, মাথা এক মহিলার। কাছ থেকে দেখলে হয়তো ওটাকে প্রাণহীন মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোঝার একদম জো নেই!

বেঁচে গিয়েছিল পাথরের অনেকটুকু। সেগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্য ছোটো আকারের এক ওয়াজেঠথকে বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। আধ-হাতের সমান লম্বা মূর্তিটা অবশ্য ছিল অন্যরকম দেখতে, মানুষের মতো। মনে হতো যেন ধ্যানে বসে আছেন কেউ!

আরও একটা কাজ করেছিলেন বাবা। ওদের ভাইবোন সবার জন্য ছোটো-ছোটো কয়েকটা লকেট তৈরি করেন। কালো লকেটগুলো ছিল একদম পাতলা, ওর একদম ছোটো দুই ভাইবোনের জন্যও বানিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা একটু বেশিই ছোটো ছিল বলে মা পরতে দেননি, যদি মুখে দিয়ে ফেলে তো? গলায় আটকে গেলে আর দেখতে হবে না!

ওগুলো তাই ওয়াজেথের কাছেই থাকত। জিনিসগুলো খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ওর। নিজেরটা সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখত। আর অন্যগুলো শোবার সময় বালিশের নিচে না রাখলে যেন ঘুমই হতো না। বড়ো খণ্ডটার মতো এই ছোটো মূর্তিটার চারপাশেও বিরাজ করত

অদ্ভুত এক শীতলতা। ঘুমটা ভালো হতো বলে ওটার পায়ের কাছেই শুত ভাইবোনেরা।

সাপের ভয় পায় না ওরা কেউ। পাবেই বা কেন? ওয়াজেঠথ দেবী কি তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কাউকে সাপে কাটার অনুমতি দেবেন? অসম্ভব!

আজও পকেটে ছোটো দুই ভাইবোনের লকেট নিয়ে ঘুরছে ওয়াজেথ। যদি কোথাও...কোনোভাবে...কোনো কারণে দেখা হয়ে যায়?

যেদিন বেদুঈনরা ওদের গ্রামে আক্রমণ চালিয়েছিল, সেদিন...নাহ, ভুল হলো...সেই রাতের দৃশ্যগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও। আচমকা চিৎকার আর কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওয়াজেথের। বয়স তখন একদম কম, তাই ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল বেচারা। উপায়ান্তর না দেখে ওয়াজেঠথের মূর্তিটা কোলে নিয়ে বসে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল ও।

বিফলে গিয়েছিল সেদিনের সব আকুতি।

আচমকা একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছিল ওয়াজেথ–মায়ের কণ্ঠ চিনতে বেগ পেতে হলো না। বেচারা জানে না, চোখের সামনে স্বামীকে তলোয়ার বুকে নিয়ে আছড়ে পড়তে দেখে মায়ের গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওই জান্তব আওয়াজটা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, স্বামীর ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে মহিলাকেও।

এরপর দস্যুরা এসে ঢোকে ওদের ঘরে। ভাইবোনদেরকে ধরে বেঁধে নিয়ে যায়। এই বয়সি ছেলেমেয়েদের দাস হিসাবে বাজারে খুব চাহিদা। নিজের মতো গড়ে নেওয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মতোই নিরীহ হয় এরা।

সেই শেষ দেখা, এরপর আর পরিচিত মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওয়াজেথের। তবে কপাল ভালো, লকেট আর মূর্তিটা হাতছাড়া করতে হয়নি। দেবীর রুষ্ট হবার ফল জানা ছিল দস্যুদেরও! জানে, উপাসকের কাছ থেকে উপাস্যকে আলাদা করার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ।

কী দরকার রে বাবা?

জ্বরে আচ্ছন্ন ওয়াজেথ শুয়ে শুয়ে ভাবছে এসব। এদিকে বাতাস পেয়ে সোজা ছুটছে ক্যাপ্টেনহীন... নাবিকহীন জাহাজ।

ওয়াজেথের জানা নেই, অচিরেই একদল সওদাগর দেখা পাবে ওর জাহাজটার। অদ্ভুত দর্শন এই সওদাগরদের...ধুতি পরে চলাফেরা করে, গায়ে থাকে কুর্তা। মাথায় তিলক থাকলেও থাকতে পারে, না-ও পারে। অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলে তারা। ব্যবসার জন্য চলে যায় দূর-দূরান্তে। ওয়াজেথের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে ওরাই। এমন সেই চিকিৎসা পদ্ধতি, যার নাম কেবল ও কেন, ওর দুনিয়ার কেউ শোনেনি–আয়ুর্বেদ!

আর ওকে নিয়ে যাওয়া হবে অসম্ভব সুন্দর এক জায়গায়।

হাজার বছর পর যেই জায়গাটার নাম হবে 'গোয়া'!

*

শেষ যে স্মৃতি মনে পড়ে ওয়াজেথের, তা হলো প্রচণ্ড জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার।

জাহাজের এক কোনায় একটা আবাস বানিয়ে নিয়েছিল ও। হাতের কাছে রেখেছিল সব রসদ, চোখ খুললেই দেখতে পাচ্ছিল কাঠের ছাদ। এখন দৃশ্য পুরো পালটে গিয়েছে। মাথার ওপরের কাঠ প্রতিস্থাপিত হয়েছে পাতার ছাউনিতে!

ছেলেটার জানা নেই, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে ওকে নিয়ে। কয়েকবার যম প্রায় জিতেই যাচ্ছিলেন, অনেক কষ্টে বৈদ্য গৌতম টেনে ফিরিয়েছে ওকে। প্রচণ্ড জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, সেই সাথে আরেকটু হলেই পচন ধরত ক্ষতে।

চোখ খুলেই প্রথমে পাতার ছাউনি নজরে পড়ল ওয়াজেথের, এরপর দেখতে পেল বৈদ্যকে। এমন কমবয়সি চিকিৎসক সহজে দেখা মেলে না। আটাশ কি উনত্রিশ হবে লোকটার বয়স। মাথাটা প্রায় কামানো, শুধু পেছন দিকে একটা টিকির মতো আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত হলেও, কোমরে ধুতি জড়ানো। ওয়াজেথ অবশ্য এই ধুতির সাথে খুব একটা পরিচিত নয়।

খুক-খুক করে কেশে, গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেল ও।

কাজে দিল ফন্দি, অনেকটা চমকে উঠে রোগীর দিকে ফিরে তাকাল বৈদ্য। ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরেকটু হলেই যেন লাফ দিত। আসলে কম বয়সে পিতার কাছে শিক্ষা নেওয়া শুরু করেছে বলে, অল্পদিনে বৈদ্য হয়ে গিয়েছে গৌতম। কিন্তু আদপে তো বয়স কম। তাই অনুভূতির প্রকাশও চড়া সুরে বাঁধা।

নিজেকে সে সামলেও নিলো খুব দ্রুত। এগিয়ে এসে কুসুম গরম পানি ছোঁয়াল ওয়াজেথের ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বলল, ‘তোমার আহেনতো জ্বরা হয়েছিল। এখন এটা খাও। ভালো লাগবে।’

বিজাতীয় ভাষার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না ওয়াজেথ। কিন্তু গৌতমের কথার নম্রভাব আর চেহারার নরম প্রকাশ বুঝতে পারল

পরিষ্কার। দ্বিরুক্ত না করে পান করে নিলো ও। তবে সাথে-সাথে বিকৃত হয়ে গেল চোখ-মুখ। রোগীর চেহারা দেখে হেসে ফেলল বৈদ্য–সুদর্শন চূর্ণ খেয়ে কারও মুখেই হাসি ফোটে না।

জ্বরে ভুগে দুর্বল হয়ে গিয়েছে ওয়াজেথের দেহ। তাই অল্প একটু পরিশ্রমেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল যেন সে। দেহটাকে আর ধরে রাখতে না পেরে এলিয়ে দিল বিছানায়।

কিছুক্ষণের মাঝেই দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসল গৌতম। যে সওদাগরের জাহাজে করে এসেছে এখানে, তার পায়ের আওয়াজ চিনতে পারছে।

আসলেই এসেছে সওদাগর। এর বয়েসও বেশি না। টেনে টুনে পঁয়ত্রিশ হবে। তবে বেনিয়া হিসেবে খুব নামকরা। এত অল্প বয়সেই গতানুগতিকে অরুচি চলে এসেছে অর্জুন সওদাগরের। সবাই যেখানে ত্রিবেণীর দিকে যায় জাহাজ নিয়ে, সেখানে পুরোপুরি উলটো দিকে রওনা দিয়েছে অর্জুন। ওর কথা হচ্ছে, মাছ মারলে ঘোলা পানিতে মারাই ভালো। পরিষ্কার পানিতে তো যে কেউ মারতে পারে। ওতে আর কৃতিত্ব কোথায়?

গৌতম ওর ছেলেবেলার খেলার সাথি। বৈদ্যের মা মারা গিয়েছেন আগেই। পিতা গত হয়েছেন এক বছর আগে। বিয়ে-থা করে সংসার পাতার ইচ্ছা আছে বৈদ্য মহাশয়ের। কিন্তু সমস্যা হলো, বিয়ে করে ফেললে তো আর উদ্দাম জীবনের হাতছানিতে সারা দেওয়া যাবে না। তাই যা করার, আগেই করে নিতে হবে!

এসব ভেবেই জাহাজের বৈদ্য হিসেবে রওনা দিয়েছে বন্ধুবর অর্জুন সওদাগরের সাথে। ব্যবসাও হয়েছে বেশ ভালো। বিকল্প একটা পথ ব্যবহার করার সার্থকতা প্রমাণ করতে পেরে অর্জুন সওদাগরের মনও তাই বেশ ফুরফুরে।

ব্যবসা করার জন্য যেসব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, তা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে–এমন সময় বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়েই আবার জাহাজ ভাসায় অর্জুন। দিন সাতেকের রসদ নিয়ে বেরিয়েছিল ওরা। রক্তে যার পানির ডাক, সে কি আর বসে-বসে মাছি মেরে দিন কাটাতে পারে?

নৌকা ভাসাবার দ্বিতীয় দিনের কথা, আচমকা একটা জাহাজ নজরে পড়ল অর্জুনের। চুপচাপ অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই ভেসে যাচ্ছিল ওটা। না ছিল প্রাণের কোনো চিহ্ন, আর না ছিল কোনো কোলাহল! অবাকই হয়ে গিয়েছিল অর্জুন। নাবিকদেরকে ওই জাহাজটার সাথে নিজের জাহাজ লাগাবার আদেশ দিল সে।

ডেকে নেমেই অবাক হয়ে গেল। এখানে যে ছোপ-ছোপ রক্ত দেখা যাচ্ছে! নিশ্চয়ই জলদস্যু পড়েছিল! কিন্তু তা হলে জাহাজটা পানিতে ভাসবে কেন? জলদস্যুরা আবার জাহাজ ছেড়ে দেয় নাকি? নাহ, অন্য কোনো কাহিনি অবশ্যই আছে। সম্ভবত বিদ্রোহ হয়েছে জাহাজে!

কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজি করতেই পেয়ে গেল অকাট্য প্রমাণ। এক কোনায় চুপচাপ শুয়ে আছে এক যুবক, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞান হারিয়েছে। একটা পা ভিজে গিয়েছে রক্তে। আঘাত লেগেছে ওখানে। ছেলেটা যে বেশ চালু, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল অর্জুন। জ্ঞান হারিয়েছে বটে, কিন্তু হারাবে যে তা আগেই বুঝতে পেরেছিল। চারপাশে সব রসদ জমা করে তবেই শুয়েছে। দেখতেও খানিকটা অদ্ভুত, পোশাকেও। পরিচিত কারও মতোই না ছেলেটা, তবে আশ্চর্য এক মায়া আছে চেহারায়।

এক পা এগিয়ে তার কপাল স্পর্শ করল অর্জুন। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা!

তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল সওদাগর, সম্ভব হলে বাঁচাবে ছেলেটাকে।

সম্ভব হলে বলছে কেন! গৌতমকে ধন্বন্তরি বললেও অত্যুক্তি হবে না। ও কিছু না কিছু একটা করবেই।

ছেলেটাকে নিজের জাহাজে আর ওর জাহাজটাকে সাথে করে আনার নির্দেশ দিল সে।

*

‘কী অবস্থা ছেলেটার?’ জানতে চাইল অর্জুন।

‘আছে ভালোই। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সুদর্শন চূর্ণ দিয়েছি। এখন–’ অর্জুনের চেহারার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল গৌতম। বন্ধুর মাথায় যে ওর বলা একটা কথাও ঢোকেনি তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

‘মানুষের ভাষায় কথা বলা যায় না?’ হাস্যরসের ছোঁয়া অর্জুনের গলায়।

‘জ্বর হয়েছিল,’ ভোঁতা মুখ করে বলল গৌতম। ‘এখন ভালো।’

হেসে ফেলল অর্জুন। ‘রওনা দেওয়া যাবে কবে?’ জানতে চাইল ও।

‘ছেলেটাকে সাথে করে নিয়ে যেতে চাও?’

‘হ্যাঁ। কেন, সম্ভব হবে না?’

‘হবে। তবে কয়েকদিন সময় দিতে হবে। এই ধরো দুই বা তিন দিন।’

‘আচ্ছা। অসুবিধা নেই,’ মাথা নাড়ল অর্জুন। ‘আমাদের হালকা-পাতলা ব্যবসা বাকি আছে। দিন চারেকের মাঝে হয়ে যাবে।’

মাথা নাড়ল গৌতম। চার দিনের মাঝে এর জ্বর ভালো হয়ে যাবার কথা। তারপরও মন্তব্য করার আগে একবার দেখে নিলো ছেলেটার পায়ের ক্ষত। শুকিয়ে আসছে। দূর্বা ঘাস পিষে তৈরি করা মলমটা নতুন এক পুল্টিশে করে লাগিয়ে রাখল আবার। একটু কেঁপে উঠল বিদেশি, চেহারা কুঁচকে ফেলেছে। ব্যথা পেয়েছে, বুঝতে পারল গৌতম। কিন্তু রোগীর স্বার্থেই ওকে এইটুকু ব্যথা দিতে হবে। নইলে যে বাঁচবেই না বেচারা!

‘অসুবিধা হবে না বলেই মনে হচ্ছে।’ বলল বৈদ্য।

‘কথা-বার্তা কিছু বলেছে?’

‘বলেছে। আবার শুনেছেও। কিন্তু না সে কিছু বুঝতে পেরেছে, আর না আমাকে বোঝাতে পেরেছে।’

‘হুম, ছেলেটা যে বিদেশি তা তো আমরা আগে থেকেই জানি।’ মন্তব্য অর্জুনের।

‘হুম।’

‘বাড়ি ফিরতে তো কমপক্ষে মাস দুয়েক লেগে যাবে। এরমাঝে কাজ চালাবার মতো ভাষা শেখানো যাবে না?’

‘যাবে আশা করি।’

‘খুব ভালো, এর কাহিনি জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার।’

মাথা নাড়ল গৌতম, বোঝাল যে আগ্রহ ওরও কম হচ্ছে না।

বিদায় নিয়ে প্রায় বাইরেই চলে এসেছিল অর্জুন, এমন সময় আবার কী মনে পড়ায় ফিরে এলো। ‘ভালো কথা। যে ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিলে, সেগুলো পেয়েছ?’

‘প্রায় সবই পেয়েছি। কয়েকটা বাকি আছে।’ উত্তর দিল গৌতম।

‘তাহলে আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে সব বুঝিয়ে দিও। যা-যা কেনা বাকি আছে, ও-ই কিনে দেবে।’

‘ঠিক আছে।’ মাথা দোলাল গৌতম।

‘ভুল করো না যেন, নইলে বাবাকে তো চেনই...অবস্থা খারাপ করে ফেলবেন আমার।’ এবার অর্জুনের মুখ কুঁচকানোর পালা।

হেসে ফেলল গৌতম।

ভবিষ্যতের কিংবদন্তি আর বর্তমানের নামকরা বণিক, চাঁদ সওদাগরকে কে না চেনে?

*

জাহাজে প্রায় মাসখানেক গৌতমের সাথে কাটাবার পর, নতুন ভাষায় অল্প-স্বল্প কথা বলতে শিখেছে ওয়াজেথ। মনের ভাব পরিষ্কার করে বোঝাতে না পারলেও, প্রয়োজনের কথা পারে।

অর্জুনের সাথে খুব একটা বেশি দেখা হয়নি এই মাস দুয়েকের মাঝে। খুব ব্যস্ত যুবক। এবারের ব্যবসায় দারুণ লাভ করেছে ওরা। আর তাই সেগুলো নিয়ে একটু বেশি সময় দিতে হচ্ছে ওকে। তবে যে-কোনো দিন ডাক পড়বে, সেটা বুঝতে পারছে।

গৌতমের সাথে ভালোভাবে মিশে গিয়েছে এই কদিনে। গৌতম সম্ভবত মনে-মনে একটা শিষ্য চেয়েছিল। ওয়াজেথকে পেয়ে তাই খুশিই হয়েছে। তবে অল্প কদিনেই বুঝে গিয়েছে, ছেলেটার রক্তে রয়েছে উত্তেজনাকর জীবনের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ। মানুষের জীবন বাঁচানো যত মহান পেশাই হোক না কেন, তা এই ছেলেকে টানবে না।

‘বুঝলে ওয়াজেথ,’ বেচারা মিশরীয় যুবকের নামটা কেন যেন ওর কণ্ঠে আসতেই চায় না। তাই নাম নিজের মতো করে ছোটো করে নিয়েছে। ‘আমাদের ক্যাপ্টেনের বাবা, চাঁদ সওদাগর খুব ভালো মানুষ। কিন্তু বড়ো কড়া।’

‘হ...হুম।’ সঠিক শব্দটা খুঁজে পেতে বড়ো কষ্ট হচ্ছে ওয়াজেথের। ‘ক্যাপ্টেন অর্জুন ভালো।’

‘তোমার ক্যাপ্টেনের চাইতেও?’

চেহারা কালো হয়ে গিয়েছে ওয়াজেথের। ‘ক্যাপ্টেন রুস্তম...ভালো না।’

‘তা তো বুঝতেই পারছি। যাক সে কথা। চাঁদ সওদাগরের ছয় ছেলে, বুঝছ? সবচেয়ে বড়ো ছেলে আমাদের এই অর্জুন। সম্ভবত তার সবচেয়ে কাছেরও। দূর-দূরান্তে চলে যায় ছেলেটা। ভবিষ্যতে আশা করা যায় ওর হাতেই উঠবে বাপের সাম্রাজ্য সামনে এগিয়ে নেবার ভার।’

পরেরদিন সকালেই ডাক পড়ল ওয়াজেথের। কৌতূহল নিয়েই ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকল ও। দেখতে পেল, যুবক বণিক চুপচাপ বসে আছে চেয়ারে। ব্যবসা শেষ করে ফিরে যাবার সময়ও কাজ করা বন্ধ রাখেনি।

‘এসো, ওয়াজেথ।’ গৌতমের দেখাদেখি অর্জুন-ও এই নামে ডাকতে শুরু করেছে ওকে। প্রথম-প্রথম ঠিক করে দিত ও। কিন্তু এখন আর গায়ে লাগে না। ডাকুক না যে নামে ইচ্ছা, ক্ষতি তো আর হচ্ছে না।

অর্জুনের দেখানো চেয়ারে বসল ওয়াজেথ।

‘শরীর কেমন তোমার? সব ঠিক আছে তো?’

মাথা ঝাঁকাল ওয়াজেথ। কথা যতটা সম্ভব কম বলার চেষ্টা করছে সে এখন। হাজার হলেও, ভাষাটা এখনও পুরপুরি রপ্ত করতে পারেনি।

‘ভালো, খুব ভালো। ডেকে পাঠালাম তোমার গল্প শোনার জন্য। তুমি যে এদেশের কেউ না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বলবে তোমার গল্প?’

কথা কম বলতে চাইছিল ওয়াজেথ। কিন্তু যে জীবন বাঁচিয়েছে, তাকে তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল সে।

*

ঘণ্টাখানেক পর, চুপচাপ বসে আছে দুজন, টেবিলের দুইপাশে। সদ্য শোনা গল্পটা হজম করার সময় দিচ্ছে অর্জুন নিজেকে। অদ্ভুত লাগছে ওর। সেই হাজার-হাজার মাইল দূর দেশের এক লোক এসে উপস্থিত হয়েছে ওদের মাঝে! তা-ও এভাবে!

নিজে প্রায়শই নৌ-পথে ভ্রমণ করে বলে, সামনে বসে থাকা এই যুবক একইসাথে কতটা সৌভাগ্যবান আর দুর্ভাগ্যবান, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে অর্জুন। সেই কোথায় পারস্য, আর কোথায় গোয়া! এতটা পথ এভাবে পাড়ি দিয়ে আসা...তা-ও কিনা একা-একা জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থায়! ভাগ্যদেবী নিজে সাহায্য না করলে এমনটা হয় না।

ছেলেটা একটু অদ্ভুতও। গৌতমের সেবায় প্রথম যেদিন জ্ঞান ফিরল, সেদিন বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেনি। পরেরদিন উঠেই শুরু করল চিল্লাচিল্লি। এদিকে ওর ভাষাও কেউ বুঝতে পারছে না। কী চাচ্ছে বা কী সমস্যা, তা বুঝতে না পারলে সমাধান হবে কী করে?

বেশ খানিকক্ষণ পর, গৌতম আঁচ করতে পারল ব্যাপারটা। ছেলেটা বার-বার নিজের গলার দিকে হাত দিচ্ছে আর সেই সাথে হাত দিয়ে চারকোনা কিছু একটা দেখাচ্ছে। ওয়াজেথ প্রথম যখন আসে ওর কাছে, তখন যুবকের গলায় ছিল ঠিক তিনটা মালা। মালাগুলো সুতোর তৈরি, একদম নিচে কালো একটা চাকতি ঝুলছিল। শুরুতেই ওগুলো আর ছেলেটার পরনের কাপড় খুলে নিয়েছিল গৌতম, আরেকটু হলেই পায়ের ক্ষতে পচন ধরত। আর তাই পরিষ্কার কাপড় পরানোটা জরুরি হয়ে পড়ে।

মালাগুলো সাবধানে নিজের কাপড়-চোপড়ের সাথে রেখেছিল গৌতম। সেগুলোই বের করে ধরল ছেলেটার সামনে।

কাজ হলো সঙ্গে-সঙ্গে; ছেলেটা এমনভাবে ওগুলো লুফে নিলো, যেন ওর জীবন নির্ভর করছে ওগুলোর ওপরে।

একটা আন্দাজ কাজ করতেই, অন্য আন্দাজটাও কাজে লাগাতে চাইল গৌতম। হাত দিয়ে চারকোনা কোনো বাক্স বোঝাচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু সমস্যা হলো, যুবকের যে জাহাজ তাতে অগণিত চারকোনা বাক্স। প্রত্যেক যাত্রীই যেন একটা একটা করে বাক্স নিয়ে উঠেছে জাহাজে। আর তাই ওয়াজেথ হাঁটা-চলা করার মতো সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ওদের।

শরীরে একটু বল ফিরে পাওয়া মাত্র, ওয়াজেথ চলে গেল ওর জাহাজে। গৌতম হচ্ছে বৈদ্যের ব্যাটা বৈদ্য, ও কী আর এমনি-এমনি রোগীকে ছেড়ে দিতে পারে? তাই সে-ও হয়েছিল সঙ্গী। ওয়াজেথ জাহাজে পা রেখেই হন্য হয়ে খুঁজতে শুরু করেছিল কিছু একটা। কী, তা ভাষাগত সমস্যার কারণে বলে বোঝাতে পারেনি।

বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশি চালাবার পর, একটা ছোটো চারকোনা বাক্সের সামনে এসে শান্ত হয়েছিল ছেলেটা। পরিতৃপ্তি আর শান্তির একটা

হাসি ফুটে উঠেছিল মুখে। বাক্সটা ছিল কালো, সামনের দিকে একটা গর্ত মতো। পকেট থেকে ওই তিন লকেটের একটা বের করে সেটা লাগিয়েছিল ওয়াজেথ। বৈদ্য গৌতমকে অবাক করে দিয়ে লাফ দিয়ে খুলে গিয়েছিল বাক্সটার ডালা।

স্মিত হাসি হেসে ভেতর থেকে কালো পাথরে কুঁদে বানানো একটা মূর্তি বের করে এনেছিল ওয়াজেথ।

গৌতম বৈদ্য হলেও, খুব যে বেশি ধার্মিক তা বলা যাবে না। মাঝে-মাঝে পূজা-আহ্নিক করে, দুই-চারবার উপবাসও করেছে। তবে তার পেছনে ধর্মের চাইতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অবদানকেই বেশি বলতে হবে। এখন অবশ্য ঝুঁকছে দেব-দেবীদের দিকে। যাত্রা পথে যেসব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার-স্যাপার দেখেছে, তাতে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না। ওর মনে হলো, মূর্তিটা যেন খুব পরিচিত।

কালো দেহটা মানুষের; মাথাটা প্রথম দেখায় সাপের বলে মনে হলেও, আসলে ওটা মুকুট। মাথার তুলনায় সর্প-মুকুট একটু বড়ো হওয়ায়, দেখে ওরকম লাগছিল গৌতমের। সর্প-মুকুট শব্দটা মাথায় আসামাত্র মূর্তিটা কেন পরিচিত মনে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল গৌতম।

নতুন এক দেবীর আগমন ঘটেছে চম্পক নগরীতে। লোকে বলে, বড়ো জাগ্রত দেবী। রোগ-শোক দূর করতে পারে, পারে সাপে কাটা মানুষের জীবন ফিরিয়ে দিতে (গৌতম অবশ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দুলছে। যা আয়ুর্বেদ পারে না, তা আর কেউ পারার কথা না। তার ওপর এই 'দেবী' এখনও দেবী হিসেবে স্বীকৃতিই পায়নি), ফসলি জমিতে অধিক শস্য ফলাবার বর দেয় আর সেই সাথে বন্ধ্যা মেয়েদের দেয় মা হতে পারার ক্ষমতা!

তারচেয়ে বড়ো কথা, চম্পক নগরীর সবচেয়ে নামকরা ব্যবসায়ী, চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে সেই দেবীর রয়েছে কড়া শত্রুতা!

এই লোক দেবীর উপাসকদের পক্ষ থেকে পাঠানো চর নয়তো? প্রশ্নটা খেলা করে গিয়েছিল গৌতমের মনে।

আর এখন, অর্জুনের মনেও সেই একই প্রশ্ন খেলা করছে।

চাঁদ সওদাগরের বড়ো সন্তান ও। পিতার মৃত্যুর পর, ব্যবসার হাল ধরার কথা ওরই। যদিও নগরীতে সময় কাটাবার চাইতে উত্তাল নদীতে জাহাজ ভাসাতেই বেশি ভালোবাসে অর্জুন। সে যে এই সময়ে গোয়ার দিকে আসবে, সে-কথা কেউ জানত না। সাধারণত চাঁদ সওদাগরের নৌকাগুলো প্রথমে যায় ত্রিবেণীতে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিন্তু অর্জুন এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথে। এদিকে আগে কখনও চাঁদ সওদাগরের কোনো নৌকা আসেনি।

বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে যে গোয়ায় পা রেখেছে অর্জুন, তা নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না!

প্রমত্তা করতোয়া নদী ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে আবার পুবে মাস খানেক চলার পর সে উপস্থিত হতে পেরেছে গোয়ায়। চম্পক থেকে মাল-সামান নিয়ে গেলে, গোয়ায় বণিকদের সাদর সম্ভাষণ জানানো হয় কিনা–সেটা জানাই ছিল তার উদ্দেশ্য। বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বাড়াতে উদগ্রীব চাঁদ সওদাগর। আর পানিতে ভাসার সুযোগ পেয়েছে বলে অর্জুনের আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না।

যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করার পরও, পেছনে ফেউ লাগার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমুদ্রের ওপাশে আরও মানুষ আছে, এ কথা অনেকেই বলেছেন। আবার হেসে উড়িয়েও দিয়েছেন অনেকে। ভ্রমণের সময় ভূত-অদ্ভুত অনেক কিছুই দেখেছে অর্জুন। তাই সামনে বিদেশি পরিচয় নিয়ে বসে থাকা লোকটার কথা হেসে উড়িয়েও দিতে পারছে না।

আবার গৌতমের মুখে শোনা যুবকের মূর্তি-প্রেমের কথাও কানে এসেছে তার। অবশ্য মনসার খুব কম উপাসকই মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে থাকে। অধিকাংশ পূজা করে সীজ গাছকে বা সাপের ঝাঁপিতে। তবে যে লোক সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছে, সে আর ওগুলো কোথায় পাবে? তাই মূর্তি সাথে আনাও অস্বাভাবিক না।

সেজন্যই যুবককে এখানে আসার কথা বলেছে সে আজ। উদ্দেশ্য নিজেই নিশ্চিত হয়ে নেওয়া। এতক্ষণ ধরে যা দেখেছে আর যা শুনেছে, তাতে অবিশ্বাস করার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

'দেশে ফিরতে চাও?' অর্জুন আচমকা প্রশ্ন করে উঠল।

'ফিরে কী হবে? আর দেশটাই বা কোনটা? জন্ম মিশরে, বড়ো হয়েছি পারস্যে। যাব কোথায়?'

'তাহলে কী করতে চাও?'

'আমার বয়স কম। খাটতে জানি। গর্ব করছি না, তবে দক্ষ নাবিক আমি। যদি কোনো জাহাজে কাজ পাই তো থেকে যাব।'

'তাই? আমার জাহাজে থাকবে?'

চোখ চকচক করে উঠল ওয়াজেথের। এতটা তো ও কল্পনাও করতে পারেনি। তবুও ইতস্তত করে বলল, 'এমনিতেই আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। আর...'

'আরে না।' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অর্জুন। 'যেভাবে নিজের ঢোল বাজাচ্ছ, তার এক শতাংশ সত্যি হলেও তোমাকে পেলে আমি খুশি হবো।' হাসি দেখা গেল ওর মুখে।

হেসে ফেলল ওয়াজেথও। 'তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

সামনের দিকে ঝুঁকে গেল অর্জুন, কণ্ঠে কিছুটা গম্ভীরভাব। ‘তবে একটা শর্ত আছে।’

হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে ওয়াজেথের গলায় এসে বসল। শর্ত? কীসের শর্ত? দূরের অজানা মুলুক, উলটা-পালটা কিছু করতে বলবে না তো?

‘শুনবে শর্ত?’

মাথা ঝাঁকাল কেবল ওয়াজেথ।

‘তোমার সঙ্গে থাকা দেবী মূর্তিটা আমাকে দেখাতে হবে।’

হেসে ফেলল ওয়াজেথ। এই কথা? ‘অবশ্যই।’

বলে পকেট থেকে ছোটো মূর্তিটা বের করে আনল ছেলেটা, কালো দেহটার ওপর করা কারুকার্য যেন দিন দিন আরও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

মন দিয়ে মূর্তিটা পরখ করে দেখল অর্জুন। মনসার মূর্তি আগেও দুই-একবার দেখেছে। ব্যক্তিগতভাবে ওর কাছে ব্যবসাই ধর্ম। পিতা শাক্ত হলেও, তেমন গোঁড়ামি নেই ওর মাঝে। দেবী দাবি করা কেউ যদি মানুষজনের ভালো করার বিনিময়ে পূজা চায় তো ক্ষতি কী?

বেশিক্ষণ লাগল না পার্থক্যগুলো ধরতে। মনসার মূর্তিতে দেবীকে দেখা যায় পদ্ম ফুলের ওপরে বসে থাকতে। এই মূর্তিটিও বসে আছে, তবে ফুলের ওপরে নয়...বেদির ওপর বলে মনে হচ্ছে। মনসার বাহন, হাঁসও অনুপস্থিত।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অর্জুন। ওয়াজেথ যা বলেছে তা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে।

খুশি হয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিল ও। যুবকের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, ‘আমার জাহাজে তোমাকে স্বাগতম।’

চার

আধ-ঘণ্টার মাঝেই দেখা গেল, নিজের গাড়িতে শিহানকে সঙ্গে নিয়ে অফিসের দিকে রওনা দিয়েছে রাফসান।

পুলিশের গাড়ি তৈরিই ছিল, কিন্তু নিতে চায়নি রাফসান। ছোটোখাটো এই বিষয়গুলো কেন যে মানুষের নজর এড়িয়ে যায়, তাই বুঝতে পারে না ও। উদ্দেশ্য তো গোপনে কাজ করা, তাই না? তাহলে পুলিশের গাড়ি নেবার দরকার কী?

এজন্যই শিহানকেও বাধ্য করেছে বেসামরিক পোশাক পরতে। দুজনের আকার মোটামুটি এক বলে, রাফসানের পোশাকই গায়ে জড়িয়েছে ছেলেটা। অবশ্য ঢোলা হয়েছে একটু, তবে দূর থেকে বোঝা যায় না। অস্ত্র-শস্ত্র থাকে থাকুক, কিন্তু এক নজরে যেন ওদেরকে পুলিশের হয়ে কর্মরত বলে মনে না হয়, সেজন্যই এত সাবধানতা।

যেতে-যেতে কেসটার ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছে রাফসান। ভোরেই ফরেনসিক টিম ডেকে এনে প্রাথমিক কাজ করিয়ে রেখেছেন সৈয়দ মারুফ। আসলে তিনি আগেই ধরে নিয়েছিলেন যে ওর সাহায্য পাবেন। তাই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের রাজি করিয়েই এসেছেন ওকে মানাতে।

যাই হোক, উল্লেখযোগ্য কিছুই খুঁজে পায়নি দলটা। মৃত বিজ্ঞানীর ঘরে তো বটেই, বাইরেও কোনো ছাপ আবিষ্কার করতে পারেনি তারা। ঘরের ভেতরে পাওয়া গিয়েছে কেবল বিজ্ঞানী উমার ছাপ। তারচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে সি.সি. ক্যামেরাতেও কিছু ধরা পড়েনি!

এক কথায় বলতে গেলে, কেসটা নিয়ে অকুল পাথারে পড়েছেন সৈয়দ মারুফ।

গাড়ি চালাতে-চালাতে ভাবতে শুরু করল রাফসান। ওর প্রতিষ্ঠানে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিগত এক বছর ধরে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বোমা হামলার হুমকির কারণে বিদেশি অনুদান কমে আসাই এর জন্য দায়ী। এমনকি বিদেশিরা যারা এখানে চাকরি করত বা গবেষণার জন্য এসেছিল, তাদের অনেকেই নিরাপত্তার অজুহাতে ফিরে গিয়েছে দেশে। ফলে আরও কমে এসেছে অনুদান। এখন ক্যাম্পাসের ভেতরেই একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল! এর প্রভাব যে কতটা সুদূর প্রসারী হবে, তা সৈয়দ মারুফও বুঝতে পারছেন না। এখন অনুদান আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও আশ্চর্য হবে না রাফসান।

প্রতিষ্ঠানের সি.ই.ও., সাজিদ রহমানের কথাও এলো মাথায়। ভদ্রলোকের জান-প্রাণ এই প্রতিষ্ঠান। অকৃতদার লোকটি পারলে ক্যাম্পাসেরই কোনো একটা রুম দখল করে বাসা বানিয়ে বসেন! চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত তিনি, সি.ডি.আর.সি.তে কোনো সমস্যা হয়েছে শুনলে যেখানেই থাকুন না কেন, ছুটে আসেন। তিনি কী করবেন এখন? বিদেশি অনুদান টিকিয়ে রাখতে হলে ব্যাপারটার ভেতর থেকে দেখাবার মতো কিছু একটা বের করে আনতে হবে তাকে।

এর একটা উপায় হতে পারে মিস উমার আবিষ্কার।

যদি ওটা আসলেই বড়ো ধরনের কোনো ওষুধ হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো সেটাকে দেখিয়ে আপাতত ক্যাম্পাসে একজন মানুষ খুন হবার ব্যাপারটাকে কিছুটা হলেও সামাল দেওয়া যাবে। অনুদানের বেশিরভাগই আসে ইউরোপ থেকে, পেশাদার মানুষ তারা। কতজন মরল তাতে কিছু যায় আসে না, তাদের দরকার হচ্ছে রেজাল্ট।

পুঁজিবাদী যন্ত্রের কাছে মানবিকতার স্থান কোথায়?

এসব ভাবতে-ভাবতেই পৌঁছে গেল অফিসে। গাড়িটা কোনো রকমে পার্ক করে ওরা প্রবেশ করল মূল কম্পাউন্ডে। প্রবেশপথে অবশ্য একবার দাঁড়াতে হলো ওকে, গার্ড কিছুতেই শিহানকে ঢুকতে দেবে না। আপনমনে হেসে ফেলল রাফসান–এত বড়াই করে লাভ কী? ভেতরে তো একটা তাজা লাশ পড়ে আছে!

অবশ্য আই.ডি. দেখাবার পর আর শিহানকে আটকাবার সাহস হলো না কারও।

মূল দরজা দিয়ে ঢুকেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে এস.আই.র দিকে তাকাল রাফসান। ঠিক বলেছিলেন সৈয়দ মারুফ, যথেষ্ট চালু ছেলেটা। তাই প্রশ্নটা উচ্চারণ করার দরকার হলো না।

'ব্যাপারটা যথা সম্ভব গোপন রাখা হয়েছে। কেবল মাত্র একজন কনস্টেবলকে দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করেছি আমরা। প্রতিষ্ঠানের গার্ডরাও সবকিছু জানে না।'

মাথা ঝাঁকাল রাফসান। সন্তুষ্ট হতে পারেনি। পেশাদারিত্বের অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে ওর। মাত্র একজন কনস্টেবল? খুনি যদি ফিরে আসত তো? তবে দেশটা বাংলাদেশ। এই দেশে দুটো ইউটিউব ভিডিও দেখে মানুষ নিজেকে বিশাল বড়ো এক্সপার্ট ভাবতে শুরু করে। গুন্ডামিও যে পেশাদারিত্বের সঙ্গে করা যায়, তা সম্ভবত এদেশের গুন্ডাদের ভাবনাতেও আসে না।

অপেশাদার গুন্ডাদের দেশে, অপেশাদার পুলিশ দিয়েই চলে যায় কাজ।

আরে যেহেতু সিস্টেম চলছে, তাই তাকে আর ঘাঁটিয়ে কী লাভ? ধসে পড়ার আগে যেভাবে চলছে, চলুক না।

কনস্টেবল লোকটাকে দেখতে পেল রাফসান। বিজ্ঞানীদের অংশটায় প্রবেশ করার যে দরজা, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মোটা-সোটা, গাট্টা-গোট্টা একটা লোক। চোখের নিচটা ফুলে আছে। ফুলে আছে পেটের মধ্যভাগটাও। সুখী-সুখী একটা আয়েশি ভাব নিয়ে টুলে বসে আছে সে।

এগিয়ে গেল শিহান, ওকে দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকল কনস্টেবল রমিজ। চট করে চারপাশটা দেখে নিলো শিহান। নাহ, কেউ নেই উপস্থিত। মৃদু ভর্ৎসনা করে নির্দেশ দিল দরজা খোলার।

বকা খেয়ে টলে উঠেছে কনস্টেবল, দরজা খুলতে তিনবার চেষ্টা করতে হলো ওকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরো দৃশ্য দেখল রাফসান, বলল না কিছুই।

*

উমা চক্রবর্তীর ঘরটাকে গোছানো না বলে উপায় নেই। অবচেতন মনেই নিজের অফিসরুমের সঙ্গে তুলনা করল রাফসান। মানসচোখে দেখতে পেল ওর ডেস্কটাকে–এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ফাইল আর ফাইল। ওই জঙ্গল থেকে কাজেরটা খুঁজে বের করতে মাঝে-মাঝে ওর নিজেকেই বেগ পেতে হয়। সেখানে উমার টেবিল একেবারে পরিষ্কার। একপাশে অযত্নে পড়ে আছে সালাদ, স্পর্শও করা হয়নি বলে মনে হচ্ছে। ঘরের মেঝেতে বিছানো রয়েছে উজ্জ্বল রঙের একটা কার্পেট। নিজ অফিসেও এমন কার্পেট আছে রাফসানের–প্রতিষ্ঠানের টাকায় কেনা। কার্পেটের ঠিক মাঝখানটা

কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। রাফসান বুঝতে পারল, গুলি খেয়ে বিজ্ঞানীর লাশটা ওখানেই পড়ে ছিল।

উল্লেখযোগ্য কিছু পাবার আশা খুব একটা করেনি রাফসান। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, টেবিলের ওপর একটা ফাইল থাকার কথা ছিল। ওটা পাওয়া যাচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন সৈয়দ মারুফ। আরেকবার কালচে অংশের দিকে তাকাল রাফসান। পরিস্থিতি বলছে, ওই ফাইলটা চুরি করার জন্যই এসেছিল খুনি। হয়তো ভুল করে খুনের পর রক্তে পা-ও দিয়ে বসেছিল। ওখান থেকে কিছু বোঝা গেলেও যেতে পারে!

কিন্তু না, তেমন কোনো কিছু দেখতে পেল না কার্পেটে!

বুঝতে পারল, যে এসেছিল সে যথেষ্ট সাবধানী।

শিহানের দিকে ফিরল রাফসান, 'চলো, সিকিউরিটি চিফের সঙ্গে কথা বলা যাক।'

*

আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি চিফ হিসেবে ঠিক মানানসই নন আজমল আহমেদ। বহু ব্যবহারে পুরনো হয়ে যাওয়া বাক্য–এরচেয়ে বরং স্কুল-কলেজের শিক্ষক হিসেবেই তাকে বেশি মানায়, কথাটা সম্ভবত তার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

এই চেহারা নিয়েই র‍্যাবে দীর্ঘদিন কাজ করে এসেছেন তিনি। তারপর অবসর নিয়ে যোগ দিয়েছেন সি.ডি.আর.সি.তে। বেশি দিন হয়নি অবশ্য। তবে এই কদিনের মাঝেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। যে কয়জন বিদেশি এখনও আছে, তার কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়েই আছে।

অন্তত গতকাল পর্যন্ত সেটাই জানত রাফসান।

এই মুহূর্তে কনফারেন্স রুমে বসে আছে ও আর শিহান। অপেক্ষা করছে আজমল সাহেব আর সাজিদ রহমানের। তারা এলেই আলোচনা শুরু হবে।

কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় রাফসান, এগুলোর ভিত্তি করেই শুরু হবে অনুসন্ধান। পকেট থেকে একটা প্যাড বের করে তাতে লিখেও নিয়েছে প্রশ্নগুলো:

(ক) উমাকে খুন হতে হলো কেন? এর পেছনে কী ব্যক্তিগত কোনো কারণ দায়ী? নাকি ব্যবসায়িক কারণ? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রোশ-এর জন্য দায়ী নয় তো?

(খ) সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

(গ) ডেস্কের ওপরে থাকা ফাইলটাই বা কোথায়?

(ঘ) কনফারেন্সে যে পেপারটা পড়ার কথা ছিল উমার, সেটা কই গেল? সে জন্যই কী খুন?

(ঙ) এমন কী আবিষ্কার করেছিল উমা? (এই প্রশ্নটা সাজিদ ভাইয়ের জন্য)

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। পাঁচ মিনিটের মাঝেই চলে এলেন দুজন।

'দেখো তো, রাফসান,' সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন সাজিদ রহমান। 'কী কাণ্ড! এমন হলে চলবে কী করে?'

'জি, সাজিদ ভাই। ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল।' বয়সে বড়ো হলেও, ভাই বলেই ডাকে রাফসান সি.ই.ও.কে। 'এখন তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সামাল দিতে পারলে হয়।'

'হ্যাঁ,' বললেন সাজিদ রহমান। 'শুধু সামাল দিলেই হবে না, সেই সঙ্গে...' এই প্রথম শিহানের ওপর নজর পড়ল তার। চুপ করে গেলেন।

রাফসানের অবশ্য তার কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ আগে দেখেন বলেই সাজিদ রহমানকে বাংলাদেশি হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানের সি.ই.ও. করা হয়েছে। আসতে-আসতে যে কথাটা নিজে চিন্তা করছিল, সেটা যে বসের মাথাতেও এসেছে–তা জানে রাফসান। শিহান বাইরের মানুষ বলে কথাটা মুখ ফুটে উচ্চারণ করলেন না আরকি।

'পরিচয় করিয়ে দেই,' বলল ও। 'ইনি এস.আই. আশিকুর রহমান। মারুফ স্যার তো আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন?' বসের মাথা ঝাঁকানির জন্য একটু অপেক্ষা করে আবার শুরু করল। 'কেসটা দেখার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে ও।'

'ভালো, তা কী মনে হচ্ছে অবস্থা?' জানতে চাইলেন সাজিদ।

অল্প কথায় এখন পর্যন্ত যা-যা বুঝেছে তা বলল রাফসান। দেখতে পেল, হতাশায় কালো চেহারাটা আরও কালো হয়ে গিয়েছে। তাই দ্রুত যোগ করল, 'আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার। সেগুলো আজমল সাহেবই ভালো দিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে। এজন্যই আপনাদেরকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলাম।'

‘যেকোনো ধরনের সাহায্য করার জন্য আমি প্রস্তুত।’ এই প্রথম মুখ খুললেন আজমল সাহেব।

‘প্রথম প্রশ্ন, বিগত পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে সরাসরি সি.ডি.আর.সি.কে হুমকি দেওয়া কোনো চিঠি পেয়েছেন?’ কালক্ষেপণ করতে রাজি নয় রাফসান।

হেসে ফেললেন আজমল সাহেব। ‘ওরকম চিঠি প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়। তবে কোনোটাকেই তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।’

‘কেন?’

‘চিঠিটার ভাষা থেকেই আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি, কোনোটা ফাজলামি করার জন্য লেখা হয়েছে, আর কোনোটা সিরিয়াস। তবে আজকাল হুমকিগুলো আসে মেইলের মাধ্যমে। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হোক বা না হোক, সবই আমরা আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেই।’

‘উমা চক্রবর্তী, ধর্ম–সনাতন। সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে আক্রোশ থেকে কী এই খুন হতে পারে?’ এবার জানতে চাইল শিহান।

‘আমার তা মনে হয় না,’ উত্তর দিলেন আজমল সাহেব। ‘দেখুন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা এখনও অতটা ছড়িয়ে পড়েনি যে খুঁজে-খুঁজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে খুন করা হবে। আমার মতে, সি.ডি.আর.সি.র ক্যাম্পাসে খুন করার পেছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে–প্রথমটা ব্যক্তিগত। তবে সেক্ষেত্রে মিস উমাকে তার নিজের বাড়িতে খুন করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সেখানে নিরাপত্তা নিশ্চয়ই এখানকার মতো কড়া না।’

মাথা নেড়ে সায় জানাল রাফসান, ওর-ও তাই মত।

‘দ্বিতীয় কারণ হতে পারে–পেশাগত। বিগত কয়েকদিন হলো প্রতিষ্ঠানে মেয়েটিকে নিয়ে মাতামাতি চলছিল। বাইরের দুনিয়ায় এখনও তার আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়েনি। তাই ধরে নেওয়া যায়, পেশাগত ঈর্ষার কারণেই কেউ তাকে খুন করেছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য দায়টা গিয়ে পড়বে কোনো বিজ্ঞানীর ঘাড়েই। নিজে খুন না করলেও, আরেকজনকে দিয়ে খুন করাতে পারেন–’ এতটুকু বলেই থামলেন তিনি।

‘আর তৃতীয় কারণটা?’ অধৈর্য হয়ে উঠেছে শিহান। চালু হলেও অনভিজ্ঞ ছেলেটা, বুঝতে পারল রাফসান। আলোচনার চাইতে অ্যাকশনের দিকে বেশি মন ওর। অথচ জানে না, ঠিকমতো আলোচনা করতে পারলে বসে থেকেই কেসের অনেকটা সমাধান করে ফেলা যায়।

‘–তৃতীয় কারণ হচ্ছে, স্যাবোটাজ।’ বোমা ফাটালেন যেন সাজিদ রহমান, সম্ভবত এখানে আসার আগে সিকিউরিটি চিফের সঙ্গে কথা বলেই এসেছেন তিনি। ‘কেউ একজন চায় না, সি.ডি.আর.সি. চালু থাকুক।’

পাঁচ

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল কনফারেন্স রুমের সবাই। সাজিদ রহমানের ফাটানো বোমাটা হজম করতে বেগ পেতে হচ্ছে। স্যাবোটাজের কথা চিন্তা করছেন তিনি। কিন্তু রাফসানের মনে হলো, স্যাবোটাজ করার জন্য কাউকে খুন করাটা একটু বেশিই বেশি হয়ে যাচ্ছে। আরও অনেক উপায়েই কাজটা করা যেত।

মুখে অবশ্য সেটা না বলে বলল, 'ব্যাপারটা কেমন কেমন হয়ে গেল না? ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যাবোটাজ হয়–সে কথা তো জানি। কিন্তু সি.ডি.আর.সি তো আর কোনো ইন্ডাস্ট্রি না! এখান থেকে লাভজনক কিছু আসেও অনেক কম। তাহলে?'

মাথা নাড়লেন সাজিদ রহমান। 'আসলে তোমার কিছু ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। অনুদান আসা কমে গিয়েছে অনেক, তারপরেও যা আসে তা কিন্তু ছোটোখাটো একটা আফ্রিকান রাষ্ট্রের বাজেটের সমান। আমরা পুরোটাই খরচ করে দেই বলে এখনও এই অনুদান আসা চলছে। কিন্তু যদি অন্য কারও হাতে তা পড়ে, আর সে একটা বছর একটু শুধু নয়-ছয় করে, তাহলেই হয়েছে।'

'সরকার–' কিছু একটা বলতে চাইছিল শিহান। কিন্তু তাকে চুপ করিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

'সরকার নামকাওয়াস্তে দুই জন মেম্বার রেখেছে ডিরেক্টর'স বোর্ডে। তাদের আসলে এই সংস্থা চলল না বন্ধ হলো, তাতে কিছুই যায় আসে না। বন্ধ হলে অন্য কোথাও গিয়ে মেম্বার হবে।'

সাজিদ রহমানের ধ্যান-জ্ঞান যে এই প্রতিষ্ঠান, সে কথা জানা আছে রাফসানের। তাই ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দিতে চাইল না, অন্যদিকে কথা নিয়ে গেল।

'এটা একটা সম্ভাবনা হতে পারে, উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।' শিহানের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তাকাল ও। 'তবে অন্যান্য সম্ভাবনাও আমাদের ভাবা দরকার। ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যাবোটাজ লক্ষ্য হলে তো যে কাউকে মারলেই কাজ হয়ে যায়। তাই সেটাকে আপাতত এক পাশে সরিয়ে রেখে, আমি আমাদের এই বিশেষ ভিক্টিমের দিকে নজর দিতে চাই। একটা খুন লুকোবার সবচেয়ে ভালো জায়গা কোনটা, জানেন?'

উত্তর দিলেন আজমল সাহেব। 'অনেকগুলো খুনের মাঝে। আগাথা ক্রিস্টি আমার পড়া আছে।'

চমৎকৃত হলো রাফসান।

'তেমনি খুনের মোটিভকে লুকাবার উপযুক্ত জায়গা হলো, আরও অনেক মোটিভের মাঝে।' বলে চলছেন সিকিউরিটি প্রধান। 'এটাই তো বলতে চাচ্ছেন? খুনি আসলে উমা চক্রবর্তীকেই খুন করার জন্য এসেছিল। সময়টা বেছে নিয়েছিল এমনভাবে যেন ব্যাপারটার মাঝে পুলিশ ব্যক্তিগত কারণ না খুঁজে, অন্য কোনো কারণ খোঁজে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।' বলল রাফসান।

'হতে পারে, অসম্ভব না। আবার–' বলেই থেমে গেলেন আজমল সাহেব।

'আবার কী?' কৌতূহলী এস.আই. শিহানের প্রশ্ন।

'উমা চক্রবর্তী নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করেছিল। সেটা কী, তা কেবল সে-ই জানত। আর স্যার জানতেন।' ইঙ্গিতে সাজিদ রহমানকে দেখিয়ে দিলেন আজমল সাহেব। 'যদি সেখান থেকে আর্থিক লাভ

হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেজন্যও তাকে হত্যা করা হতে পারে। হয়তো কেউ জেনে গিয়েছিল তার এই আবিষ্কারের কথা। সেটাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে।'

লোকটার মাথা পরিষ্কার চলে, বুঝতে পারল রাফসান। এই চিন্তাটা সে-ও করেছে। বিশেষ করে যখন শুনল–ফাইল হারিয়ে গিয়েছে, তখনই।

'সাজিদ ভাই,' সি.ই.ও. কে প্রশ্ন করল রাফসান। 'আপনি জানেন নাকি এই ব্যাপারে কিছু?'

'একদম অল্প,' উত্তর দিলেন তিনি। 'বিনা ঝামেলায় কাজ করার অনুমতি চেয়েছিল উমা। প্রজেক্টের যে প্রপোজাল জমা দিয়েছিল, তা দিতে পারি তোমাকে। অতটুকুই জানি কেবল, তারপর আর কিছু জমাও দেয়নি। আমারও আর জিজ্ঞেস করতে মনে নেই।'

'তা তো লাগবেই, ওটার একটা কপি নিয়ে নেব। তবে আপনি অল্প কথায় বুঝিয়ে দিন। ওর গবেষণা থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা ছিল?'

ওপরে-নিচে মাথা দোলালেন সাজিদ রহমান। 'শুধু টপিকটা বলি তোমাকে–অনকোলাইটিক ভাইরো-থেরাপি!'

শিস দিয়ে উঠল রাফসান, এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে।

অবশ্য শিহানের মাথায় কিছুই ঢোকেনি। একটু অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল। 'গ্রিক বাদ দিয়ে খাঁটি বাংলায় কেউ বুঝিয়ে বলবেন কথাটা? কী সব অঙ্ক-টঙ্ক করার কথা বলছেন!'

কাঁধ ঝাঁকালেন সাজিদ রহমান, তাই রাফসান ব্যাখ্যা করার ভারটা নিজের কাঁধেই তুলে নিলো। 'ক্যান্সার কাকে বলে সেটা তো জানোই? এই সংক্রান্ত সবকিছুকে আমরা ডাক্তারি পরিভাষায় বলি অনকোলজি,

গুণ-ভাগের অঙ্ক না। আগেকার দিনে মানুষ মারা যেত সংক্রামক রোগ, মানে ধরো কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, যক্ষ্মা–এসবে। এখন সেগুলোকে অনেকটাই সামলে নিয়েছি আমরা। হঠাৎ হঠাৎ সোয়াইন ফ্লু বা সার্স বা ইবোলা বাদে জীবাণু বাহিত রোগে বড়ো আকারের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে না। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার–এগুলো।

‘এদের মধ্যে ক্যান্সার একটু আলাদা ধরনের। ক্যান্সার মানে সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়, যে কোষের বিভাজিত হবার কথা ছিল না, সেটাই বারবার বিভাজিত হওয়া। আমাদের দেহের মোটামুটি সব কোষেই বিভাজন ঘটে। তবে সেটা একটা নির্দিষ্ট চক্র অনুসরণ করে। তোমার হাত কেটে চামড়া ছিলে গেলেই কিন্তু সেখানে নতুন চামড়া তৈরি হবে। অনেক সময় হয়তো একটু দাগ হয়ে যায় বা ফুলে থাকে, তবে সেগুলো হয় কেবলমাত্র ক্ষত হলেই। তেমনি প্রয়োজন না হলে দেহের ভেতরের কোষগুলোও বিভাজিত হয় না। পার্থক্য হলো ক্যান্সার। এদের বিভাজনের ওপর শরীরের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিভাজিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা শরীরে সৃষ্টি করে নানা ধরনের সমস্যা।

‘ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সরাসরি কাজ করবে, এমন কোনো ‘একটা’ ওষুধ নেই। আমাদের যেটা করতে হয় তা হলো, নানা ধরনের কোষ-হত্যাকারী ওষুধ ব্যবহার করে, ক্যান্সার-কোষগুলোর সংখ্যা কমিয়ে আনা। তারপর আছে রেডিয়োথেরাপি, সার্জারি আরও অনেক পদক্ষেপ। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোগী অনেক পরে এসেছে ডাক্তারের কাছে। বা অপারেশনের সময় দেখা যায়, যতটা বিস্তৃত বলে মনে করা হয়েছিল, ক্যান্সারের বিস্তৃতি আসলে তার চেয়েও বেশি। তাই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

‘এজন্য বিজ্ঞানীরা নতুন এক দিকে এগোবার কথা ভাবছেন। কেমোথেরাপি, মানে কোষ-হত্যাকারী ওষুধের পাশাপাশি, মানুষের দেহে এমন একটা ভাইরাস ঢুকিয়ে দেওয়া যেটা নির্দিষ্ট ক্যান্সার-কোষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। রিকম্বিনেন্ট ডি.এন.এ.র কথা তো শুনেছ?’ চোখে প্রশ্ন নিয়ে ঘরের সবচেয়ে কমবয়সি ছেলেটার দিকে তাকাল সে। শিহান মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই আবার শুরু করল, ‘ওই পদ্ধতিতে যেভাবে ই. কোলাই থেকে ইনসুলিন বানানো যায়, তেমনি এই ভাইরাসগুলোকে ব্যবহার করে কাজটা করা সম্ভব। আসল ব্যাপারটা অনেক জটিল, কিন্তু এরচেয়ে সহজ করে বোঝানোর উপায় আমার জানা নেই।’ এক নাগাড়ে অনেকগুলো কথা বলে থামল রাফসান।

‘মোদ্দা কথা হলো–উমা চক্রবর্তী ক্যান্সারের একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছে...করেছিল।’ বললেন সাজিদ রহমান।

‘যেটা কাজ করলে এবং বাজারজাত করতে পারলে, লাখ-লাখ টাকা...উহু, কোটি-কোটি ডলার কামানো সম্ভব।’ যোগ করলেন আজমল সাহেব।

‘আর এজন্য তাকে মারতেও দ্বিধা করবে না কেউ, তাই তো?’ শেষ করল শিহান।

আলাদা করে কাউকে উত্তর দিতে হলো না প্রশ্নটার।

*

‘আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল।’ মিনিট দুয়েক চুপ থাকার পর প্রশ্ন করল রাফসান। ‘এজন্যই আপনাদেরকে আসতে অনুরোধ করা।’

‘বলো,’ অনুমতি দিলেন সাজিদ রহমান।

নড়চড়ে বসল রাফসান, হাতের প্যাডের দিকে নজর দিল একবার। প্রথম প্রশ্ন–উমাকে কেন খুন হতে হলো, তার উত্তর কিছুটা হলেও পাওয়া গিয়েছে।

পরের প্রশ্নে এলো তাই, ‘সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নেই কেন?’

একে-অন্যের দিকে তাকালেন সাজিদ রহমান ও আজমল সাহেব। চোখে-চোখে ইঙ্গিত বিনিময়ের ব্যাপারটা নজর এড়াল না রাফসানের।

তারা কী কিছু গোপন করতে চাইছেন?

সাজিদ রহমানই মুখ খুললেন প্রথমে। ‘এরজন্য আমাকে দায়ী বলা চলে। আমাদের প্রায় সবধরনের সাপোর্ট যে বাইরে থেকে আসে, তা নিশ্চয়ই জানো?’ রাফসানের মাথা দোলানো দেখলেন তিনি। তবে কথাটার উদ্দেশ্য যে শিহান ছিল, তা ঘরের কারও বুঝতে অসুবিধে হলো না। ‘সিকিউরিটি চিফ আজমল সাহেব হলেও, এই সংক্রান্ত সব যন্ত্রপাতি আর সাপোর্ট বাইরে থেকে আসে...AHI–মানে অ্যাট–হোম ইংক নামের এক বিদেশি সংস্থা থেকে। ওদের টেকনিক্যাল নলেজ আমার নেই। তাই সব বোঝাতেও পারব না। সিস্টেম ছিল যে সিসি ক্যামেরার সব ফুটেজ একটা সিডিতে জমা হতে থাকবে। রাত ঠিক বারোটার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই সিডি বেরিয়ে এসে আরেকটা সিডি ঢুকে যাবে রিডারে।’

‘বুঝলাম, কবে থেকে চালু হয়েছে এই সিস্টেম?’ জানতে চাইল রাফসান।

‘মাস ছয়েক হলো,’ উত্তর দিলেন আজমল সাহেব। ‘প্রথম-প্রথম কোনো সমস্যাই হয়নি। এই দিন পনেরো আগে, আমাদের এক সিসিটিভি অপারেটর প্রথম সমস্যাটা ধরতে পারে।’

‘কী সমস্যা?’

‘দেখতে পায়, আমাদের প্রতিদিন তেইশ ঘণ্টার ফুটেজ জমা হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার না।’ জানালেন নিরাপত্তা প্রধান। ‘তাই তদন্তে নামি আমি। দেখতে পাই, রাত বারোটার পর থেকে রাত একটা, মানে দিন শুরু হবার প্রথম ঘণ্টাটার কোনো ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছে না। এটুকু আবিষ্কার করতে খুব একটা কষ্ট হয়নি।

‘পরেরদিন...মানে পরের রাতে আরকী। বারোটার মিনিট পনেরো আগে নিজেই চলে যাই অপারেটরের কাছে। দেখতে পাই, বারোটা বাজার পরও কেন যেন সিডি চেঞ্জ হচ্ছে না। পুরোটাই অটোমেটেড সিস্টেম, সিডি বেরও হয় একাই, আবার ভেতরে ঢুকেও যায় একাই। তাই এই কয়দিন কোনো অপারেটরও দেখেনি। আর যেহেতু ফুটেজ দেখার দরকার পড়েনি, তাই আমিও টের পাইনি। প্রতি সপ্তাহে দৈব-চয়ন ভিত্তিতে একদিনের ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই কাজটা করে অপারেটরদের প্রধান, আমারও এতে কোনো হাত নাই। সিস্টেম চেক তো একটা উদ্দেশ্য বটেই, সেই সঙ্গে নজর রাখা হয় গার্ডরা কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না, তার ওপরেও। যাই হোক, ব্যাপারটা ধরতে পারা মাত্র আমি স্যারকে জানাই।’

এবার কথার হাল ধরলেন সাজিদ রহমান। ‘যেদিন আমি ব্যাপারটা জানি, সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। শুক্র-শনি আবার ওদের ওখানে বন্ধ থাকে–’

‘ওদের ওখানে মানে?’ জানতে চাইল শিহান।

‘মানে এ.এইচ.আই.-এর ওখানে, আমেরিকায়। উইকএন্ডে কাউকে পাওয়া যায় না। ফোন দিলেই পাঠিয়ে দেয় কাস্টোমার কেয়ারে। ভারতীয় টানে কথা বলা অপারেটর একটাই জবাব দেয়–বন্ধ করে

আবার চালু করুন। আরে ব্যাটা, যদি জানতামই কীভাবে বন্ধ-চালু করে, তাহলে এত টাকা দিয়ে ওদের ভাড়া করতাম কেন?'

হেসে ফেলল রাফসান, ঘরের পরিস্থিতি একটু হলেও হালকা হলো। 'তারপর?'

'সোমবার পাওয়া গেল তাদের। জানাল, আপাতত তারা খুব ব্যস্ত আছে। টেকনিশিয়ান পাঠাতে সময় লাগবে কমপক্ষে তিন থেকে চার সপ্তাহ!'

'একটা সিডি বের করে আবার ঢোকাবার জন্য?' আঁতকে উঠে জানতে চাইল শিহান।

'হ্যাঁ।' বিরক্তির সুর সি.ই.ও.র কণ্ঠেও। 'এর আগে পাঠাতে পারবে না। আমাদের দেশ হলে ধামকি-ধুমকি দিয়ে হয়তো কাজ চালিয়ে নিতাম। কিন্তু ওদের আবার কী সব ইউনিয়ন-টিউনিয়নের দোহাই দিয়ে জানাল–এর আগে পাঠানো সম্ভব না। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম, আমাদের দেশের কাউকে দিয়েই কাজ করিয়ে নিব এরপর থেকে।'

'স্বদেশি কুকুর ধরি বিদেশি ঠাকুর ছাড়িয়া।' মন্তব্য করল যুবক এস.আই.।

নাহ, সঙ্গী হিসেবে একদম খারাপ না ছেলেটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই। যাই হোক, এটাও জানাল, যদি আমি চাই তো একজন কনসালটেন্টকে পাঠাতে পারবে। তবে খরচ আমার। জানতে চাইলাম, কত বিল আসবে? যা জানাল, তা আর উল্লেখ করছি না। তবে ওটা তোমার-আমার দুজনেরই এক মাসের বেতনের যোগফলের সমান। আমার চুপ করে থাকা দেখে মায়া হলো সম্ভবত ওদের।

জানালো, লাঞ্চের সময় স্কাইপে একজন টেকনিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে। সে যদি কিছু করতে পারে...

'লাঞ্চের সময় কথা বললাম, সেই ছেলেটা আমাদের সিসিটিভি অপারেটরকে চাইল। তাকে বুঝিয়ে দিল, কীভাবে সিডি চেঞ্জ করতে হয়। কাজটা যে ম্যানুয়ালি করা যায়, সেটা আমাদের মাথাতেই আসেনি! যাই হোক, সেভাবেই চলছে সবকিছু। কিন্তু মাঝখান থেকে মিনিট পনেরোর ফুটেজ আর আমরা পাই না। কাজটা করার আগে ডিস্ক সেভ না কী যেন অপশন বন্ধ করে আবার এসে চালু করতে হয়।'

বুঝতে পারছে রাফসান। তারপরও প্রশ্ন উঠল ওর মনে, 'কিন্তু আমাদের মতো একটা প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থা...তা-ও আবার নিরাপত্তার প্রশ্নে...'

'দেখুন রাফসান সাহেব, আগেই বলেছি।' আজমল সাহেব বললেন। 'সরাসরি সি.ডি.আর.সি.র বিরুদ্ধে হুমকি আসে বটে, কিন্তু সেগুলোর গুরুত্ব খুবই কম। তাছাড়া বাজেট কাট চলছে। কর্মচারী সঙ্ঘের প্রধান হিসেবে ব্যাপারটা আমার জানা আছে। সেজন্যই হয়তো...'

দুই জনের চোখাচোখির কারণ বুঝতে পারল রাফসান। সম্ভবত যুক্তি-বুদ্ধি করেই এই ব্যাপারে গল্প খাড়া করেছে।

'উমা চক্রবর্তীর ড্রাইভারের মতে, তার মনিবের টেবিলের ওপরে একটা ফাইল ছিল। ওটার কী হয়েছে, তা কেউ জানেন?' প্রশ্ন করল শিহান।

'নাহ,' উত্তর দিলেন সিকিউরিটি প্রধান। 'কারও ঘরের ভেতরে তো আর সিসিটিভি লাগানো হয় না।'

'আপনি?' এবারের প্রশ্ন সাজিদ রহমানকে উদ্দেশ্য করে।

‘আমারও জানা নেই।’

‘আন্দাজ করতে বললে?’

‘তাহলে বলব–ওর আজকেই একটা কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য জেনেভা যাবার কথা ছিল। সম্ভবত ওটা সংক্রান্ত কিছু হবে।’

‘আচ্ছা, সাজিদ ভাই,’ জানতে চাইল রাফসান। ‘পেপারটার কোনো খসড়া আপনাকে দেয়নি?’

‘না তো!’ অবাক কণ্ঠ সাজিদ রহমানের। ‘তুমি তো জানোই, আমি মানুষের কাজে নাক গলাতে চাই না। তবে পেপার অথর হিসেবে ওর নাম থাকলেও, সেকেন্ড অথর হিসেবে আছে প্রীতম চক্রবর্তী, ওর বাবার নাম। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে।’

‘হুম,’ সন্তানহারা পিতা কেমন আচরণ করতে পারে, তা জানে রাফসান। তাই ভদ্রলোককে বিরক্ত করতে মন চাচ্ছে না।

‘আরেকটা উপায় আছে,’ বললেন আজমল সাহেব। ‘তবে কাজটা ঠিক আইনি...’ বলেই আড়চোখে তাকালেন শিহানের দিকে।

‘কাজ উদ্ধার নিয়ে কথা,’ অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল তরুণ এস.আই.।

‘আমাদের প্রত্যেক এমপ্লয়ির তো আইডি থাকে, মেইল আইডিও থাকে। ওটার পাসওয়ার্ড জানা যাবে। আর–’

‘–আর যদি কাউকে মেইল করা হয়,’ বলে উঠল রাফসান, সিকিউরিটি চিফকে ধরে নিয়েছিল পেশি-শক্তিতে মত্ত এক লোক হিসেবে। ভুল হয়েছে ওর। ‘তাহলে অফিশিয়াল মেইল থেকেই করা হয়। দারুণ, আজমল সাহেব। দেখুন তো, কী করা যায়।’

*

আধ-ঘণ্টা পরের কথা, কম্পিউটারের সামনে ঝুঁকে আছে রাফসান ও তার সঙ্গী, শিহান। পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন আজমল সাহেব এবং সি.ই.ও. সাজিদ রহমান।

উমা চক্রবর্তীর মেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রবেশ করাল রাফসান।

ওগুলো জোগাড় করা কঠিন হয়নি। সাজিদ রহমানের একটা ফোনকলই যথেষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে। তবে মেয়েটা বেঁচে থাকলে সম্ভবত এতটা সহজ হতো না কাজটা। যাই হোক, পাওয়া গিয়েছে, সেটাই বড়ো ব্যাপার।

হাট করে খুলে গেল দরজা, মানে মেইল অ্যাকাউন্ট। দশটার মতো না-খোলা মেইল দেখা গেল ওতে। এক নজর বুলিয়েই বুঝল রাফসান, সবগুলো ওদের সংস্থার অটোমেটেড মেইল, এরকম দশ-বারোটা নিজেও পায় সে।

প্রথমেই সেন্ট আইটেমে চলে গেল ও, যদি কাউকে মেইল পাঠিয়ে থাকে তো তা এই সেন্ট আইটেমেই থাকবে।

কিন্তু হায়, অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না কিছু। মেয়েটার ল্যাপটপ লক করা, তাই ওটা আনলক করে দেখতেও অনেক সময় লেগে যাবে। অবশ্য, উমার এই জেনেভা ভ্রমণের সব খরচ বহন করছে সি.ডি.আর.সি.। তাই মেইল আদান-প্রদান করলে সেটা এই মেইল থেকেই করার কথা। এর অর্থ একটাই, মেয়েটা ইচ্ছা করে মুছে

ফেলেছে সব। তাই ল্যাপটপ খুলতে পারলেও কাজের কাজ কিছু হবে বলে মনে হলো না।

বের হয়ে আসার আগে একবার ইনবক্সে ঢু মারল রাফসান। অনেকসময় ওখানে ফরোয়ার্ড করা মেইল থাকে। কিন্তু না, অল্প কয়েকটা মেইল আছে ওতে। হতাশ হয়ে বন্ধ করতে যাবে এমন সময় নজর পড়ল একটা মেইলের ওপর। NSA নামে কোনো সংগঠন থেকে পাঠানো হয়েছে ওটা। ওর মনে পড়ল, আমেরিকার অন্যতম প্রধান একটা সিকিউরিটি সংস্থা হলো এই এন.এস.এ.। তাই ওপেন করল সঙ্গে-সঙ্গে। বুঝতে পারল, এই এন.এস.এ. আসলে একটা ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানি। ওটার নাম Nectar and SAlve, মানে অমৃত আর পাচন! তবে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লেখা ইনিশিয়ালটা নজরে পড়ল আগে। পরের শব্দের প্রথম দুটো অক্ষর এস আর এ বড়ো বড়ো করে লেখা। ওষুধ কোম্পানিটাকে চেনে ও, এই অদ্ভুত নামকরণের কারণেই। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। আমেরিকায় পড়ালেখা শেষ করার পর, এই কোম্পানি থেকে চাকরির একটা অফার পেয়েছিল রাফসান। নেয়নি যদিও।

মেইলগুলো পড়তে শুরু করল সে, একেবারে শেষেরটা থেকে শুরু করল।

থমকে গেল পরক্ষণেই।

ওখানে যা লেখা হয়েছে তার বাংলা করলে হয়:

মিস উমা, আমাদের শেষ প্রস্তাবটা আশা করি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে দেখবেন। নইলে ভিন্ন পথ ধরতে বাধ্য হব আমরা।

‘আমাদের গল্পে, এ আবার কোন নতুন টুইস্ট?’ ওর কাঁধের ওপর থেকে জানতে চাইল শিহান।

*

সামনে ওয়াজেঠথের মূর্তি নিয়ে বসে আছে ওয়াজেথ। যেকোনো সফরের আগে এই কাজটা করা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে ও। বাবার বানানো মূর্তিটার সামনে নিজেকে সঁপে দিয়ে আশ্চর্য এক শান্তি অনুভব করে সে নিজের মাঝে। মনে হয় যেন দেবী ওয়াজেঠথের পাশে দাঁড়িয়ে বাবাই ওকে আশীর্বাদ করছেন।

এমনটা বিশ্বাস করার কারণও আছে। অর্জুনের সাথে চম্পক নগরীতে পা রেখেছে কয়েক বছর হতে চলল। বাবার আশীর্বাদে তরতর করে ওপরে উঠেছে এই কয় বছরে। ক্যাপ্টেন অর্জুনের মতোই সমুদ্রের ডাক মিশে গিয়েছে ওর রক্তে। যেকোনো সময়, যেকোনো অভিযানে যেতে সে একপায়ে খাড়া। এদিকে বড়ো ছেলের ওপর আস্তে-আস্তে আরও দায়িত্ব বাড়াচ্ছেন চাঁদ সওদাগর। আগে একটা জাহাজ নিয়েই পানিতে ভাসত ছেলে। এখন একাধিক জাহাজ সঙ্গী হয় তার। আর স্বভাবতই, সবগুলো জাহাজে থাকাটা অর্জুনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই অন্যান্য জাহাজে ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করতে হয়েছে তাকে। বলা বাহুল্য, এরকম এক জাহাজের ভার পেয়েছে ওয়াজেথ।

চম্পক নগরী আসলেই যেন এক দেবালয়। আর এর সবচেয়ে দামি সদস্য? কে আর! চাঁদ সওদাগর। যে পরিমাণ অর্থ আর প্রতিপত্তি আছে লোকটার, তাতে চাইলেই নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা দিতে পারেন। প্রচণ্ড শিব ভক্ত লোকটা ভাগ্যের হাত থেকে নিয়েছেনও দুহাত ভরে।

সোনার চাঁদ ছেলে আছে ছয়টা। প্রত্যেককে দেখলেই মনে হয়, দেবতারা যেন ধরণিতে নেমে এসেছেন। স্ত্রী সেনকার রূপ তো স্বর্গের

অপ্সরীদেরকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। ছয় সন্তান জন্ম দান করার পরও, দেহের বাঁধুনি হালকা হয়নি এক বিন্দুও। অর্থ, সম্পদ, যশ–কী নেই চাঁদ সওদাগরের।

তাই স্বভাবতই এমন একজন শাক্ত ভক্তের হাত থেকে পূজা পেলে, দেবী হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পথে আর কোনো বাধাই রইবে না মনসার। ওয়াজেথের জানামতে, সেজন্য অনার্য এ দেবী আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন। ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক পরাস্ত করতে চেয়েছেন চাঁদ সওদাগরকে। এদিকে চাঁদ নিজেও কম যান না, শিব আর দুর্গার আশীর্বাদে এখনও পরাস্ত হননি তিনি।

ওয়াজেথের অবশ্য এত বাতিক নেই। বরং আজীবন ওয়াজেঠথের পূজা করা মানুষ বলে, মনসাকে মেনে নেওয়াটা তার জন্য একেবারেই সহজ। তবে যেহেতু ওয়াজেঠথের মূর্তি আছে সামনে, তখন আরেকজনকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার?

সমস্যা হলো, আস্তে-আস্তে নাকি সওদাগর আর দেবীর মাঝে সম্পর্ক আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। কী হয়, কী হয়–এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াজেথ বুঝে পায় না, আর্য হোক আর অনার্য, দেবী তো দেবীই। মরণশীল মানুষ তার বিপরীতে দাঁড়াবার সাহস পায় কোত্থেকে।

ভাবতে-ভাবতেই একবার শ্রাগ করল ও, আদার ব্যাপারী সে। জাহাজের খোঁজ নিয়ে লাভ কী?

ওহ না, ভুল হলো। ও তো জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজের খোঁজ তো রাখতেই হবে।

অর্জুনের তরফ থেকে সেদিন সকালেই নির্দেশ এসেছে, রাতে দুই খানা জাহাজ ভাসবে পানিতে। একটার দায়িত্বে থাকবে সে নিজে, অন্যটার দায়িত্বে ওয়াজেথ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোছ-গাছে মন দিল যুবক, এবার কেন যেন কু ডাকছে মন। মনে হচ্ছে, না গেলেই বুঝি ভালো হবে। তারপরও আদেশ তো আদেশই। অমান্য করা মানে জীবনদাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

কালো লকেট তিনটা তুলে নিয়ে ভক্তি ভরে চুমু খেল একবার। তারপর গলিয়ে দিল গলায়। এরপর তাকাল সামনে থাকা ওয়াজেঠথের মূর্তির দিকে। ছোটো আকারের মূর্তিটা যেন সব সময় সাথে থাকে, সেজন্য আলাদা একটা থলে বানিয়ে নিয়েছে ও। থলেটা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ঝুলিয়ে দিল সে, ফলে দড়িটা বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে শেষ হলো ডান কোমরে। থলের মুখ খুলে ভক্তির সাথে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল মূর্তিটা।

আর কিছু দরকার নেই ওর। জামা-কাপড় সব সময় জাহাজেই থাকে।

বেরিয়ে গেল জাহাজ ঘাটার উদ্দেশ্যে।

*

ত্রিবেণী থেকে জাহাজ বেরিয়েছে তা-ও প্রায় এক মাস পার হতে চলল। চম্পক নগরীর হট্টগোল থেকে পালিয়ে আসতে পেরে ভালোই লাগছে অর্জুনের। নদী এখানে যেন সমুদ্রের রূপ ধরেছে। এমন প্রশস্ততা আগে কখনও দেখেনি যুবক। সেই সাথে হঠাৎ-হঠাৎ নজরে ধরা দিচ্ছে হালকা সবুজের সারি।

প্রশান্ত মনে এগিয়ে চলছে বণিকের ব্যাটা বণিক। এমনিতেও শহরের পরিস্থিতি ভালো নয়। বাবা চাঁদ সওদাগর যে এতটা গোঁয়ার্তুমি

করবেন, তা বুঝতেই পারেনি ও।

এই তো, শহর ছাড়ার আগের দিনেও এক পুরোহিত এসেছিল তার সাথে দেখা করতে। সচরাচর আর দশজন পুরোহিতের মতোই দেখতে। গায়ে গেরুয়া, মাথায় টিকি। একদম শান্ত চেহারা, কথা-বার্তাতেও নম্র। দেখলেই শ্রদ্ধা ভরে প্রণাম করতে মন চায়। ভোরের কিছুক্ষণ পরে এসেছিলেন পুরোহিত মশাই। জানিয়েছিলেন, প্রখ্যাত সওদাগরের সাথে কথা বলতে চান।

মনসা দেবীকে পূজা দিবেন না–এই সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও, এমনিতে বেশ ধার্মিক মানুষ চাঁদ সওদাগর। দান-খয়রাতের হাতও কম না। বিশেষ করে পুরোহিত, মন্দির আর ধর্মীয় সংগঠনগুলোতে উদার হাতেই দান করেন। তার কাছে এসে কেউ কিছু না পেয়ে ফিরে গিয়েছে, এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। অর্জুনকে ব্যবসা-সংক্রান্ত নির্দেশ দিচ্ছিলেন কাচারি ঘরে বসে, সেখানেই নিয়ে আসতে বললেন পুরোহিতকে।

‘আস্তিকস্য মুনের মাত জগৎ আনন্দকারিনী। এহ্যেহি মনসা দেবী নাগমাতা নমোহস্তুতে...’ বলতে-বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন পুরোহিত।

রাগে লাল হয়ে গেল বণিকের চেহারা। ‘ওই চেঙমুড়ী কানীর নাম আমার সামনে! এত বড়ো আস্পর্ধা!’ দেবীর ভক্ত না হলেও, অঞ্জলি ঠিক চিনতে পেরেছেন তিনি।

‘দেবী মনসা বড়ো জাগ্রত দেবী। বাসুকি যার ভাই, স্বয়ং শিব যার পিতা আর জগতকারু যার স্বামী...সেই মা মনসার চরণতলে ঠাঁই পাবার সৌভাগ্য সবার হয় না। শুনুন হে বণিক-শ্রেষ্ঠ চাঁদ সওদাগর, গতকাল মা এসেছিলেন আমার স্বপ্নে। তার এই নগণ্যতম পূজারীকে দিয়েছেন দর্শন।’

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন চাঁদ সওদাগর, কিন্তু মায়ের 'নগণ্যতম' পূজারীর দর্শন যেন ক্ষণিকের মাঝে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, অপরিসীম এক শক্তির আধার লোকটা, ভেতর থেকে যেন তা ক্ষণে-ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই শক্তিই যেন তাকে চুপ করে থাকতে বাধ্য করল।

'জানি, এসব কথা আগেও শুনেছেন আপনি।' বজ্র-কঠিন কণ্ঠে বলেই চলছেন পুরোহিত। 'তবে আজ শুনুন বিপদের কথা। এ কথা এর আগে আপনাকে আর কেউ বলেনি। শুনুন হে সম্পদের গর্বে গর্বিত বণিক, মা মনসার পুজো এই ভূ-ভারতে ছড়াবেই। তার আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হবেন পূজারীরা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাবেন সাফল্য। চাই সে পারিবারিক ক্ষেত্রে হোক, শারীরিক ক্ষেত্রে হোক আর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই হোক। কেননা তিনি সাপের দেবী, তিনি আরোগ্যের দেবী, তিনি প্রজননের দেবী!

'আর যেসব হতভাগা তার সামনে মাথা নত করবে না, যে সব পাপী-দুরাচার মেনে নেবে না তাকে, তাদের কপালে রয়েছে শুধু দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ। অবিবাহিত হলে বিয়ে করার সৌভাগ্য হবে না তাদের। যদি বিবাহিত হয়, তাহলে সন্তানের মুখ দেখবে না। আর যদি সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তাদের মুখাগ্নি করতে হবে। ধ্বংস হবে তার স্বাস্থ্য, উচ্ছন্নে যাবে ব্যবসা, আগুন লাগবে সংসারে।

'হে বণিক, সাবধান হোন। ছয়-ছয়টা পুত্র সন্তান আছে আপনার। নিজের জন্য না হলেও, অন্তত তাদের মুখ চেয়ে সাবধান হোন। আর যদি একগুঁয়েমি বজায় রাখেন, তাহলে শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করে নিন তাদেরকে। যতটা আদর-যত্ন করতে মন চায়, করুন। কেননা বেশিদিন আর সে সুযোগ পাবেন না। সামনেই বর্ষা। মায়ের ভৃত্য দিব্য-সর্পেরা বেরিয়ে আসবেন তাদের আবাস থেকে। তাদের

চলার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই দুনিয়াতে। এমন কোনো শক্তি নেই যা থামাতে পারে তাদের উদ্যত ফলাকে।

‘তাই চাঁদ সওদাগর, সাবধান হোন! কঠিন সময় আসার আগেই সাবধান হোন! সাবধান হোন!’

কথা শেষ করেই উলটো দিকে হাঁটা ধরলেন পুরোহিত। ভাগ্য ভালো ধরেছিলেন, নইলে হয়তো ধার্মিক বলে খ্যাত চাঁদ সওদাগর সেদিন তার কাচারি ঘর এক ধর্ম-নেতার রক্তে রঞ্জিত করতেন! তার কাচারি ঘরে এসে, তার-ই সংসারকে হুমকি দেয়! অসম্ভব, এ মেনে নেওয়া যায় না।

মনসাকে দেবী হিসেবে না মানার সিদ্ধান্তটা আরেকটু দৃঢ় হলো তার।

এসব হুমকিতে যে তিনি ভয় পান না, তা প্রমাণ করার জন্যই যেন বড়ো ছেলে অর্জুনকে সেদিন রাতেই পাঠিয়ে দিলেন ত্রিবেণীতে। ওখান থেকে সে চলে যাবে দক্ষিণে। অনেক বড়ো একটা জঙ্গল আছে নাকি নদীর শেষে, যেখানে সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে ওটা। যেতে-আসতে বছর খানেক লাগলে, লাগুক।

বিশ্বস্ত একদল নাবিককে নিয়ে বের হয়েছে অর্জুন, এবার সেই বহু গল্প শোনা জঙ্গল পর্যন্ত গিয়েই ছাড়বে। মাঝপথে ব্যবসা করার সুযোগ যে একেবারে আসেনি, তা না। করেছেও কিছু। কিন্তু ঠিক করেছে, আগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যাক। ফেরার পথে ব্যবসা করা যাবে, এসব জনপদ তো আর হারিয়ে যাচ্ছে না।

গৌতমের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ মনটা একটু বিষণ্ন হয়ে গেল ওর। আসলে এত লম্বা ভ্রমণে বৈদ্যকে আনাটা উচিত হয়নি। প্রথম থেকেই কেমন যেন মনমরা হয়ে ছিল ওর বন্ধু, এমন ম্রিয়মাণ ওকে আগে কখনও দেখেনি। কী হয়েছে? প্রশ্নটা অনেকবার করেও উত্তর বের করতে পারেনি।

বিগত কয়েক বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে বৈদ্যের মাঝে।

রাতের খাবার সেরে নিয়ে বিছানায় উঠল অর্জুন। পিতার কথা মনে পড়ছে বার-বার। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, গোঁড়া মনসা পূজারীরা না আবার ওর কোনো ক্ষতি করে বসে। স্বীকার না করলেও, হুমকি শুনে যে তিনি নাড়া খেয়েছেন তা একদম পরিষ্কার। ছেলের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে লম্বা সফরে গেলে, এমন চিন্তা করেও পাঠাতে পারেন ওকে অভিযানে।

কারণ, সঙ্গীদের সাবধানতার সাথে বেছে নিতে বলেছেন তিনি। তবে খুব একটা বাছাবাছি করতে হয়নি অর্জুনকে। এরা ওর আপনার লোক। এর আগেও বহুবার একসাথে অভিযানে গিয়েছে, এবারও যাচ্ছে। নতুন কাউকে নিতেই হয়নি।

বাতি নিভিয়ে গায়ের ওপর কাঁথা টেনে দিল সে, মায়ের বানানো। এক বছরেরও বেশি সময় ছেলের সঙ্গে দেখা হবে না বলে, মা দিয়ে দিয়েছেন। এই কাঁথা গায়ে দিলে কেন যেন খুব আরামের ঘুম হয় ওর। মনে হয় মায়ের কাছেই শুয়ে রয়েছে। তাই গরম হোক আর ঠান্ডা, কাঁথাটা ছাড়া ঘুমাতেই যায় না যুবক।

বাঁ কাত হয়ে শুয়েছিল অর্জুন। হঠাৎ করে পিঠের কাছটায় কেমন একটা শীতল অনুভূতিবোধ করল। মনে হলো যেন কেউ দড়ি রেখে গিয়েছে ভুলে। কিন্তু না, দড়ি তো আর নড়ে না! অথচ এই দড়িটা ঠিক নড়ে উঠল।

চমকে গিয়ে উঠে বসতে গেল অর্জুন। তবে কী ঘটেছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে, উঠে পুরোপুরি বসতে পারার আগেই অস্ফুট শব্দে 'আহ!' বলে উঠল সে। পিঠে যেন সুঁই ফুটেছে।

পরক্ষণেই 'সাপ! সাপ! বাঁচাও!' বলে আবার ঢলে পড়ল বিছানার ওপর।

দুর্ভাগ্য ওর, চমকে উঠে আবারও ছোবল বসাল সাপ।

ছয়

কিছু একটা বোধহয় পাওয়া গেল, এই আশায় বুক বাঁধল রাফসান। আর কিছু না হলেও, অন্তত একটা সূত্র তো এই মেইল। তাই কালক্ষেপণ না করে তখনই ছুটতে চাইল এন.এস.এ.র অফিসের দিকে।

থামাল ওকে শিহান, মনে করিয়ে দিল যে আজ শুক্রবার। বাংলাদেশে সাধারণত শুক্রবার সব ধরনের অফিস বন্ধ থাকে। তাই আগে থেকে যোগাযোগ না করে শুধু-শুধু দৌড়াবার কোনো অর্থ হয় না।

মাথা ঠান্ডা করল রাফসান, কথা তো সত্যি। তাই শিহানকে খোঁজ নেবার জন্য পাঠিয়ে, নিজে বসে গেল পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে।

নতুন ওষুধ আবিষ্কার হলে, ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। কোটি-কোটি টাকার ব্যবসা করে এরা। কিন্তু নেকটার অ্যান্ড সালভ একটু আলাদা ধরনের। প্রাকৃতিক ওষুধের দিকেই নজর ওদের। এ থেকেও উমার আবিষ্কারের ব্যাপারে একটু ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। মেইলের শব্দচয়ন থেকেও। নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ভাবে ওই আবিষ্কার এবং তার কার্যক্ষমতা জানতে পেরেছিল কোম্পানিটি।

যুক্তি বলে, ওষুধটা প্রাকৃতিক কোনো উপায়ে বানানো যায় বা খুব বেশি রাসায়নিক লাগে না বানাতে; নইলে এই কোম্পানি এতটা আগ্রহ দেখাত না। আরও বুঝতে পারছে যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ কোটি টাকা কামাবার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে এর মাঝে। এজন্যই এমন হুমকি দেওয়া মেইল।

এন.এস.এ.র সি.ই.ও.র সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভাবল রাফসান। তারপর যেতে হবে মেয়েটার বাবার সঙ্গে বসতে। ভদ্রলোকের নাম প্রীতম চক্রবর্তী। তিনি নিজেও বৈজ্ঞানিক, ফার্মাকোলজির। তাই এসব ব্যাপারে তার কিছু জানা থাকাটা অসম্ভব কিছু না। তারচেয়ে বড়ো কথা, মেয়েটার আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। তাই নিজের আবিষ্কার নিয়ে কথা বললে অবশ্যই বাপের সঙ্গে কথা বলবে উমা।

এসব ভাবতে-ভাবতেই, খোঁজ নিয়ে ফিরে এলো শিহান। কথায় কিছুটা অবজ্ঞাই ঝরে পড়ল ওর, 'ফিরিঙ্গি কোম্পানি, ফিরিঙ্গি আচরণ। শনি-রবিবার বন্ধ। আজকে খোলাই আছে। আমি কথা বললাম, সি.ই.ও. আছে নাকি। পুলিশ শুনে আর মানা করেনি। দেখা করবে। চলুন যাই।'

রাফসানের আর আমন্ত্রণের দরকার পড়ল না।

*

এন.এস.এ. ফার্মাসিউটিকালসের প্রধান অফিসটা শ্যামলীতে। পাঁচ তলা লম্বা দালানটার পুরোটাই তাদের। বাইরে বড়ো-বড়ো অক্ষরে দেখা যাচ্ছে কোম্পানির নাম আর ইনিশিয়াল। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর, আরও কয়েকশো মিটার এগোতে হয় দালানের দরজায় পৌঁছাতে হলে। রাজধানীর এমন দামি একটা জায়গায়, এত বড়ো এলাকার ওপরে দালান খাড়া করা চাট্টিখানি কথা না...তার ওপর পাঁচ তলা অফিস! টাকার কোনো অভাব নেই এদের–বুঝতে পারল শিহান-রাফসান জুটি।

সাদা পোশাকই আছে এখনও দেহে, তবে অস্ত্র আর ব্যাজ নিয়ে এসেছে এস.আই. শিহান। ভেতরে পা রেখে সরাসরি চলে গেল রিসেপশন ডেস্কে। নিজের পরিচয় দিতেই সুন্দর, তরুণী রিসেপশনিস্ট দেখিয়ে দিল একটা লিফট।

নির্দিষ্ট লিফটে উঠে রাফসান বুঝতে পারল, এটা শুধু একটা মাত্র তালায় যায়। কেননা মাত্র একটাই বাটন আছে প্যানেলে, পঞ্চম তলায় ওঠার জন্য। এক্সপ্রেস লিফট এটা, সম্ভবত শুধু সি.ই.ও. এবং খুব বড়ো মাপের কর্মকর্তা বা অতিথিরা ব্যবহার করতে পারে। নিজেকে ফাঁদে পড়া জন্তু বলে মনে হলো রাফসানের।

এ কোথায় এসে পড়েছে? এমন স্টাইল তো দেশি কোনো প্রতিষ্ঠানে হয় না! তারচেয়ে বড়ো কথা–ওঠার রাস্তা একটা হলে, নামার রাস্তা নিশ্চয়ই দুটো হবে না। মেইলে পড়া লেখাগুলো আচমকা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

মিস উমা, আমাদের শেষ প্রস্তাবটা আশা করি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করে দেখবেন। নইলে ভিন্ন পথ ধরতে বাধ্য হব আমরা।

পরক্ষণেই দৃষ্টি পড়ল শিহানের দিকে। পুলিশ সঙ্গে থাকলে, যত বড়ো হ্যাডমই আসুক না কেন, কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। পরক্ষণেই হেসে ফেলল আপনমনে। অনভ্যাসে বিদ্যা আসলেই নাশ হয়। এখনই উলটা-পালটা কিছু হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আধুনিক লিফট, পাঁচ তলা উঠতে সময় লাগল না। ঝাঁকিও খেতে হলো না। চুপচাপ ওপরে উঠে এলো ওরা। লিফট খুলতেই দেখা গেল–সামনে এক পিয়ন দাঁড়ানো। তার দেহে সবুজ ইউনিফর্ম। নাম যেমন প্রাকৃতিক, তেমনি প্রকৃতির একটা ছোঁয়া রাখার চেষ্টা আছে কোম্পানিটার। এমনকী দেওয়ালগুলোও সবুজ রং করা। তা-ও ক্যাটক্যাটে সবুজ না, চোখে আরাম দেওয়া সবুজ।

‘এদিকে আসুন, স্যারেরা।’ পিয়নের মুখে শুদ্ধ বাংলা শুনে চমকে উঠল রাফসান। ‘স্যার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।’

পরের ‘স্যার’ যে কোম্পানির সি.ই.ও., তা কাউকে বলে দিতে হলো না।

লিফট থেকে নেমেই একটা করিডর। সেই করিডরের একেবারে শেষ মাথায় নিয়ে এলো লোকটা ওদের। যে দরজাটার সামনে দাঁড়াল, সেটাতে কোনো আলাদা বিশেষত্ব নেই। নেমপ্লেট দেখা যাচ্ছে না, বা আলাদা ডেকোরেশনও নেই। ভেতরে বসা লোকটা হয় অনেক বেশি সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত...আর নয়তো নিজের ক্ষমতার গর্বে গর্বিত।

পরেরটা হবার সম্ভাবনাই বেশি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল পিয়ন।

‘এসো,’ ভেতর থেকে ভেসে এলো পরিষ্কার বাংলায় জবাব।

একটু অবাক হলো রাফসান। মাল্টিন্যাশনাল ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির সি.ই.ও. বিদেশি হবে বলেই আশা করেছিল। এখন তো দেখতে পাচ্ছে, হয় লোকটা বাংলাদেশি...আর নয়তো ভালোই বাংলা জানে।

দরজা খুলে দিয়ে একপাশে আর দাঁড়াল না পিয়ন, ভেতরে ঢুকে ওরা প্রবেশ না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, ‘মি. রাফসান ও এস.আই. আশিকুর রহমান’ বলে ওদের পরিচয় দিয়েই বেরিয়ে গেল।

পুরোপুরি বিদেশি কায়দা।

তবে ওদের সামনে থাকা ডেস্কের ওপাশে বসা লোকটা বিদেশি নয়।

এক নজরেই বোঝা যায় তার বাংলাদেশি বংশ-পরিচয়। বয়স হবে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, এমন একটা পদের জন্য বয়সটা কমই বলা চলে। ত্বক বাংলাদেশিদের মতোই শ্যামলা। চুলে হালকা পাক ধরেছে। উচ্চতা টেনে-টুনে সাড়ে পাঁচ ফুট হবে। বসে ছিল লোকটা, এবার উঠে এসে পরিচয় দিল।

'আমি রিদওয়ান, রিদওয়ান ইসলাম। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি?' ঘরের ভেতরে থাকা টেবিল-চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ভঙ্গিতে বসার অনুরোধ।

অনুরোধ পালন করল রাফসান।

'আমরা এসেছি,' সবাই বসলে বলতে শুরু করল ও। 'একটা বিশেষ প্রয়োজনে। আমি সি.ডি.আর.সি.তে কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট সায়েন্টিস্ট। আর ইনি হচ্ছেন,' শিহানের দিকে ফিরল ও। 'বাংলাদেশ পুলিশের এস.আই. আশিকুর রহমান।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' চমকাবার কোনো লক্ষণ নেই রিদওয়ানের হাবে-ভাবে।

'আমাদের প্রতিষ্ঠানের এক বিজ্ঞানী, উমা চক্রবর্তীর মিসিং কিছু ফাইলের ব্যাপারে আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম আপনার সঙ্গে।' আসল ঘটনা এই লোকের সামনে প্রকাশ করতে চায় না রাফসান।

'উমা...উমা...নাহ, এই নামে কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।' কিছুক্ষণ ভাববার ভঙ্গি করল লোকটা। 'আরও কিছু বলুন তো তার ব্যাপারে।'

'মাইক্রোবায়োলজিস্ট, লম্বায় পাঁচ-চার হবে। কালো চুল, বয়স ত্রিশের কাছে।'

'নাহ, তা-ও মনে পড়ছে না।'

‘নতুন একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছে সে,’ শেষমেশ বলেই ফেলল রাফসান। ‘এবারের কনভেনশনে সেটা দেখাবার কথা।’

‘ওহ, হ্যাঁ।’ উজ্জ্বল হয়ে গেল রিদওয়ানের চোখ-মুখ। এই লোক যদি আসলেই কিছু না জেনে থাকে, তাহলে তার অস্কার পাওয়া উচিত–মনে-মনে ভাবল রাফসান। ‘আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।’

‘জি,’ এত সহজে লোকটা মেনে নিলো দেখে অবাকই হলো রাফসান। ‘সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।’

‘বলুন।’

‘ওর আবিষ্কারটা কী ছিল, বলতে পারবেন?’ এই প্রথম মুখ খুলল শিহান।

‘দেখুন, মি. আশিক,’ ওর পোশাকি নামে সম্বোধন করল রিদওয়ান। ‘এসব ব্যাপার একান্ত গোপনীয়, পেটেন্ট হবার আগে ছড়িয়ে যাক–তা চাই না। তাই আমি অনুরোধ করব, এই প্রশ্নটা আপনি মিস উমাকে করলেই ভালো হবে। উত্তর যা দেবার তিনিই দেবেন।’

‘কিন্তু তিনি তো–’ মারা গিয়েছেন বলতে চেয়েছিল শিহান। তবে রাফসানের ভ্রূকুটি দেখে থেমে গেল।

‘তিনি তো...কী?’ কথাটা কান এড়ায়নি সি.ই.ও.র।

‘উমা আসলে বিমানে আছে,’ বলল রাফসান। কোনো রকমে ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা। ‘ওর বিমানে যেন কী একটা সমস্যা হয়েছে। তাই আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না। রাতের আগে হবে বলে মনেও হচ্ছে না। এদিকে তথ্যটা জানাও খুব জরুরি। তাই আপনার শরণাপন্ন হওয়া।’

রিদওয়ানের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, একটা কথাও বিশ্বাস করেনি সে। কথাতেও তা স্পষ্ট। ‘তাহলে পুলিশ এর মাঝে কেন?’

ধরা পড়ে গিয়েছে, বুঝতে পারল রাফসান। এখন আর কিছু করার নেই। নরম-সরম কথা দিয়ে প্রথমে উমার আবিষ্কারের ব্যাপারে কিছু জানার ইচ্ছা ছিল ওর। তা যখন হলো না, তখন শক্ত লাইনেই যাওয়া দরকার। শিহানকে ইঙ্গিত দিল সে।

এবার শুরু করল শিহান, 'জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত, তাই এর বেশি কিছু আপনাকে জানানো যাচ্ছে না। দয়া করে রাফসান সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিন।'

কয়েক মুহূর্ত সোজা হয়ে রইল রিদওয়ান, চোখ ঝলসে উঠেছে। সেই মুহূর্তের কঠিন মুখাবয়ব দেখে রাফসান বুঝতে পারল, কেন কমবয়সেই এত বড়ো একটা প্রতিষ্ঠানের সি.ই.ও. হতে পেরেছে লোকটা। হাবে-ভাবে ফুটে উঠেছে ইস্পাত-কঠিন কাঠিন্য। আস্তে করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল রিদওয়ান। আমুদে কণ্ঠে বলল, 'গ্রেফতার করছেন নাকি, শিহান সাহেব?' বলে পা নাচাল একটু, যেন বোঝাতে চাইল–তুমি তোমার ডাক-নাম বলোনি, কিন্তু আমি বের করে ফেলেছি। তাহলে বোঝ আমার ক্ষমতা।

লোকটার মুখে ডাক-নাম শুনে কিছুটা নাড়া খেল শিহান। কিন্তু নিজেকে সামলে ফেলল পরমুহূর্তেই। 'কেন, গ্রেফতার না করলে কিছু বলবেন না?'

হাসিতে ফেটে পড়ল যেন লোকটা, সুন্দর করে সাজানো ঘরটার প্রতিটা কোনায় ছড়িয়ে পড়ল সেই হাসি, প্রতিধ্বনিত হলো। 'এন.এস.এ. মানে জানেন এস.আই. সাহেব?' উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বলে দিল। 'নেকটার অ্যান্ড সালভ। আমরা আমেরিকান কোম্পানি। অথচ বাংলাদেশের মতো পশ্চাদপদ একটা দেশে এসে ব্যবসা ফেঁদে বসেছি। আমাদের স্থাপনা, আমাদের প্রতিষ্ঠান তো দেখেছেন। আপনার কি ধারণা, কোথাকার কোন এস.আই. এসে আমাকে হুমকি দিয়ে যাবে, আর নাক টিপলে দুধ বের হওয়া সেই

বাচ্চার আদেশে আমি প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলব? আপনাদেরকে ভদ্রতাবশত ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছিলাম। ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাববেন না, প্লিজ।'

মুচকি হাসল রাফসান। 'আমরা কিন্তু আপনাকে খারাপ কোনো প্রশ্ন করিনি! অথচ আপনি উত্তরটা খারাপভাবেই দিলেন। যাই হোক, প্রয়োজন হলে ওয়ারেন্ট জোগাড় করতে বা আপনাকে ধরে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা হাজতে রাখতে আমাদের সমস্যা হবে না। আপাতত চাইছি না...এই যা।' সামনে ঝুঁকে এলো ও। 'সত্যি কথা হলো, গতকাল রাতে খুন হয়েছেন বিজ্ঞানী উমা চক্রবর্তী।'

রিদওয়ানের চেহারার পরিবর্তনটা হলো দেখার মতো, হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। মনে হচ্ছে বুঝি আসমান থেকে ঘরের মধ্যে হাতি নেমে এলেও এতটা অবাক হতো না। কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই সামলে নিলো নিজেকে। 'কি...কিন্তু এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলো রাফসান, ও ভেবেছিল–খুনের সাথে এদের কোনো-না-কোনো সম্পর্ক না থেকে যায়-ই না। এখন তো এই লোকের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে ভুল ভেবেছিল!

এদিকে শিহান বসে নেই। উমাকে পাঠানো এন.এস.এ.র মেইলের কপিটা সরাসরি ছুড়ে দিল লোকটার সামনে। ওতে হুমকির লাইনগুলো লাল মার্কার দিয়ে দাগ দেওয়া আছে। 'এই মেইল পাঠাবার কথা মনে পড়ে?' জানতে চাইল ও।

'আমাদের সঙ্গে মেইল আদান-প্রদান হচ্ছিল বিজ্ঞানী উমার, তা আমার জানা আছে। কিন্তু–'

যে উমাকে চিনতেই এত কষ্ট হচ্ছিল এতক্ষণ, সেই উমার সাথে মেইল আদান-প্রদানের কথা মনে থাকে কী করে? প্রশ্নটা করতে চাইছিল রাফসান। কিন্তু কী ভেবে চুপ করে রইল।

‘কিন্তু–’

‘কিন্তু কী মেইল পাঠানো হয়, তা তো আর আমি ঠিক করে দেই না।’

‘বুঝলাম, কিন্তু আপনার এই মেইল নামক হুমকির কী অর্থ? আর তাছাড়া, পেটেন্ট নেওয়া হয়নি। এমনকী এখন পর্যন্ত নতুন এই আবিষ্কারের ঘোষণা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আপনারা খোঁজ পেলেন কী করে?’ প্রশ্ন করল শিহান।

‘দেখুন শিহান সাহেব,’ শুরু করল রিদওয়ান। ‘পশ্চিমা বিশ্বে ওষুধ বলতে সবাই অ্যালোপ্যাথিকেই বোঝে। প্রাকৃতিক ওষুধের দিকে তাদের ঝোঁক নেই বললেই চলে। কিন্তু এই উপমহাদেশে যতটা না পাশ করা ডাক্তারদের দিকে মানুষের ঝোঁক, তারচেয়ে বেশি ঝোঁক হোমিওপ্যাথি, হারবাল আর ঝাড়ফুঁকের দিকে। আমরা শুধু নিজেরাই ওষুধ বানাই না, অনেক হারবাল কোম্পানিকে অর্থ অনুদানও দিয়ে থাকি। তাই আমাদের সবসময় সজাগ থাকতে হয়। বড়ো-বড়ো সব রিসার্চ প্রতিষ্ঠানেই আমাদের লোক থাকে। সি.ডি.আর.সি.ও...’ রাফসানের দিকে তাকিয়ে নড করল সে। ‘এর ব্যতিক্রম নয়।’

কথাটা সত্যি, মানতে বাধ্য হলো রাফসান। আজও ডায়রিয়া হলে অনেক বাবা-মা স্যালাইন না খাইয়ে ওঝাকে ডাকতে যায়। ‘আর মেইলের ব্যাপারটা?’

‘অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ব্যাপার। পুরোই ভুল বোঝাবুঝি,’ বলল রিদওয়ান। ‘আসলে মিস উমার সঙ্গে দুর্ঘটনাটা ঘটার কারণে এই মেইলের শব্দগুলোকে আপনার ভিন্ন অর্থে দেখছেন। ধরুন আমাদের মাঝে রাগারাগি হলো। আপনি বললেন, রিদওয়ান তুমি মরো। দেখা গেল, আপনি এখান থেকে বের হবার ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে হার্ট অ্যাটাকে আমি মারা গেলাম। তাহলে কি আপনাকে দায়ী করা যাবে?’

‘না।’ সোজা-সাপ্টা উত্তর রাফসানের।

‘এখানেও ব্যাপারটা তেমন। যদি উমা চক্রবর্তী আমাদেরকে ফর্মুলা না দেন, তাহলে আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করব। এরপর তিনি প্যাটেন্ট করে নিলে আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুমতি চাইব, তারা যেন আমাদেরকে এই ওষুধ বানাবার লাইসেন্স দেন। বিনিময়ে আমরা এ দেশে ভর্তুকি দিয়ে চালাব ওষুধটা। এটাই হচ্ছে ভিন্ন উপায়।’ যেন কোনো ছোটো বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে, এমন ভঙ্গি লোকটার।

‘এতে আপনাদের লাভ?’ জানতে চাইল শিহান।

‘দেশে নাহয় ভর্তুকি দিব। কিন্তু ওষুধটা যদি আসলে ক্যান্সারের নিরাময় হয়,’ বলে জিভে কামড় বসাল রিদওয়ান। পরক্ষণেই এমনভাব করল যেন কিছুই বলেনি। ‘মানে বলতে চাচ্ছি, যদি ওষুধটা ভালো হয়, তাহলে রপ্তানি করেই আমরা অনেক বেশি পুষিয়ে নিতে পারব।’

মাথা নাড়ল রাফসান, আসলেই পারবে। ওষুধের দামের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখে সে। যে প্যারাসিটামলের দাম দেশে দশ টাকা পাতা, সেটাই বাইরে কিনতে গেলে কয়েকশো টাকা খরচ করতে হয়–জানা আছে ওর।

‘তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন–এই মেইলের মাঝে হুমকি দেওয়ার কিছু নেই?’ পরাজয়ের সুরে জানতে চাইল শিহান, লোকটার গল্পে কোনো ফাঁক বের করতে পারছে না।

‘একদম না। একেবারে নির্দোষ মেইল।’

চুপ করে বসে রইল রাফসান ও শিহান।

‘আর কোনোভাবে,’ বেশ কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রিদওয়ান। ‘আপনাদের সাহায্য করতে পারি?’

‘নাহ,’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল শিহান। ‘প্রয়োজন হলে আবার যোগাযোগ করতে বাধা নেই তো? নাকি ওয়ারেন্ট লাগবে?’ ঝাল ঝাড়ল সে।

‘না, না। ওসবের আবার কী দরকার?’ যেন বিনয়ের অবতার বনে গেল রিদওয়ান। ‘পুরো ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝি। যখন দরকার পড়বে, আমি সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকব।’ বলে মেইলের কপিটা এগিয়ে দিল সে। ‘এটা আপনাদের।’

‘আপনিই রাখুন, যদি আরও কিছু মনে পড়ে।’ বলে বেরিয়ে গেল রাফসানরা।

*

‘কী মনে হয়?’ গাড়িতে উঠেই প্রশ্ন করল শিহান।

‘ব্যাটা কিছু একটা লুকাচ্ছে।’

‘ঠিক। প্রথমে তো উমা নামে কাউকে চেনে, সে কথাই স্বীকার করতে চাইছিল না! আমার মনে হয় না মেইলটা নির্দোষ কিছু।’

‘আমারও মনে হয় না। আর তাছাড়া, অনুমতির যে গল্প শোনাল, সেটা এত সহজও না। চাইলাম আর হয়ে গেল–তা সাধারণত হয় না। কোনো-না-কোনো কিন্তু আছে। এদের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া দরকার।’

‘হুম, মারুফ স্যারকে বলতে হবে।’ সায় জানাল শিহান। ‘তা, এবার কোনদিকে যাব?’

‘উমার বাসার দিকে চলো। ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে।’ মেয়েটার ঠিকানা বলে দিল রাফসান, আগেই নিয়ে এসেছে।

*

আধ-ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে রাফসানদের বেরিয়ে যাবার, কিন্তু এখনও চিন্তিত রিদওয়ান।

আমেরিকা থেকে এম.বি.এ. করেছে লোকটা। জয়েন করেছিল ওখানকারই এন.এস.এ.র অফিসে। পরে বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়ে ওকে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশে। সফল হলে, ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তা থাকবে না।

রাফসানরা বের হবার পর, এই আধ-ঘণ্টায় পাঁচটা মার্লবোরো রেড শেষ করেছে সে। সাধারণত ধূমপান করার ইচ্ছা হলে রুমের বাইরে গিয়ে খায়। এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসে ধূমপান করলে গন্ধ হয়ে যায় ভেতরটা। কিন্তু যে মেইল দেখল, তাতে আর ঘরের ভেতরের গন্ধ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই ওর।

নিজেকে নিজেরই লাথি দিতে ইচ্ছা হচ্ছে রিদওয়ানের। রিক্রুটারদের বলা ছিল, তারা যেন যেভাবেই হোক, বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক ওষুধ আবিষ্কারককে কিনে নেয়। টাকাপয়সার প্রলোভন তো আছেই, কাজ না হলে ভয় দেখাতেও বাধা নেই কোনো। কিন্তু তাই বলে যে খোদ উমা চক্রবর্তীকেই ভয় দেখাতে হবে–তা কে বলেছে?

সিগারেট ধরাবার আগে ইচ্ছা হচ্ছিল, এই রিক্রুটারকে গুলি করে মারে। কিন্তু এখন শান্ত হয়ে এসেছে অনেকটাই। বুঝতে পারছে,

বেচারাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যা হবার হয়ে গিয়েছে। ড্যামেজ কীভাবে হলো তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, ড্যামেজ কন্ট্রোল নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার এখন।

ষষ্ঠ সিগারেটটা শেষ হবার পর, ট্যাব তুলে নিলো হাতে। পর্দায় বড়ো করে অ লেখা আইকনটায় চাপ দিল। চায়নিজ সরকার তাদের মতো করে বানিয়েছে স্কাইপে। অনেকটা সেই পদ্ধতি ব্যবহার করেই বানানো এই অ্যাপ। দশটার মতো দেশে রাউট করে অবশেষে উদ্দিষ্ট লোকটার কাছে পৌঁছায় ভিডিয়ো কল। কারও বাপেরও সাধ্য নেই একে ট্রেস করার।

হাতেগোনা কয়েকজনের কাছে আছে এই অ্যাপ। যতদূর জানে, বাংলাদেশে আছে ও বাদে মাত্র একজনের কাছে অ্যাপটা।

কয়েক মিনিটের মাঝে একটা আবছা অবয়ব ফুটে উঠল পর্দায়। কে এই অবয়বের মালিক তা জানা নেই রিদওয়ানের। কিন্তু জানে, এই লোককে সন্তুষ্ট রাখার ওপর নির্ভর করছে ওর ভবিষ্যৎ।

হয়তো সেই ভবিষ্যতে যেতে পারবে কিনা, সেটাও।

'অহিংশের জয় হোক,' নিচু স্বরে বলল রিদওয়ান। 'ব্যাপারটা সম্ভবত কেউ আঁচ করতে পেরেছে!'

সাত

শ্যামলী থেকে ধানমন্ডি...খুব একটা বেশি না দূরত্বটুকু।

রাস্তাটা চুপচাপ কাটিয়ে দিল দুই রহস্যভেদী। নিজের চিন্তায় মগ্ন রাফসান। একটু আগে দেখতে যাওয়া সি.ই.ও.র ভাবগতিক ওর সুবিধার লাগেনি। প্রথমে না বোঝার ভান করা, এরপর আচমকা শক্ত হয়ে যাওয়া, তারপর আবার ভিজে বেড়াল বনা–সব মিলিয়ে সন্দেহজনক একটা চরিত্র। নাহ, আপনমনেই বলল সে, এখানে কোনো কিন্তু না থেকে যায়-ই না।

একই চিন্তা খেলছে সম্ভবত শিহানের মাথাতেও, সে-ও কিছু বলছে না।

আধ-ঘণ্টার মাঝেই চলে এলো ওরা ধানমন্ডিতে। বিখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট, অধ্যাপক প্রীতম চক্রবর্তীর মেয়ে মৃতা উমা চক্রবর্তী। সন্তান বলতে একমাত্র মেয়ে। বাড়িটাও সেইরকম! আধুনিক ডিজাইনের সাথে প্রাচীন আবহের মিল হয়েছে যেন এখানে। দেখে প্রথমে জমিদার বাড়ি বলে মনে হয়। সদর দরজায় বিশাল বড়ো এক লোহার গেট। ওটার দুই মাথায়, স্তম্ভের ওপরে বসে আছে হাঁ করা দুই সিংহ। সাদা সিংহগুলোর মুখের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একজোড়া করে শ্বদন্ত। আশ্চর্য রকমের জীবন্ত দেখাচ্ছে ওই মূর্তি দুটোকে। মনে হয় যেন এই হাঁক ছেড়ে উঠবে!

সদর দরজার সাথেই লাগোয়া দারোয়ানের ঘর। বাইরে বসে থাকতে হয় না তাকে। কেউ আসলে বা গেলে দরজাও খুলে দিতে হয় না। ঘরের ভেতর থেকেই সুইচ টিপে দরজার খোলা-বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে।

আধুনিকতার সাথে মিলেছে প্রাচীন আবহ...

আগেই কথা বলে রেখেছিলেন সাজিদ সাহেব। তাই নিজেদের পরিচয় দেওয়া মাত্র ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হলো ওদের।

সদর দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢোকা মাত্র আরেকবার 'টাশকি' খেল রাফসান। দরজা থেকে প্রায় দুইশো মিটার দূরে দালান বাড়ি। ঢাকা শহরের ধানমন্ডির মতো জায়গায় এমন বিশাল জমি নিয়ে বাড়ি বানানো চাট্টিখানি কথা নয়। মূল দালানটা দোতলা। নিচের তলার চাইতে ওপরের তলায় ঘরের সংখ্যা কম। পুরোটাই সাদা চুনকাম করা। সাদামাটা বলে ভুল করবে যে কেউ, কিন্তু গাড়ির কাছে যাওয়া মাত্র দেওয়ালের চকচকে ভাবটা নজরে পড়ল রাফসানদের। নিয়মিত চুনকাম কাম করা হয়, তার ওপরে দেওয়া হয় সাদা রঙেরই ডিসটেম্পার–এসব আলাদা করে বলে দিতে হলো না।

গাড়ি দালানের সামনেই পার্ক করবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছিল শিহান। কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন আরেক লোক। নিশ্চয়ই দারোয়ান জানিয়েছে–ভাবল রাফসান। ওদেরকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে, দালান ঘুরে পেছনে চলে গেলেন লোকটা।

মূল দালানের পেছনে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। প্রাইভেসির খাতিরেই হয়তো, ভাবল রাফসান। নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয় কিছুটা। ভেতরে ঝামেলা করে, সহজে বাইরে বেরোবার উপায় নেই।

গাড়ি পার্ক করে আবার সামনের দিকে এগোল ওরা দুইজন। সুন্দর করে দুই পাশে সাজানো হয়েছে বাগান। ফুল গাছের অভাব নেই, বেশ কয়েকটা গাছে ফুলও ধরেছে। তবে রাফসান প্রকৃতিপ্রেমী ছিল না কখনওই; তাই ফুল চিনলেও, ফুলগাছ চিনতে পারল না।

যে কাজে এসেছে, তাতে চেনার দরকারও নেই।

‘আমি মেহেদি,’ আচমকা পাশে হাঁটতে থাকা লোকটা বলে উঠলেন। ‘আমাকে প্রফেসর সাহেবের ম্যানেজার বলতে পারেন। তার সব কিছু আমিই দেখভাল করি।’

নিজেদের পরিচয় দিল ওরা।

‘কিছু মনে করবেন না,’ বললেন মেহেদি। ‘প্রীতম ভাই খুব কষ্টে আছেন, আজকেই ওকে বিরক্ত না করলে কী চলত না?’ কণ্ঠে কিছুটা রাগের আভাস।

এতক্ষণে ভালোমতো লোকটাকে দেখল রাফসান। লম্বাই বলা চলে, অনেকটা ওর সমান। কম করে হলেও পাঁচ ফুট আট-নয় হবে। পেটা শরীর দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই। সম্ভবত রেগুলার শরীর-চর্চা করেন এই লোক। চোখের কালো তারায় ফুটে আছে কিছুটা অনুযোগ। চোয়াল শক্ত হয়ে বসে আছে একে-অন্যের ওপরে। মোটা আঙুলগুলো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। বয়সের প্রমাণ বলতে মাথার দুই পাশে হালকা রূপালি প্রলেপ। ঝানু লোক, নির্ভরযোগ্য...শক্তিশালী। একটু বেশিই শক্তিশালী...গুন্ডা প্রকৃতির বললেও সম্ভবত ভুল হবে না।

প্রফেসর সাহেব কেন এমন একজনকে ডান হাত বানালেন?

প্রশ্নটা রাফসানকে করা হলেও, উত্তর দিল শিহান। ‘যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি–অপরাধ সংঘটিত হবার আটচল্লিশ ঘণ্টা, মানে দুই দিনের মাঝে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলে, কেন যেন সেই কেস খুব একটা সহজে সমাধা হতে চায় না। তাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু গুছিয়ে আনতে চাই।’

উত্তরটা পছন্দ হয়েছে কিনা, তা লোকটার চেহারা দেখে বোঝা গেল না। ‘তা কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে?’ জানতে চাইলেন তিনি।

উত্তর দিল না শিহান, মৃদু হেসে এড়িয়ে গেল।

শ্রাগ করলেন লোকটা, এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'ভাই বাড়িতেই আছেন। তবে ধ্যানে বসেছেন। জানেন হয়তো, তিনি বাবা পরমেশ্বরের শিষ্য। উমার খুন হবার ঘটনা জানার পরপরই গিয়েছেন বাবার কাছে। একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের।'

মেহেদি যেন কথা দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন এই পরিবারে তার অবস্থান। তার উচ্চারণ করা উমা শব্দটা কান এড়ায়নি রাফসানের, এড়ায়নি প্রফেসরকে ভাই বলে সম্বোধন করাটাও। যেন বলতে চাচ্ছেন–আমাকে আর দশজন কর্মচারী বলে ধরে নিলে ভুল করবে। আমি এই পরিবারেরই একজন সদস্য। যার খুনের তদন্ত করার জন্য তোমরা এসেছ, আমি তাকে নাম ধরে ডাকতাম।

দালানের ভেতরে প্রবেশ করল রাফসানরা। আগেই আন্দাজ করেছিল–নিচের তলাটা খাওয়া, বসার ঘর আর কাজের ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওপরেরটা বসবাসের জন্য। আসলেও তাই। মেহেদিকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল–ওপরে থাকতেন অধ্যাপক, উমা আর মেহেদি নিজে। নিচের তলায় আছে একটা রান্নাঘর, খাবার ঘর, স্থায়ী পরিচারিকা কাম রাঁধুনির জন্য একটা কামরা। দারোয়ানের জন্যও একটা আলাদা কামরা আছে। কিন্তু রাঁধুনি ও দারোয়ান স্বামী-স্ত্রী বলে, সেখানে এখন আরেকজন বুয়া থাকে, ফাই-ফরমায়েশ খাটে বাড়ির। ওহ হ্যাঁ, একেবারে কোনায় রয়েছে দুটো ঘর, একটায় কাজ করেন প্রফেসর সাহেব।

অন্যটা আকারে বেশ ছোটো, প্রীতম চক্রবর্তীর অফিসের একেবারে লাগোয়া। সেখানে প্রার্থনা, ধ্যান ইত্যাদি সারেন প্রফেসর সাহেব। উমা বাড়িতে এলে কোনো কাজ করত না। যা সারার তা অফিসেই সেরে আসত। তাই প্রায়শই দেরি হতো ওর আসতে।

পথ দেখিয়ে সোজা প্রীতম চক্রবর্তীর কাজের ঘরে ওদের নিয়ে এলেন মেহেদি। সুন্দর করে সাজানো ঘরটা। বিশাল একটা ডেস্ক একদিকের দেওয়ালের পাশে রাখা। তার এপাশে তিনটা কাঠের চেয়ার, ও পাশে একটা। ওখানে বসেই কাজ সারেন প্রফেসর সাহেব। ডেস্কের একপাশে, দেওয়াল লাগোয়া একটা ক্যাবিনেট। ফাইল-পত্র সম্ভবত ওখানেই থাকে।

ডেস্কের উলটো পাশে একটা কাউচ, সামনে কাচের টেবিল। টেবিলের দুই পাশে আছে আরও দুটো সোফা। আক্ষরিক অর্থেই অফিস বলে মনে হয়। রাফসানদেরকে কাউচে বসতে বলে দরজা লাগিয়ে দিলেন মেহেদি। সাথে-সাথে যেন নীরব, একেবারে নিস্তব্ধ এলাকায় প্রবেশ করল ওরা! বাইরে থেকে টুকটাক যে আওয়াজ আসছিল এতক্ষণ, এখন আর তা-ও নেই।

'সাউন্ড প্রুফ রুম,' সোফায় বসতে বসতে বললেন মেহেদি। 'প্রফেসর সাহেবের কাজের সুবিধার জন্য।'

মাথা নাড়ল রাফসান, বুঝতে পেরেছে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি উমার সঙ্গে একই অফিসে কাজ করি...মানে করতাম।'

'তাই নাকি?' বিস্ময় খেলে গেল মেহেদির কণ্ঠে। 'আগে তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না! প্রায়শই উমাকে আনা-নেওয়া করতাম আমি। অবশ্য যত বড়ো প্রতিষ্ঠান, তাতে না দেখাটা অস্বাভাবিক কিছু না।'

সুযোগটা লুফে নিলো রাফসান, এই লোকের কাছে উমা সম্পর্কে কিছু বাড়তি তথ্য পাওয়া যেতেই পারে। চেষ্টা করে দেখতে তো আর ক্ষতি নেই, তাই না?

'আপনি নিশ্চয়ই উমার খুব ক্লোজ ছিলেন?' শুরু করল ও।

‘ক্লোজ?’ দুঃখের হাসি হাসলেন মেহেদি। ‘তা বলতে পারেন। সেই ছোটো বেলা থেকেই দেখছি।’

‘মানে?’ না বোঝার ভান করল রাফসান।

‘আমাদেরকে পারিবারিকভাবে প্রীতম ভাইদের ম্যানেজার বললেও ভুল হবে না।’ উত্তর দিলেন তিনি। ‘তার পরদাদা ছিলেন জমিদার, আমার পরদাদা ছিলেন তার নায়েব। সেই থেকে আমরা একসঙ্গে আছি।’ আবারও মলিন হাসি দেখা গেল তার মুখে। ‘এই বংশের শেষ বাতি বলতে ছিল উমা। ওর জন্মের দিনটাতেও এই আমি ছিলাম পাশে। প্রীতম ভাই তখন কী এক কাজে আমেরিকা ছিলেন।’ গলা ধরে এলো তার।

সামলে ওঠার জন্য লোকটাকে কিছুক্ষণ সময় দিল রাফসান। তারপর জানতে চাইল, ‘কাজ পাগল মেয়ে ছিল খুব, তাই না?’

‘তা বলা যায়,’ উত্তর দিলেন ভদ্রলোক। ‘মাঝে-মাঝে তো রাত দেড়টা-দুইটার সময় জোর করে বাসায় নিয়ে আসতে হতো!’

‘বাসায় কাজ করত না একদমই?’ কণ্ঠে আশা ঢেলে জানতে চাইল শিহান। সত্যি বলতে গেলে কেসটার ব্যাপারে এখনও আঁধারেই আছে ওরা। সন্দেহের তালিকায় আছে কেবল এন.এস.এ.র নাম। উমার আবিষ্কারের ব্যাপারে জানতে পারলে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যেত সব।

‘নাহ, এই একটা দিকে শক্ত ছিল ও। প্রীতম ভাই তো কাজ ছাড়া কিছুই চেনেন না। সারাক্ষণ শুধু কাজ আর কাজ। উমা আলাদা ছিল, কাজ করার সময় মন-প্রাণ ঢেলে শুধু সেটাই করত। আবার অফিসের বাইরে এলেই হাসি-খুশি এক মেয়েতে পরিণত হতো সে। কাজের কথা আর মুখেও তুলত না।’

আশাহত হলো রাফসানরা। বাড়িতে অফিস থাকলে, ওখানে হয়তো এই আবিষ্কারের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যেত। এখানে আসার সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

'বাপ-মেয়ের মাঝে সম্পর্ক কেমন ছিল?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রাফসান। 'মানে কাজ নিয়ে আলোচনা-টালোচনা হতো নাকি?'

'তা তো অবশ্যই,' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল মেহেদির মুখে। 'উমাকে ঘরকুনোই বলা চলে। সেই ছোটোবেলা থেকেই এই অবস্থা। বান্ধবী বলতে ছিল শুধু এক নিয়তি। কিন্তু তার সঙ্গেও দূরত্ব হবার পর...' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'বাপ ছাড়া আর কোনো বন্ধু ছিল না ওর। কাজের ব্যাপারে মাঝে-মধ্যেই দুইজন তর্কে মেতে উঠত।'

আশার পালে হাওয়া লাগিয়ে দিল কথাগুলো, হয়তো প্রফেসর সাহেবের কাছ থেকে কিছু জানা যাবে।

আচমকা খুলে গেল দেওয়ালের একটা অংশ; ওখানে যে একটা দরজা আছে, না বলে দিলে কেউ টেরই পাবে না। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন পঞ্চান্ন-ষাট বছর বয়সি একজন মানুষ। ইনিই প্রীতম চক্রবর্তী, পরিচয় করিয়ে দিতে হলো না রাফসানকে। বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে আগে থেকেই চেনে ও, পত্রিকায় ছবি দেখেছে বহুবার। শিহানকেও চেনাতে হলো না; কোথায় আছে আর কার অপেক্ষায় আছে–এই দুটো ব্যাপার থেকেই আঁচ করে ফেলেছে লোকটার পরিচয়।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল সবাই, প্রীতম চক্রবর্তী বসার ইঙ্গিত দিলেন।

রাফসানরা বসলেও, বসলেন না মেহেদি। 'আপনারা কথা বলুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

নিজেদের পরিচয় দিল রাফসানরা। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। একরাতে যেন কয়েক বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে লোকটার। চোখের নিচে কালি পড়েছে, লালচে চোখ ফুলে আছে। সম্ভবত সারা রাত এক করেননি দুই চোখের পাতা। বুড়ো বয়সে একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর খবর পেলে কেউই ঠিক থাকতে পারে না। তবে সম্ভবত ধাক্কাটা কিছুটা হলেও সামলে নিতে পেরেছেন। সুস্থির হয়েই বসে আছেন ওদের সামনে।

'বলুন, আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুললেন তিনি।

'এমন একটা সময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার।' শুরু করল রাফসান। 'কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে না করেও পারছি না।' এই বলে এখন পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সব বলল সে। 'তাই স্যার, এখন আমাদের জন্য উমার গবেষণার ব্যাপারটা জানা একেবারে জরুরি হয়ে পড়েছে। আপনি যদি কিছু জানাতে পারেন...'

'তুমি যা জানো, আমি তারচেয়ে খুব বেশি কিছু জানি না।' শুরু করলেন প্রীতম। 'প্রায় এক বছর আগের কথা, একদিন আচমকা আমার সামনে এসে বসে উমা। ওই তো, ওই চেয়ারটায়,' বলে ডেস্কের তিন চেয়ারের একটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। 'জানতে চায় অনকোলাইটিক ভাইরো থেরাপির ব্যাপারে। বেশ কিছু কথা বলি ওকে আমি। আসলে এসব আগেই জানত ও, সম্ভবত শুধু ঝালিয়ে নিতে চাইছিল।'

'কিছু মনে না করলে, আমাদেরকেও বলবেন একটু?' পাশ থেকে জানতে চাইল শিহান।

'ক্যান্সার কাকে বলে, জানো নিশ্চয়ই?' যুবকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, সম্ভবত পছন্দের বিষয়ে কথা বলতে পেরে কিছুটা হালকা বোধ করছেন। শিহান মাথা নেড়ে সায় জানাতেই আবার খেই ধরলেন। 'দেহের সাধারণ কোষ যখন অনিয়ন্ত্রিত হারে বাড়তে শুরু করে, তখন আমরা তাকে বলি ক্যান্সার। এখানে প্রশ্ন দুটো: এক, কেন কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিত হারে বাড়তে শুরু করে? আর দুই, কেন সেগুলো অনিয়ন্ত্রিত হারে বাড়তে পারে?

কেন বাড়তে শুরু করে, তার নির্দিষ্ট একটা কারণ নেই। একেক ক্যান্সারের জন্য একেক রকম হতে পারে কারণ। যেমন ধুমপান করলে বাড়ে ফুসফুসের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি। আবার মদ্যপানে বাড়ে যকৃতের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন সেগুলো বাড়তে পারে? ওগুলো পারলে, অন্য কোষ বাড়তে পারবে না কেন? এ ব্যাপারেও নানা তত্ত্ব আছে। তবে একটা জনপ্রিয় তত্ত্বের কথা বলি তোমাকে, আমিও এই তত্ত্বের সমর্থক।'

লম্বা করে শ্বাস টানলেন তিনি। তারপর আবার শুরু করলেন, 'মানব দেহ প্রায় কয়েক ট্রিলিয়ন কোষ নিয়ে তৈরি। সর্বোচ্চ সংখ্যাটা সাঁইত্রিশ ট্রিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে! যাই হোক, এর মাঝে অনেক কোষই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের। মানব দেহের কোষগুলোর মাঝে রয়েছে নিউক্লিয়াস নামের একটি জিনিস। সেটার ভেতরে থাকে ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমগুলোর একেবারে শেষ মাথায় আছে টেলোমিয়ার।'

হাঁ হয়ে থাকা শিহানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন প্রীতম। 'মনে রাখতে কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, আপাতত শুধু টেলোমিয়ারের নামটা মনে রাখো।

‘এই টেলোমিয়ার দারুণ কাজে আসে। জুতো পরেছ দেখি, ফিতাগুলোর মাথায় প্লাস্টিক দেওয়া। কেন, বলো তো?’

‘যাতে ভুলক্রমে ফিতা ফাঁকের ভেতরে ঢুকে না যায়।’ উত্তর দিতে পেরে নিজের ওপরেই সন্তুষ্ট মনে হলো শিহানকে। ‘ওটা না থাকলে ফিতা প্রায়শই ফাঁক গলে ভেতরের দিকে চলে যেত।’

‘ঠিক,’ মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। ‘এই টেলোমিয়ারের কাজও অনেকটা সেরকম। ওগুলো না থাকলে, কোনো প্রাণীরই ক্রোমোজোম ঠিক থাকত না। আরও কাজ আছে ওগুলোর। আমাদের দেহে কোষ বিভাজন হয়, সেটা তো পড়েছ?’ যুবকের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই উত্তর দিয়ে দিলেন। ‘পড়েছ নিশ্চয়ই। কোষ বিভাজন হয় বলেই একদিনের ছোট্ট বাচ্চা আশিকুর রহমান, আজ এমন জোয়ান দেহের অধিকারী হয়েছে। নইলে সেই ছোট্টটিই থাকতে হতো তাকে। কথা হচ্ছে, যত বার কোষ বিভাজন হয়, ততবার একটু-একটু করে কমতে শুরু করে এই টেলোমিয়ার। যখন একেবারে ছোটো হয়ে যায়, তখন আর কোষ বিভাজন হতে পারে না। তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কোষ, মারা যেতে থাকে আস্তে-আস্তে।’ এক নাগাড়ে অনেকগুলো কথা বলে একটু বিরতি নিলেন তিনি।

‘তারমানে,’ এই সুযোগে বলে উঠল শিহান। ‘ক্যান্সার কোষ যেগুলো, সেগুলোতে এই টেলোমিয়ার ছোটো হয় না? আস্তই থাকে?’

রাফসান আর প্রীতম, দুজনেই কিছুটা চমকে উঠে যুবকের দিকে তাকাল। মাথা পরিষ্কার ছেলেটার, তা জানে রাফসান। কিন্তু এতটা পরিষ্কার, তা আন্দাজ করতে পারেনি।

‘হ্যাঁ,’ আবারও সায় জানালেন প্রখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট। ‘কোষের ভেতরে এক ধরনের এনজাইম, মানে রস থাকে। যেটা টেলোমিয়ারকে ছোটো হতে দেয় না, নতুন করে আবার কমে আসা

অংশটুকু বানিয়ে দেয়। সাধারণত সব কোষেই থাকে ওটা। কিন্তু সাধারণ কোষে বিভাজন এমনভাবে হয় যে টেলোমারেজ, মানে ওই রসটা কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ক্যান্সার কোষে তৈরি হয় নতুন টেলোমারেজ। বলতে পারো, এই টেলোমারেজটাই ক্যান্সার কোষ আর সাধারণ কোষের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল শিহান। 'এর সঙ্গে ভাইরাসের কী সম্পর্ক?'

'নতুন কিছু আবিষ্কারে দেখা গিয়েছে,' প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন ক্লান্তি নেই বিজ্ঞানীর। 'এমন কিছু ভাইরাস আছে, যাদেরকে–'

'মনে পড়েছে,' আগ্রহের আতিশয্যে বয়স্ক লোকটাকে বাধা দিল শিহান। 'যাদেরকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়।'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী।

'উমার আবিষ্কারটা কি এই সংক্রান্তই ছিল?' আচমকা জানতে চাইল রাফসান।

'আমি তেমনটাই জানি,' মেয়ের কথা মনে পড়ায় আবারও মলিন হয়ে গেল তার মুখ। 'অন্তত আমাকে তেমনটাই বলেছিল। তবে পরে কী অগ্রগতি হয়েছে, তা আমি নিজেও জানি না। বলেনি আমাকে।'

'ক্যান্সারের প্রতি তার এই আগ্রহের কারণ?' রাফসানের পরবর্তী প্রশ্ন। 'ও তো মাইক্রোবায়োলজিস্ট ছিল। বলছি না যে ক্যান্সারের প্রতি আগ্রহ থাকার আলাদা কারণ থাকতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে এভাবে একা এগোনোটা একটু অদ্ভুত। সঙ্গে ডাক্তার বা নিদেনপক্ষে তো আপনার থাকা উচিত ছিল! আর কাউকে কিছু জানিয়েছিল কিনা, বলতে পারেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রীতম। 'আমার স্ত্রী ব্রেস্ট ক্যান্সারে মারা যান। হয়তো সেজন্যই। আর তাছাড়া–' বলেই থেমে গেলেন তিনি।

ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল শিহানের। জীবনের লক্ষ্য নামে প্রায়শই রচনা লিখতে হতো ওকে। লক্ষ্য হিসেবে ডাক্তার হওয়াকে উল্লেখ করত। আর কারণ হিসেবে দাদা-দাদি, বা নানা-নানির বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হওয়াকে। তাই উমার এই আগ্রহের কারণ ধরতে পারল সহজেই।

রাফসান কিন্তু হাল ছাড়েনি। 'আর তাছাড়া?'

'উমা নিজেও ক্যান্সারের রোগী ছিল,' বোমা ফাটালেন যেন প্রবীণ বিজ্ঞানী। 'মায়ের মতোই, ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী। মস্তিষ্ক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল সেই রোগ।'

'মানে?' অবাক হয়ে গেল শিহান। যে রোগীর মস্তিষ্ক পর্যন্ত ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে, তার যে বাঁচার কথা না, তা সে-ও জানে। 'মিস উমা মৃত্যু-পথযাত্রী ছিলেন?'

'না, না।' হাত নেড়ে বলে উঠলেন প্রীতম। 'সুস্থ হয়ে গিয়েছিল ও। বাবা পরমেশ্বর এবং মা মনসা আমাকে আমার মেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।'

এবার রাফসানের হাঁ করে তাকিয়ে থাকার পালা।

বলে কী লোকটা!

*

অর্জুনের জাহাজটা ওয়াজেথের জাহাজ থেকে কিছুটা সামনে। তবে রাত নামলে কাছাকাছিই নোঙর করা থাকে দুটো। কাছাকাছি হলেও, একদম লাগোয়া না কিন্তু। রাতে যদি হঠাৎ ঝড় ওঠে, তাহলে দেখা যাবে লাগোয়া জাহাজ দুটো পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে নিজেদের দফা-রফা করে ফেলেছে!

তাই সবসময় কিছুটা দূরত্বে নোঙর ফেলে জাহাজ দুটো। তবে খুব একটা দূরেও নয়। এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে যেতে বেশি হলে মিনিট পাঁচেক লাগবে নৌকায়!

রাতের প্রার্থনায় মন দিয়েছিল যুবক। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মনে-প্রাণে কামনা করছিল এবারের ভ্রমণের সাফল্য। জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করছে এই সাফল্যের ওপর। নিজের একটা বাড়ি, সেই সাথে একটা বউ। এখন দরকার শুধু একটু গুছিয়ে নিয়ে ঘরে তোলা।

কতক্ষণ ধরে মাথা ঠেকিয়ে আছে, জানে না ও। আচমকা শোরগোলটা শুরু না হলে হয়তো আরও অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখত।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো ওয়াজেথ। প্রধান সহকারীও ডেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'চিৎকার কেন?'

হাত দিয়ে সামনের জাহাজ দেখাল সহকারী। 'ওই জাহাজে নাকি সাপ পড়েছে!'

'সাপ!' অবাক হয়ে গেল ওয়াজেথ। 'সাপ এই মাঝ দরিয়ায় আসবে কী করে? কাউকে কাটে-টাটেনি তো?'

'শুনতে তো পাচ্ছি,' চেহারা কালো করে ফেলল সহকারী। 'ক্যাপ্টেনকেই সাপে কেটেছে!'

আর কেউ না জানলেও, চাঁদ সওদাগরের কাচারিতে সেদিন কী হয়েছিল তা জানে ওয়াজেথ আর গৌতম। তাই ভয় পেয়ে গেল

ওয়াজেথ। এখানে এখনও সর্প দেবীর পূজার প্রচলন চালু না হলেও, মিশরে তা জোরেশোরেই চালু আছে। তাই দেবীর ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও। অনেকটা দৌড়েই যেন সে ফিরে এলো নিজের ঘরে। দেবী মূর্তিটাকে থলেতে পুরে দেখে নিলো গলায় মালাগুলোর অবস্থান। তারপর নিজেই একটা নৌকা নামিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিল প্রধান জাহাজের দিকে।

গিয়ে দেখে, ওর সহকারী ভুল কিছু বলেনি। আসলেই সাপে কেটেছে অর্জুনকে! গৌতম বসে আছে বন্ধুর শিয়রে। ও যেতেই মুখ তুলে তাকাল।

চোখের ইশারায় বৈদ্যকে বাইরে আসতে বলল ওয়াজেথ। দুজনে একা হলে জানতে চাইল, ‘কী অবস্থা?’

‘শুশ্রুষা সংহিতার আগড় তন্ত্র মতে, এই সাপটা দস্তক। চারটা বিষ দাঁতের চিহ্ন আর মুখের লালা লেগে আছে ক্ষতের চারপাশে। আমার আসতে আসতে প্রায় পনেরো পল লেগে গিয়েছে। তারমানে...’

‘সহজ ভাষায় বলুন তো।’ চেষ্টা করেও কণ্ঠ থেকে বিরক্তি লুকাতে পারল না ওয়াজেথ।

‘দস্তক মানে সবচেয়ে খারাপ ধরনের সাপের কামড়। আর পাঁচ পলের মাঝে ওষুধ না খাওয়াতে পারলে রোগীকে বাঁচানো মুশকিল!

‘কী বলছেন এসব!’ আঁতকে উঠল ওয়াজেথ।

‘হ্যাঁ, তবুও অবস্থা এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে।’ যোগ করল বৈদ্য। ‘শ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে।’

‘তাহলে আশা আছে বলছেন?’

‘যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আঁশ।’ চিন্তিত কণ্ঠে বলল গৌতম। ‘চল, ভেতরে যাই। এই অবস্থায় রোগীর পাশে থাকা খুব জরুরি।’

মেনে নিলো ওয়াজেথ, রোগীর কাছ থেকে বৈদ্যকে দূরে সরিয়ে রাখা ভালো কথা না। ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল ও, গৌতম সরাসরি অর্জুনের পাশে গিয়ে বসল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল নীরবতায়। গৌতম বলেছিল বটে যে অর্জুনের শ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু ওয়াজেথ ঘরে ঢোকার পর থেকেই দেখতে পাচ্ছে, কেন যেন টেনে-টেনে শ্বাস নিচ্ছে সে! সেই সাথে চেহারার আভাও যেন আস্তে-আস্তে কমে আসছে। কী হচ্ছে, কী হবে, কিছুই বুঝতে পারছে না ও। মাঝ নদীতে জাহাজের মাঝে সাপ!

হঠাৎ পায়ের কাছে ঠান্ডা, কর্কশ একটা স্পর্শ অনুভব করল ও। প্রথমে তো পানিতে ভেজা কাপড় মনে করে ঝাড়া দিয়ে সরিয়েই দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর অগ্রাহ্য করতে পারল না। পায়ের দিকে তাকাল।

কেবিনের ভেতর কেবল দুইটা মোম জ্বলছে। আবছা আলোতে অপার্থিব মনে হচ্ছে সব কিছু। কিন্তু মানুষের মন, সব সময় নিজেকে রক্ষা করার চিন্তায় নিয়োজিত থাকে। তাই এই আবছা আলোতেও সাপটাকে ঠিক দেখতে পারল ছেলেটা।

চিৎকার করে আবার ঝটকা মারতে যাবে, এমন সময় সামলে নিলো নিজেকে। প্রথম বার যখন ঝাড়া দিয়েছিল, তখনই সাপের ছোবল খাবার কথা ছিল ওর। যখন ভাগ্য দেবী একবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তখন আবারও সেই একই কাজ করে দেবীকে রুষ্ট করার কোনো কারণ হয় না। এদিকে সাপটা কিন্তু বসে নেই! অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ওটা যেন ওর পা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে!

গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেল ও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা যেন পাগলা ঘোড়াকেও হার মানাবে। আপ্রাণ

চেষ্টার ফলেই কিনা, গৌতম ফিরে তাকাল ওর দিকে। নজর সরিয়েও নিলো এক সেকেন্ড পর। কিন্তু মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াজেথের অস্বাভাবিক ভঙ্গি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল বৈদ্য। আবার ওর দিকে তাকাল সাথে-সাথেই, সাপটাকে দেখতেও ভুল হলো না।

কালক্ষেপণ না করে একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো গৌতম, অর্জুনের প্রধান সহকারীকেও টেনে দেখিয়েছে সাপটা। সহকারী হাতে তুলে নিয়েছে একটা তলোয়ার। দুইজনের মিলিত আক্রমণের সামনে হার মানতে বাধ্য হলো বিষাক্ত সাপ। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, কাঠের মেঝেতে মৃতদেহ পড়ে আছে ওটার। ধর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে মাথাটা।

ধুপ করে বসে পড়ল ওয়াজেথ, তবে অবশ্যই সাপটার লাশ থেকে দূরে। মারা যাবার পরও যে সাপের চোয়াল হাঁ করা থাকে, তা জানে ও। বেখেয়ালে ওর মাঝে কিছু পড়ে গেলেই...ব্যস। খট্ করে আটকে যাবে চোয়াল, মরে গিয়েও মারবে সাপ।

তবে সহকারী বেচারা তা জানে না। গাধাটা পায়ের আঙুল নিয়ে নাড়তে গেল কাটা মাথাটা। সাথে-সাথে সেটা কামড় বসিয়ে দিল আঙুলে। উফ করে উঠেই ঢলে পড়ল বেচারা। ওয়াজেথ এগিয়ে গেল লোকটার দিকে, এগিয়ে এলো গৌতমও।

‘তোমার কপাল ভালো, ওষুধ প্রস্তুত ছিল। আমিও ছিলাম ধারে-কাছে,’ বলল গৌতম। আচমকা শব্দ করে শ্বাস টানল অর্জুন। তাই ওষুধটা ওয়াজেথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘তুমি খাওয়াও। আমি অর্জুনকে দেখি।’

মাথা নেড়ে ওয়াজেথ জানাল, বুঝতে পেরেছে।

ওষুধটুকু একটা আলাদা পাত্রে ঢালা আছে। সেটা মুখে তুলে দিল সহকারীর, পবন নাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, একই সাপে কেটেছে অর্জুন

এবং পবনকে, একই ওষুধ খাচ্ছে, অথচ তরলটুকু পেটে যাওয়া মাত্র আরও বেড়ে গেল পবনের শ্বাস কষ্ট! কথা বলার চেষ্টা করছে লোকটা, হয়তো কিছু জানাতে চাইছে। পারল না, মুখের কথা বুকে নিয়েই মারা গেল সে। একদম নিমেষে!

'গৌতম,' অস্ফুটস্বরে ডাকল ওয়াজেথ। 'পবন...'

ওর কণ্ঠে অদ্ভুত সুরটা শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গৌতম। পবনের মাথা এক দিকে হেলে আছে দেখা বুঝে গেল যা বোঝার। তারপরও কাছে এসে বলল, 'তুমি গিয়ে অর্জুনের ওষুধটা একটু মুখে তুলে দাও। আমি একবার দেখেই আসছি।'

বিহ্বল ওয়াজেথ আদেশ পালনে লেগে পড়ল। পবনের সাথে অনেকবার ভ্রমণ করেছে ও। বলতে গেলে লোকটা ওর পরিবারের মতোই। এমনকী প্রথম-প্রথম যখন জাহাজের ভার এসে চাপে ওর কাঁধে, তখন অর্জুনের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে লোকটাকে নিজের সহকারী বানিয়েছিল ও।

ওয়াজেথ ভিনদেশি। অর্জুনের সহকারীর সব যোগ্যতাই আছে ক্যাপ্টেন হবার। তাই নিজেকে অবহেলিত আর বঞ্চিত মনে করার সব কারণই ছিল পবনের। কিন্তু লোকটা তা করেনি। বরঞ্চ সাহায্য করেছিল প্রাণ খুলে। বলা যায়, পবনের দক্ষতার কারণেই এত অল্প সময়ে নিজের একটা দল গড়ে নিতে পেরেছিল ওয়াজেথ।

সেই পবনের এহেন মৃত্যু দেখে দারুণ নাড়া খেয়েছে ও।

এদিকে অর্জুনকে নিয়েও পড়ে গিয়েছে চিন্তায়। যেভাবে পবন মারা গেল, তাতে বোঝা যায় যে সাপটা খুব বিষধর ছিল। আবার আরেকটা ভাবনাও খেলছে ওর মাথায়, সাপটা এত মানুষের ভিড়ে আবার ফিরেই বা এলো কেন? আর আগে একজনকে কেটেছে, তাই হিসাব

অনুসারে সাপের বিষ তো তেমন বাকি থাকার কথা না। তাহলে পবন মারাই বা গেল কেন?

অর্জুনের মুখ মুছছে আর এসব ভাবছে ওয়াজেথ। মোমের আলোয় একদম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ক্যাপ্টেনের মুখ। থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে লোকটা। পিঠে ছোবল খেয়েছে। পায়ে বা হাতে হলে নাহয় তা-ও বাঁধন দেওয়া যেত, ভাবল ও। যদিও জানে না, এতে আসলে লাভের চাইতে ক্ষতিই হয় বেশি। কিন্তু তখনকার সময়ে বিষ আটকে রাখার একমাত্র উপায় মনে করা হতো এই বাঁধনকে।

যাই হোক, ওয়াজেথের কেন যেন মনে হচ্ছে, ও এসে বসার পর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে অর্জুনের। শ্বাসের গতি কমে এসেছে, দেহের তাপও কমে আসছে প্রতি মুহূর্তে। বুঝে গেল ওয়াজেথ, বাঁচবে না ওর এককালের জীবন রক্ষাকারী।

হলোও তাই, মিনিট পাঁচেক যাবার আগেই প্রাণ হারাল অর্জুন।

মৃত ক্যাপ্টেনের লাশের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল গৌতম আর ওয়াজেথ। 'দেবী মনসা তাহলে এত দূরে এসেও তার প্রতিশোধ নিয়েই নিলেন।' কেন বা কী ভেবে বলল ওয়াজেথ, তা জানে না। কিন্তু ওর কথা শুনে কেঁপে উঠল গৌতম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াজেথ। 'যাই, জাহাজে ফিরে যাই। ওদেরকে সব জানাতে হবে।' বলে বেরিয়ে গেল জাহাজ থেকে। আসলে অন্য কারও সামনে চোখের পানি বের হোক, তা চাইছে না। জাহাজের সাথে বেঁধে রাখা নৌকায় উঠে রওনা দিল নিজের জাহাজের দিকে।

*

ওয়াজেথকে ফিরে যেতে দেখে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গৌতম। এতক্ষণ বড়ো দুশ্চিন্তায় কাটছিল ওর। এবার একটু দম নিতে পারল। কাঠের ওপর পড়ে থাকা সাপটার দিকে তাকাল একবার।

দুধ-কলা দিয়ে পোষা সাপটার জন্য মায়াই হচ্ছে ওর!

ভ্রমণের জন্য রওনা হবার আগের রাতের কথা, ওর বাড়িতে এসেছিল এক পুরোহিত আর পরিচিত আরেক বৈদ্য। এই পুরোহিতই যে সেদিন সকালে গিয়ে চাঁদ সওদাগরকে সাবধান করে এসেছে তা অবশ্য তখনও গৌতম জানত না। তবে বৈদ্যকে খুব ভালো করেই চিনত। ধন্বন্তরি কশ্যপ নামেই তাকে ডাকে সবাই। সাপে-কাটা মানুষকেও তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন বলে জনশ্রুতি আছে।

সেই কশ্যপ বৈদ্যই ওর সামনে তুলে ধরেছিলেন জ্ঞানের এক নতুন দুয়ার। জানালেন, বিষে বিষক্ষয় বাক্যটা এমনি এমনি আসেনি। আসলেই সাপের বিষের মাঝে রয়েছে এমন এক গুণ। শুধু তাই নয়, আরও অনেক ধরনের রোগ সারাতেও লাগে এই বিষ। ওকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আগড় শাস্ত্রে উল্লেখিত দিব্য-সাপদের কথা। এই সাপদের সম্মান করা হয়, এদেরকে দেওয়া হয় আলাদা মর্যাদা। কেন? কারণ এরাই আসলে মনসার নিজস্ব সাপ। এদের কাছ থেকেই পাওয়া যায় সাপে কামড়ের ওষুধ।

এক রাতই যথেষ্ট ছিল গৌতমের জন্য মনসার দেবীত্ব আর কশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য।

অবশ্য বাড়তি হিসেবে সোনা-দানার থলে আর বিরল সেই জ্ঞান অর্জনের প্রতিজ্ঞাটাও কম ছিল না।

সাপটাকেও দিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে রাতে। কীভাবে তাকে শান্ত রাখতে হবে, কীভাবে সামলাতে হবে, এসবও শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওরা। সাপুড়ে হবার তো আর দরকার নেই গৌতমের, তাই যতটুকু

না শিখলেই নয়, ততটুকুই শিখে নিয়েছে। আর এখন সুযোগ বুঝে ছেড়ে দিয়েছে অর্জুনের ঘরে।

তবে স্বীকার করতেই হয়, পরিস্থিতি দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল ও। ইচ্ছা করেই দেরি করেছিল আসতে, কিন্তু শক্ত-সমর্থ অর্জুন যেন আরেকটু হলেই হার মানিয়ে বসত সাপের বিষ। বলতে গেলে জান হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল গৌতম।

তারপর ওয়াজেথ এলো, আর আচমকা সব ঠিক হয়ে গেল!

আসলে সবই দেবীর কৃপা। ওয়াজেথও যে এক সর্প দেবীর পূজা করে, তা জানে ও। হয়তো সেকারণেই...

যাক সে কথা। এখন আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এক মাস পানিতে ভেসেছে। অর্জুনের মৃত্যুর পর আর নিশ্চয়ই সামনে এগোতে হবে না? ফেরার পথ ধরার আদেশ দেবে ওয়াজেথ।

এক টুকরা মুচকি হাসি মুখে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল গৌতমের। চকিতে চারপাশে দেখে নিলো, কেউ আবার দেখল না তো? বন্ধুর মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ পরেই ওকে হাসতে দেখে কেউ সন্দিহান হলেও হতে পারে।

কিন্তু না দেখেনি কেউ। কেবিনে আছে কেবল ও, পবনের পর যে লোকটার অবস্থান, সে আর দুটো লাশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করল গৌতম। কিছু একটা বলেছে কী বলেনি, এমন সময় ওর কণ্ঠ ছাপিয়ে গর্জন করে উঠল বজ্র।

সেই সাথে কেঁপে উঠল জাহাজ।

আচমকা ঝড় শুরু হয়েছে!

*

নৌকার মুখ ঘুরিয়েছে কেবল ওয়াজেথ, এমন সময় ওর মনে হলো কোথাও কোনো ঝামেলা আছে।

প্রায় মিনিট বিশেক প্রধান জাহাজে কাটিয়ে এসেছে ও। সময়টুকু এতটাই ব্যস্ত কেটেছে যে আকাশের দিকে খেয়ালই করেনি। এরইমাঝে কখন যে চুপি-চুপি এসে হাজির হয়েছে মেঘ, টের পায়নি তা-ও। অবশ্য রাতের আকাশে টের পাওয়াটা সম্ভবও না। তবে বাতাসের চাপ যে পড়ে গিয়েছে তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছে।

ঝড়ের পূর্বাভাস।

নৌকার গতি বাড়িয়ে দিল ও।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ওর গতি বাড়াবার সাথে-সাথে কান ফাটানো শব্দে বজ্রপাত হলো ধারে কাছে কোথাও, সেই রেশ কাটতে-না-কাটতেই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। এমন প্রবল সেই ঝড় যে এক হাত সামনের দৃশ্য দেখাও মুশকিল। চাঁদটাকে যেন গিলে খেয়েছে মেঘ। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আন্দাজের ওপরেই নৌকা চালাতে শুরু করল ওয়াজেথ। যে ঝড় এসেছে তাতে জলদি জাহাজে পৌঁছাতে না পারলে বিপদ হয়ে যাবে।

প্রায় মিনিট দশেক নৌকা চালাবার পর ওয়াজেথের মনে হলো, বিশাল বিপদে পড়ে গিয়েছে ও। এতক্ষণ তো লাগার কথা না। একটু সামনেই ছিল জাহাজ। মিনিট পাঁচেক দাঁড় বাইলেই পৌঁছে যাবার কথা!

ঠিক সেই সময় আরেকবার বজ্রপাত আকাশকে দুভাগে চিরে দিয়ে ছুটে গেল ত্রিশূলের আকৃতিতে।

এক ঝলক আলোতে চারপাশ পরিষ্কার দেখতে পেল ওয়াজেথ, আর বুঝতে পারল যে আসলে বিপদে পড়েছে!

দুই জাহাজের কোনোটারই চিহ্ন নেই আশপাশে!

*

অন্ধকার যেন গিলে খেয়েছে ওয়াজেথ আর ওর ছোট্ট নৌকাটাকে।

খরস্রোতা নদীর ওপরে মাঝে-মাঝে বাঁশের সাঁকো থাকে। পাগলকে নিষেধ করলে সে সেটাকে যেভাবে দোলায়, তারচেয়েও তীব্রভাবে দুলছে নৌকাটা। চাঁদ এখনও মেঘের পেটে, যেন কোনো ডাইনি বুড়ির নির্দেশে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। থেকে থেকে এক ঝলকের জন্য অবশ্য বেরিয়ে আসছে সে। রূপালি আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত করে আবারও হারিয়ে যাচ্ছে কালো পর্দার আড়ালে। এমন লাজুক সম্ভবত নব বিবাহিতাও হয় না!

ওই এক পলকের জন্য যে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে যুবক, তাতে ভয় আরও বেড়ে যাচ্ছে তার। অনেক দিন পর, ইংরেজি ভাষায় এক প্রবাদ চালু হবে– Ignorance is peace, অজ্ঞানতাই শান্তি। সম্ভবত ওর মতো অবস্থায় পড়া কোনো নাবিক ফিরে গিয়ে চালু করেছিল প্রবাদটা। অবশ্য ওয়াজেথের লোকালয়ে ফেরার সুযোগ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। রূপালি আলোয় মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে আসা পানির দেওয়াল। বৃষ্টির গর্জনে কান

পাতা দায়। তারপরও শোনা যাচ্ছে বাতাসের হা-হুতাশ। যেন বাতাসও বুঝতে পারছে ওয়াজেথের ভবিষ্যৎ!

ঠেউয়ের মাথায় এই চড়ে বসছে নৌকাটা, আবার এই আছড়ে পড়ছে পানিতে। তাল সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বেচারাকে। এত শক্ত করে নৌকার খোল আঁকড়ে ধরে আছে ওয়াজেথ যে সাদা হয়ে আছে হাতের গাঁটগুলো। স্থলভাগের কোনো লক্ষণই নজরে পড়ছে না।

অথৈ জলধারার মাঝে যেন একটা কাঠের ছিপি ভেসে বেরাচ্ছে, অন্তত দূর থেকে দেখলে তেমনটাই মনে হবে ছোট্ট নৌকাটাকে। সমস্যা হলো, কাছে বা দূরে, কোনো দিক থেকেই দেখার মতো কেউ নেই! ভিজে একসা হয়ে আছে ওয়াজেথের পরনের পোশাক। বৃষ্টি এই ঝিরঝির করে পড়ছে, আবার এই মুশলধারে। যেন নিজেও বুঝতে পারছে না, কীভাবে আছড়ে পড়বে ওয়াজেথের ওপরে! সেই সঙ্গে বাড়তি সমস্যা তৈরি করেছে তীব্র বাতাস।

এ যে এক অলৌকিক কাণ্ড, তাতে একদম সন্দেহ নেই ওয়াজেথের। পরিষ্কার আকাশ ছিল সকালে, মনে আছে ওর। সেখান থেকে আচমকা এমন তীব্র ঝড়! তার ওপর নিজের জাহাজ থেকে প্রায় হাতে ছোঁয়া দূরত্বে ছিল নৌকাটা। অথচ এখন? তাদের খোঁজ পর্যন্ত নেই!

মনসা দেবীর কাজ হবে, মনে-মনে ভাবল ওয়াজেথ। নিশ্চয়ই কেবল অর্জুনের প্রাণ নিয়ে সন্তুষ্ট নন তিনি। চান তার প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড়ো ভরসার স্থলকে বিনষ্ট করার সাথে-সাথে তার সব চিহ্নও মুছে ফেলবেন! অন্তত লোকমুখে এমনটাই শুনেছে। ভক্তদের জন্য যতটা আন্তরিক দেবী, শত্রুদের প্রতিটা ততটাই নৃশংস।

তাহলে অর্জুনের ডান হাত, এই ওকে কেন রেহাই দিলেন তিনি? প্রশ্নটা মনে আসার সাথে-সাথে উত্তরটাও পেয়ে গেল যেন। পুরো

দলের মাঝে একমাত্র সে-ই সর্পদেবীর উপাসনা করে। হোক না সে অন্য এক দেশের! আবার কে বলতে পারে? একই দেবীর অন্য রূপ হয়তো ওয়াজেথের উপাস্য। যাই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে এ কারণেই ঝড়ের মুখে এখনও টিকে আছে ও।

হাত দিয়ে থলেটা স্পর্শ করল যুবক। মূর্তিটার কঠিন দেহ যেন ওর মনে একটু হলেও বল এনে দিল। আছে ওটা জায়গামতোই। ভাবল, কোনো-না-কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে দিবেন দেবী এ যাত্রায়।

বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ পেল না ওয়াজেথ, কড়-কড় আওয়াজটা ওর নজর ফিরিয়ে আনল নৌকার দিকে। কই মাছের মতো তিড়িং-বিড়িং করে চলতে থাকা নৌকার সামনের দিকের কাঠ মনে হলো বেঁকে গিয়েছে। আবার সোজাও হয়ে গেল পরক্ষণেই!

স্বস্তির দম ফেলবে এমন সময় বজ্রপাতের আলোয় সামনের দৃশ্য দেখে পিলে চমকে গেল ওয়াজেথের। সামনেই একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে! এতক্ষণ দুই হাত দিয়ে নৌকার খোল ধরে ছিল ও, চমকে উঠে হাতে তুলে নিলো দাঁড়। প্রাণপণে বাইতে শুরু করল উলটো দিকে। কিন্তু না, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ মনে-মনে দেবীর ওপর ভরসা আনার চেষ্টা করছিল, ততক্ষণ দাঁড় বাইলেও হয়তো রক্ষা পেয়ে যেত, কিন্তু এখন আর তা হবার নয়!

তারপরও, হাল তো আর ছাড়া যায় না। আপ্রাণ শক্তিতে দাঁড় বাইতে লাগল ওয়াজেথ। মিশরীয় যুবকের শক্ত-পোক্ত দেহে শক্তির অভাব নেই। পাক্কা তিন মিনিট টিকতে পারল সে। এক শ' আশি সেকেন্ড সময় হিসেবে খুব বেশি মনে না হলেও, উন্মত্ত প্রকৃতিকে এতক্ষণ বশে রাখা মুখের কথা নয়! কিন্তু মানুষ তো, যন্ত্র তো আর না। তাই আস্তে-আস্তে কমতে শুরু করল দাঁড় বাইবার জোর। এক শ' আশিতম সেকেন্ডটায় এসে, হাল ছেড়ে দিল ও।

ঘূর্ণির ঠিক মাঝখানে রয়েছে গর্ত। তীব্র বেগে নৌকাটা ঘুরতে-ঘুরতে ওখানে এসে থেমে গেল। যেন আচমকা প্রাণ সঞ্চার হয়েছে কাঠের ভেতরে, বুঝতে পারছে যে ওখানে গেলে আর আস্ত থাকতে হবে না।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল নৌকাটা।

তারপর টুপ করে পড়ে গেল ঘূর্ণির গর্তে!

আট

অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছে ঘরের ভেতর।

'আ–' কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করল রাফসান। 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না...'

'বিজ্ঞানীর মুখে সাধু-বাবার প্রশংসা শুনে হকচকিয়ে গিয়েছ তো?' স্মিত হেসে জানতে চাইলেন প্রীতম। 'তোমাকে দোষ দেই না, অনেকেই হয়। পরিস্থিতি...বুঝলে? পরিস্থিতিই মানুষকে আস্তিক বানায়। আবার পরিস্থিতিই বানায় নাস্তিক। নব্য নাস্তিকদের কয়জন আর জেনে-বুঝে নাস্তিক বলো? সবাই তো গুরু ধরা। যাই হোক, আমিও প্রথমে এইসব বাবাদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু নিজের চোখের সামনে দেখার পরও অবিশ্বাস করি কী করে?'

চুপ করে রইল রাফসান, কিছু বলে বিরাগভাজন হতে চায় না। ধর্ম-কর্ম-বিধাতায় ওর বিশ্বাস আছে, যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু বর্তমানে অলৌকিক কাণ্ড সমাধা করার মতো পুণ্যাত্মা কেউ আছে বলে ও বিশ্বাস করে না। অবশ্য সে কথা বলে প্রফেসরকে রাগিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না।

'আস্তে-আস্তে আমার মেয়ের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছিল ক্যান্সার। স্তন থেকে শুরু হয়ে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।' বললেন প্রীতম। 'ডাক্তাররা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, এক বন্ধুর কাছেই নিয়ে যেতাম ওকে। একদিন বন্ধু আমায় ডেকে বলল, মাস ছয়েকের বেশি আয়ু নেই উমার। যা করতে চায়, যেন করতে দেই। আমার তখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। যে যা বলছে, তাই আঁকড়ে ধরি।' রাফসানের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা তো মুসলমান।

আমাদের দেব-দেবী সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে? মা মনসার ব্যাপারে জানো?'

'মনসামঙ্গল কাব্য পড়েছি। মোটামুটি জানি।' ডাক্তার থেকে বি.সি.এস. দিয়ে পুলিশ হয়েছিল রাফসান। টুকটাক এসব সে জানে, তার ওপর গল্পের বই আর মুভির পোকা। তাই সেই সূত্রেও জানা হয়েছে বেশ কিছু তথ্য।

'সাপ, বসন্ত থেকে আরোগ্য আর প্রজননের দেবী হচ্ছেন মনসা। ভক্তের দিকে খেয়াল রাখেন খুব। অনেক জায়গায় তাকে শুধু বসন্ত না, যেকোনো প্রাণঘাতী রোগের নিরাময়কারী ধরে নেওয়া হয়।' জানালেন প্রীতম। 'যাই হোক, একদিন আচমকা বাবার খোঁজ পেলাম। বাবা পরমেশ্বর বেশ বিখ্যাত মনসা পূজারী। তার কাছে গিয়ে নাকি অনেকেই আরোগ্য লাভ করেছে। আমি তখন প্রায় পাগল। তাই গিয়ে মাথা ঠুকলাম তার পায়ে। বিশেষ এক আচার পালন করার জন্য রাজি করালাম তাকে।'

মুচকি হাসল শিহান, পীর-ফকির-সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই ওর। 'টাকাপয়সা দিলে–'

কথা শেষ করতে পারল না সে। তার আগেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রীতম চক্রবর্তী। 'একটা টাকাও নেননি তিনি, এখনও নেন না। ক্ষুদ্র জ্ঞানে সবাইকে এক মনে করাটা ঠিক হবে না, এস.আই. সাহেব।'

জোঁকের মুখে লবণ পড়লে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা হলো শিহানের। চুপ হয়ে গেল সে।

'যা বলছিলাম,' মিনিটখানেক পর আবার শুরু করলেন বিজ্ঞানী, ধাতস্থ হয়ে এসেছেন অনেকটাই। 'বিশেষ এক আচার পালনে সম্মত হলেন বাবা পরমেশ্বর। পূর্ণিমার এক রাতে, এই বাড়িতেই, ওই ঘরে,' বলে

পূজার ঘরটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। ‘পালিত হলো সেই আচার। সারা রাত ওখানেই বসে কাটিয়েছিলাম।’ বলেই আবার চুপ করে রইলেন বিখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট।

‘তারপর?’ মিনিটখানেক পর আর স্নায়ুর চাপ সইতে না পেরে বলল শিহান।

‘আমি তো উৎকণ্ঠায় আছি। কাজ হয়...কি না হয়।’ বললেন প্রীতম। ‘তারপর যখন উমারা সুন্দরবন থেকে ফিরে এলো–’

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান।’ ভদ্রলোককে থামিয়ে দিল রাফসান। ‘সুন্দরবন থেকে উমারা ফিরে এলো মানে?’

‘বলিনি বুঝি?’ মেয়ের স্মৃতিচারণা বিজ্ঞানীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। ‘উমা খুব চঞ্চল ছিল। ক্যান্সারও ওকে কাবু করতে পারেনি। ধার্মিক হলেও, আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস ছিল কম। অনেকটা তোমার মতো,’ শিহানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। ‘তাই এসব আচারে যেন অংশ নেয়, তার জন্য খুব লোভ-টোভ দেখাতে হতো। বাবা পরমেশ্বরের সঙ্গে বসতে রাজি হয়েছিল একটা মাত্র শর্তে–ওকে আর নিয়তিকে সুন্দরবনে যেতে দিতে হবে।’

‘এই নিয়তির কথা আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে, মেহেদি সাহেবের মুখে। কে ইনি?’ জানতে চাইল রাফসান।

‘এটা আমাদের দ্বিতীয় বাসা। এর আগে আমরা থাকতাম বনশ্রীতে। আইডিয়ালের ছাত্রী ছিল উমা। পাশের বাসাতেই থাকত নিয়তিরা। এক বাপের এক মেয়ে, বাড়িটাও ওদের নিজেদের; পড়ত আইডিয়ালেই। একসঙ্গে বড়ো হয়েছে বলতে পারো।’

‘তারপর? সুন্দরবন থেকে ফিরে আসার পর? কীভাবে জানতে পারলেন যে মিস উমার ক্যান্সার সেরে গিয়েছে? আপনি সঙ্গে যাননি?’

একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করল শিহান।

‘একে-একে বলি। প্রথমে শেষ প্রশ্নটা দিয়েই শুরু করি। নাহ, আমি যাইনি। যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মেয়ে তখন ভার্সিটিতে উঠেছে। একা-একা সব করতে চায়। নিয়তিকে নিয়ে একাই যেতে চেয়েছিল। আমি অবশ্য তা করতে দেইনি। জোর করে মেহেদিকে দিয়ে দেই সঙ্গে। আসলে ছেলেটা আমাদের সঙ্গে আছে ওর জন্মের পর থেকে। ভাইয়ের মতোই দেখি ওকে, ভরসা করি; আমার ডানহাত বলতে পারো।’

‘হুম, বুঝলাম,’ বলল শিহান। ‘তারপর?’

‘সুন্দরবন থেকে এসে কেমন যেন বদলে গেল উমা। একমাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল ওর মাঝে। একটা কালো পাথরের মূর্তি নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। সুন্দরবনের ওদিকে দেবী মনসার বেশ পূজা হয়, সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে। কথা বলা কমিয়ে দিল, ওটা নিয়েই পড়ে থাকত দিন-রাত। একদিন শুনি, বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলা, মুখ দেখা–সবই বন্ধ! কারণ কী–হাজার জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাইনি। শাকাহারী হয়ে পড়ল, মাঝে-সাঝে এমনও হতো যে কয়েকদিন ঘর থেকেই বেরোত না। এত বড়ো মেয়ে, তারপরেও জোর করতে হতো আমার। খাবার খাইয়ে দিতে হতো, বাইরে নিয়ে যেতাম; মাঝে-মাঝে গোসল করতেও বাধ্য করতে হতো–এমন তন্ময় হয়ে থাকত মূর্তিটাকে নিয়ে। তারপর একদিন নিয়ে গেলাম ওকে স্ক্যান করাতে। মা মনসা আর বাবা পরমেশ্বরের কৃপায় আবিষ্কার করলাম–উমা ক্যান্সার মুক্ত। আর কোনো ওষুধ লাগল না! লাগল না সার্জারি বা কেমোথেরাপিও!’

অবাক হয়ে গল্প শুনছিল শিহান। ‘এ নিয়েই কি গবেষণা করছিলেন নাকি মিস উমা? আর এত বড়ো একটা ঘটনা, তা-ও আবার আপনার মেয়ের! কিন্তু খবরের কাগজে দেখলাম না যে?’

‘আমি ছাপাতে চেয়েছিলাম, কেন শুধু একমাত্র আমিই এই সৌভাগ্যের ভাগীদার হব? আমার মতো আরও অগণিত বাবা আছে, যাদের একমাত্র মেয়ে এই রোগে ভুগছে। আমি যেমন আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি, তেমনি অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীকে হারাচ্ছে। কিন্তু বাবাই নিষেধ করলেন। জানালেন, এমন আচার করা চাট্টিখানি কথা না। তারচেয়ে বড়ো কথা, সবার ওপর মা মনসা প্রীত হোন না। তাই পাঁচ-কান না হওয়াই ভালো। উমার মাঝেও আসলে তেমন আগ্রহ দেখিনি। বাবার কথা তো আর ফেলা যায় না। তাই আর আমিও চাপ দেইনি।’

মাথা দোলাল রাফসান, ভান করল যেন বুঝতে পেরেছে। উমাকে খুব ভালো করে চেনে না ও, কিন্তু বাপের মতো যে ধর্মান্ধ না মেয়েটা–তা জানে। তাই ভিন্ন একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে ওর মনে। প্রবীণ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে আর একটাও তথ্য পাবে না বুঝতে পেরে, উঠে দাঁড়াল বিদায় নেবার জন্য।

‘আপনাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কী আর করব।’ বলল সে। ‘আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা বিদায় নিচ্ছি।’

‘একটা অনুরোধ করতে পারি?’ কাতর কণ্ঠে বললেন প্রীতম চক্রবর্তী। ‘বিজ্ঞানী হিসেবে না, অসহায় এক বাবা হিসাবে। যদি এই কেসের ব্যাপারে অগ্রগতি হয়, তা সে যত ছোটোই হোক না কেন, আমাকে জানাবে দয়া করে?’

‘জানাব।’ এক শব্দে ওয়াদা করে বিদায় নিলো রাফসান।

*

প্রফেসরের কাছে বিদায় নেওয়ার পরও, দালানে প্রবেশের দরজার সামনে ঘোরাফেরা করছে দুই তদন্ত কর্মকর্তা। আসলে ঘোরাফেরা করছে রাফসান, শিহান শুধুই সঙ্গী।

'কী খুঁজছেন?' জানতে চাইল অধৈর্য যুবক।

'কী না, কাকে খুঁজছি জিজ্ঞেস করো।' বলল রাফসান।

'আচ্ছা, কাকে খুঁজছেন?'

'মেহেদি সাহেবকে।'

'কেন?'

'এই নিয়তি মেয়েটার ঠিকানা নেবার জন্য।'

'তা কেন?'

'আরে বোকা, শুনলে না? বাবার আচারের পরেই সুন্দরবনে গিয়েছিল উমা, সঙ্গে ছিল বান্ধবী। ওখান থেকে আসার পরেই কেমন যেন পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল মেয়েটার চরিত্রে। এমন কী হয়েছিল ওখানে?'

'যাই হোক না কেন, সে তো আরও সাত-আট বছর আগের কথা!' অবাক কণ্ঠ শিহানের। 'তার সঙ্গে আমাদের কেসের কী সম্পর্ক?'

'আছে, বাবা...আছে। আমার অলৌকিকত্বে খুব একটা বিশ্বাস নেই। প্রীতম স্যার ধরে নিয়েছেন যে আচারের কারণেই উমা ক্যান্সার মুক্ত। সেটা তো না-ও হতে পারে। হয়তো সুন্দরবনে গিয়ে সে কিছু একটা দেখেছে বা এমন কিছু হয়েছে, যার কারণে দূর হয়েছে মেয়েটার ক্যান্সার। আর সেজন্যই ওই মূর্তি নিয়ে সারাক্ষণ পড়ে থাকত মেয়েটা। পরে হয়তো সেখান থেকেই আবিষ্কার করেছে কিছু একটা।

হতে পারে না? কোনটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য? ঝাড়-তুক-তাক-ফুঁকে ক্যান্সার নিরাময় হয়েছে? নাকি তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা আছে?'

'পরেরটা।' মেনে নিলো শিহান।

'আর সে ব্যাপারে আমাদেরকে কে জানাতে পারে? কে-কে ছিল ওই ভ্রমণে?'

'মেহেদি সাহেব আর এই নিয়তি।'

'ঠিক। তা উমা নিশ্চয়ই বান্ধবীকে বাদ দিয়ে চাচাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত না।'

'তা তো না-ই।'

'এই জন্যই দরকার আমার মেহেদি সাহেবকে, নিয়তি নামের মেয়েটার ঠিকানা ছাড়া এগোনো যাবে না।'

'তাহলে সরাসরি ডাকলেই হয়,' বলে বসল শিহান। 'আমি তো পুলিশ। এত লুকাছাপার কী আছে?' বলেই হেঁড়ে গলায় ডাকতে শুরু করল ও।

কিছুক্ষণের মাঝেই মাঝবয়সি লোকটা এসে হাজির। 'ডাকাডাকি বন্ধ করুন। বলুন, কী দরকার?'

'এই নিয়তি মেয়েটার বাসার ঠিকানা বা ফোন নম্বর কিছু আছে আপনার কাছে?' ভদ্রতার ধার ধারল না শিহান।

'ফোন নম্বর নেই। তবে বাসার ঠিকানা জানি।' বলে বনশ্রী প্রজেক্টের ডি-ব্লকের একটা বাসার নম্বর বললেন মেহেদি। 'ওকে কী দরকার, জানতে পারি?'

প্রথম থেকেই লোকটার হামবড়া ভাব পছন্দ হয়নি শিহানের। তাই আর নিজেকে থামিয়ে রাখল না। 'পুলিশি ব্যাপার, আপনার জানার

দরকার নেই।'

*

'ওভাবে না বললেও পারতে,' নামাজ পড়া-খাওয়া শেষ করে গাড়িতে উঠে বসেছে রাফসান আর শিহান। বরাবরের মতোই, স্টিয়ারিং-এ শিহান।

'কাকে...কী...কোনভাবে না বললেও পারতাম?' আসমান থেকে পড়ল যেন শিহান।

'মেহেদি সাহেবকে। সামনে তার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে আমাদের।'

'লোকটার হামবড়া ভাব আপনার গায়ে লাগেনি?'

'লেগেছে, কিন্তু তাই বলে শুধু-শুধু খারাপ ব্যবহারের কারণ দেখছি না।'

কিছু বলল না শিহান, শ্রাগ করল কেবল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রাফসান। রামপুরা ব্রিজের পাশ দিয়ে বনশ্রী প্রজেক্টে ঢুকছে ওদের গাড়ি। আট-দশ বছর আগের দৃশ্য কল্পনা করতে চাইল ও মানসচোখে। এখনকার সাথে তো মেলানোই যায় না। পুরো প্রজেক্টটার প্রাণ ছিল আইডিয়াল স্কুল। এখন খালের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটায় ঢুকেছে, সেখানে থাকত বাচ্চাদের ভিড়। বাচ্চা মেয়ে মানেই তাকে দেখা যেত সাদা স্কার্ফ পরা অবস্থায়, ছেলে মানেই সাদা জালি টুপি। অনেক দুষ্ট অবশ্য কেবল স্কুলে ঢোকার ঠিক আগে

আগে মাথায় দিত টুপি, আবার ছুটি হতেই-না-হতেই টুপি গায়েব! বাড়ি-ঘর ছিল না খুব একটা। ডি-ব্লক মানে তো তখন মফস্বল।

এখন অবশ্য চেনাই যায় না।

ডি-ব্লক পার হয়ে ই, এফ, এমনকী জি-ব্লকেও অগণিত দালান। এককালে বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো ওগুলো, এখন দখল করে নিয়েছে ইট আর পাথরের দালান। গ্রাম্য গন্ধটা নেই আর, পুরাদস্তুর শহর এখন জায়গাটা।

তবে নিয়তিদের বাড়ি একেবারে আট নম্বর রাস্তায়। প্রজেক্টের এক পাশে হওয়ায়, এখনও কিছুটা নির্জন। পাশে এখনও একটা খালি প্লট, অন্য পাশে নির্মাণাধীন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। প্রীতম চক্রবর্তী কোনো এক ডেভেলপারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন জায়গাটা। নির্মাণকাজ চলছিল, কিন্তু দিন দুয়েক আগে এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে একটা লাশ। পত্রিকায় পড়েছিল খবরটা রাফসান। বড়ো নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বেচারাকে। চেহারা পুড়িয়ে বিকৃত করা হয়েছে। চোখ নেই, পা দুটোই ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো। পুলিশের ধারণা অন্য কোথাও খুন করে এখানে এনে ফেলা হয়েছিল লাশটা। ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই খুনটা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে তারা, এজন্য হারুন নামের এক লোককে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

আপাতত তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নির্মাণ কাজ। প্রথম কয়েকদিন পুলিশও ছিল। কিন্তু আজ আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এন.এন.এ. রিয়েল এস্টেটের বিশাল বড়ো বোর্ডটার সামনে গাড়ি থামাল শিহান। রাস্তার ওপাশেও কোনো বাড়ি নেই। নিয়তিদের একতলা বাড়িটা তাই দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার কাছে আসতেই দেখতে পেল একটা সাইনবোর্ড।

উম্মে হানী (নিয়তি ম্যাডাম)

বি.এস.সি. (মাইক্রোবায়োলজি, ডি.ইউ.), এম.এস.সি. (ডি.ইউ.)

শিক্ষিকা, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

থমকে গেল রাফসান। বি.এস.সি.-এম.এস.সি. করা মেয়ের তো বাচ্চাদের স্কুলে শিক্ষকতা করার কথা না...তা সে যত ভালো স্কুলই হোক না কেন। উমার ডিগ্রিও তো এগুলোই ছিল।

শ্রাগ করে মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল রাফসান। নিজের ক্যারিয়ারের আগা-মাথা ছিল না এক সময়। তাই অন্য কারও ক্যারিয়ার চয়েজের সমালোচনা করার অধিকার সে অন্তত রাখে না। কলিং বেল বাজাল এক পা এগিয়ে।

একতলা বাড়ি খুব একটা দেখা যায় না আজকাল। অন্তত ঢাকা শহরে। সেগুলো ডেভেলপাররা কিনে নেয় খুব সহজেই। কিনতে না পারলে কখনও-সখনও দখল করে নেয়।

মিনিটখানেক পার হয়ে গেল। কিন্তু দরজা খুলল না কেউ। আবার বেল বাজাবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় খুলে গেল দরজা।

থমকে দাঁড়াল রাফসান।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সালোয়ার কামিজ পরিহিত এক মেয়ে। স্কুল শিক্ষিকা বলে মনেই হয় না। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা গড়নটা একহারা, বাংলাদেশি মেয়েদের মধ্যে এমন উচ্চতা দেখা যায় না বললেই চলে। পরনের পোশাকে শালীনতা। চুল পেছন দিকে টেনে বাঁধা হয়েছে; ফলে উন্মোচিত হয়েছে প্রশস্ত কপাল। কপালের এক

পাশে ছোটো একটা দাগ, ছোটো বেলায় আঘাত পেয়েছিল হয়তো। কিন্তু সেটা যেন অন্যরকমভাবে মানিয়ে গিয়েছে চেহারাটার সাথে।

এস.এস.সি. দেবার সময় শকুন্তলার রূপের বর্ণনা মুখস্থ করেছিল রাফসান। মাথায় এখন সেসব বিশেষণই খেলে যাচ্ছে। মরাল গ্রীবা, কচি তরুর ডালের মতো হাত...ইত্যাদি। একমাত্র যে জিনিসটা এই মেয়ের শিক্ষিকা হবার প্রমাণ দিচ্ছে তা হলো চোখের চশমা। মোটা ফ্রেম আর পুরু লেন্সের আড়ালে চোখের তারায় একই সাথে বিরক্তি আর কৌতূহল খেলে যাচ্ছে। মুখের অবয়বে অন্যরকম কাঠিন্য। এই মেয়েকে পাশে নিয়ে চলা যায়, শো-কেসের পুতুল হিসেবে বসে থাকার জন্য জন্ম হয়নি এর!

'কোন ক্লাসে পড়ে? ছেলে না মেয়ে?' জানতে চাইল মেয়েটি।

সম্বিত ফিরল রাফসানের। অন্য সময় হলে হয়তো প্রশ্নটা করার কারণ ধরে ফেলতে পারত। তবে হায়, আগেও বেলতলায় যাওয়া ছেলেটা যে ন্যাড়া হতে চাইছে! তাই হচকচিয়ে গেল। 'মানে...'

'বাচ্চাকে ব্যাচে দেবার জন্য আসেননি?' এখন মেয়েটার চোখের তারায় কেবল বিরক্তি, কৌতূহল বিদায় নিয়েছে। 'তাহলে কেন এসেছেন?'

রাফসানকে উদ্ধার করার জন্য পাশ থেকে এগিয়ে এলো শিহান। 'আমি এস.আই. শিহান। ইনি ডা. রাফসান। আমরা পুলিশি কাজে এসেছি।'

বাংলাদেশের পুলিশ আর ডাক্তার, সম্ভবত এই দুই শ্রেণির চাইতে ভুলভাবে উপস্থাপিত পেশা আর নেই। পত্রিকা খুললেই দেখা যায় ভুল চিকিৎসার বিবরণ, নইলে পুলিশি অপেশাদারিত্ব বা তাদের অত্যাচারের কথা। তাই ঘরের দোরগোড়ায় এই দুই পেশা-শ্রেণির সদস্যদের দেখতে পেয়ে যে কারও চমকে ওঠার কথা।

কিন্তু সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার চেহারায় না চমকে যাবার কোনো লক্ষণ আছে, আর না ভয় পাবার। বরঞ্চ যেন সীমাহীন বিরক্তি ভর করেছে ওখানে। 'যা বলার, তা তো আগেই বলেছি। আবার কী?' কণ্ঠেও চাপা রইল না বিরক্তি।

সিন্ধু-সিঞ্চনে মেলে অমৃত,
দেখেছি কি আগে কাউকে তোমারি মতো?

মনের ভেতর থেকে লুকিয়ে থাকা প্রেমিক কবিটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে রাফসানের। অনেক কষ্টে নিজেকে আটকাল সে।

'আমরা পাশের বাড়িতে যে খুন হয়েছে, সেটার ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি।' রাফসানের অবস্থা থেকে মন্তব্য করল শিহান। 'নতুন একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।'

'আমার সাহায্য! কী ব্যাপারে, বলুন তো?' এস.আই.র দিকে মন দিল মেয়েটা। 'বাই দ্য ওয়ে, আমি নিয়তি।'

'ব-বুঝতে পেরেছি।' কণ্ঠ ফিরে পেয়েছে যেন রাফসান। 'ভেতরে বসে বলি?'

ইতস্তত করল নিয়তি। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আসুন। তবে আগে আইডি দেখান প্লিজ।'

সাথে-সাথে আদেশ পালন করল শিহান। সন্তুষ্ট হয়ে এবার রাফসানের দিকে তাকাল মেয়েটা।

পকেট হাতড়াতে শুরু করল রাফসান। বুক পকেট, প্যান্টের পকেট– সব হাতড়াতে হাতড়াতে জিভ কাটল সে, তাড়াহুড়ায় আইডি রেখে এসেছে বাসায়। 'আমি ডা. রাফসান। আমি–'

'ডা. তো বুঝলাম, আগেও বলেছেন। তা আইডি কই?'

'আসলে হয়েছে কী...'

'আইডি ছাড়া আপনার কথা যে সত্য, তা বুঝব কী করে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাফসান। বলেই ফেলল অবশেষে, 'আমি আপনার বান্ধবী, উমা চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করতাম।'

সাথে-সাথে শক্ত হয়ে গেল নিয়তির চেহারা। 'আমার ওই নামে কোনো বান্ধবী নেই।'

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল শিহান, যুবক মানুষ। রক্ত এমনিতেই গরম। তার ওপর মানুষ চড়িয়ে খায়। রাফসানের আচরণের পরিবর্তন ওর নজর এড়ায়নি। আসলে বয়স ত্রিশের বেশি হলে, আর অকৃতদার হলে সম্ভবত সব পুরুষের একই অবস্থা হয়–সুন্দরী মেয়ে দেখলে আর ঠিক থাকে না মাথা। এবার পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিলো সে। 'আছে, উমা নামে আপনার একজন বান্ধবী আছে। আর না থাকলেই বা কী? আমরা তার ব্যাপারে...তার খুনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

কথাটা শোনা মাত্র সাদা হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন। ভেতরে আসুন।'

*

প্রায় মিনিট পনেরো হলো বসার ঘরে বসে আছে রাফসানরা।

বসার ঘরটা বেশ পরিষ্কার। আসবাবের আধিক্য নেই। দেওয়ালে ঝুলছে প্রাকৃতিক কিছু দৃশ্যের ছবি। একপাশে একটা কর্নার-স্ট্যান্ড।

তাতে শোভা পাচ্ছে নানা শো-পিস। বসার চেয়ারগুলো সব বেতের, একটা বেতের টেবিলকে ঘিরে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতিতে সাজানো। টেবিলের দুই মাথায় একটা করে মোট দুটো চেয়ার। আর একপাশে তিন সিটের সোফা।

বসার ঘর থেকে খাবার ঘর আলাদা করা হয়েছে পর্দা দিয়ে। অবশ্য পর্দাটা এখন সরানো। ওদেরকে বসতে বলে ভেতরে চলে গিয়েছিল নিয়তি। ভুলক্রমে পর্দাটা টেনে দেয়নি। বাসাটাকে ছোটোই বলা যায়। পর্দার ফাঁক দিয়ে না চাইলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেতরের দৃশ্য। দরজা দিয়ে ঢুকলেই বসার ঘর, একটা ড্রেসিং টেবিলও আছে।

এই ঘরের সাথে একদম লাগোয়া হচ্ছে খাবার ঘর। সেটার সামনে একটা করিডর। ওটার একপাশে তিনটা ঘর। দুটো তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আরেকটার অবস্থান আন্দাজ করে নিলো রাফসান। কিচেন সম্ভবত করিডরের শেষ মাথায়, ঘরগুলোর উলটোপাশে। মাস্টার বেডরুমটা কিচেনের ঠিক উলটো পাশেরটা হবার কথা।

ওর সন্দেহ সত্যি প্রমাণ করে, ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো নিয়তি। এরপর ঢুকে গেল কিচেনে। সেখান থেকে যখন বেরোল তখন তার হাতের ট্রেতে কোক ভরতি দুই গ্লাস। ওটাকে টেবিলের ওপর রেখে বসল মেয়েটা। চোখ লাল হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কেঁদেছে এই কয়েক মিনিট, বুঝতে পারল রাফসান। মুখে যা-ই বলুক না কেন, উমার প্রতি এখনও একটা টান আছে এর।

'উমা খুন হয়েছে?' জানতে চাইল নিয়তি, ওর কণ্ঠ শুনে বোঝার উপায় নেই যে মনের ভেতরে কী চলছে।

অল্প কথায় মেয়েটাকে সব জানাল শিহান।

'আমরা আশা করছি, আপনি এই ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন। আপনারা যখন সুন্দরবনে গিয়েছিলেন, তখন

কি কিছু হয়েছিল? ফিরে আসার পর এমন কেন হয়ে গিয়েছিলেন মিস উমা? আপনার সঙ্গে কি তার অতি সম্প্রতি দেখা হয়েছে বা তথ্য আদান-প্রদান হয়েছে?'

মুচকি হাসল নিয়তি। 'উমা আমার বান্ধবী ছিল–কথাটা বলা সম্ভবত ভুল হবে। ও শুধু আমার বান্ধবীই ছিল না, ছিল সবচেয়ে আপনজন। আমি ওকে বোন বলেই ভাবতাম। সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে শুধু ওর জন্যই বেড়াতে গিয়েছিলাম সুন্দরবনে। ওখানে কিছু হয়েছিল কিনা জানতে চাচ্ছেন? নাহ, কিছুই হয়নি।

'আপনার পরের প্রশ্নে আসি, উমার মধ্যে আসলেই অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছিল এক এক করে। ফিরে আসার পর দেখা গেল, আমাকে সে সহ্যই করতে পারছে না। আচমকা অতিমাত্রায় ধার্মিক হয়ে উঠেছে সে। সুন্দরবনে থাকা অবস্থায় একটা মূর্তি পেয়েছিল, ওদের কোন দেবীর মূর্তি। সেটা নিয়েই পড়ে থাকত। একদিন আচমকা বলে বসল, মুসলমানদের গা থেকে নাকি কেমন এক ধরনের বোঁটকা গন্ধ আসে!'

'মুসলমানদের গা থেকে মানে?' জানতে চাইল রাফসান।

'যা শুনেছেন, ঠিক তা-ই বলেছে।' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল নিয়তি। 'আমি আসলে কখনও ভাবতেও পারিনি যে ওর মতো একজন মেয়ের মুখ থেকে এমন সাম্প্রদায়িক কথা শুনব। এরপর তো আস্তে-আস্তে মেলা-মেশাও বন্ধ করে দিল। যে মেয়ের সঙ্গে স্কুলে দিনের-পর-দিন কাটিয়েছি, ভার্সিটিতে উঠে তার সঙ্গে কথাও হয়নি ঠিকমতো কোনোদিন। এড়িয়ে চলত আমাকে। প্রথম-প্রথম দেখতাম, আসলেই সব মুসলমান, খ্রিষ্টানদের এড়িয়ে চলছে। এক-দুই জন বৌদ্ধ সহপাঠী ছিল, তাদের সঙ্গে উঠত-বসত। তখন বুঝতে পারলাম, আসলেই সাম্প্রদায়িকতা পেয়ে বসেছে আমার বন্ধুকে।'

মাথা দোলাল রাফসান। প্রীতম চক্রবর্তীর কথার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আসলেই আচমকা ধার্মিক...উহু, গোঁড়া ধার্মিক বনে গিয়েছিল মেয়েটা।

'তারপর?' প্রশ্ন করল শিহান।

'তারপর আর কী? পাশ করলাম, মাস্টার্সও করলাম। আচমকা বাবা মারা গেলেন। সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে স্ট্রোক করে বসলেন মা। বাবার যা ব্যবসা ছিল, সব অন্যরা দখল করে নিলো। এখন এই বাড়িতে মা-বেটি থাকি। আইডিয়ালে পড়াই, ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী হয় কিছু। বেশ চলে যায়।'

'উমা যোগাযোগ করেনি?'

'নাহ, এমনকি বাবা মারা যাবার সময়ও না। অথচ মেয়েটাকে তিনি কী আদরটাই না করতেন!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিয়তি। 'মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।'

'হুম, তার সঙ্গে তাহলে রিসেন্টলি যোগাযোগ হয়নি আপনার?' হাল ছাড়তে রাজি নয় শিহান। 'কোনো মেসেজ বা মেইল পাননি?'

'নাহ।' পরিষ্কার জবাব উমার। 'এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। খুনের মোটিভ ধরতে পেরেছেন?'

অস্বস্তি দেখা গেল শিহানের মাঝে। তেমন কোনো তথ্যও পায়নি মেয়েটার কাছ থেকে। তাই তথ্যের আদান-প্রদান হিসেবে চলমান তদন্তের ব্যাপারে কিছু জানাতে মন চাইছে না। 'এখনও পরিষ্কার না।'

'কাউকে সন্দেহ করছেন?'

'তদন্তের এই পর্যায়ে তো কাউকেই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।' বলল শিহান। 'বুঝতেই পারছেন...'

হেসে ফেলল নিয়তি। ‘আমাদের পাশের বাসায়, মানে উমাদের বাড়িতেই এক সিকিউরিটি গার্ড খুন হয়েছে। শুনেছেন তো? সেই খুনের তদন্তকারী কর্মকর্তাও একই জবাব দিত। চেষ্টা চলছে, এখনও পরিষ্কার না, নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। তা লোকটা নাহয় নিরীহ সিকিউরিটি গার্ড ছিল, তাই পুলিশের মাথা ব্যথা ছিল না বেশি! উমার ব্যাপারেও কি তাই হবে?’

লজ্জায় লাল হয়ে গেল শিহানের গাল। আমতা-আমতা করতে লাগল ও। ছেলেটাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো রাফসান, ‘মিস নিয়তি।’ মেয়েটার দিকে নিজের কার্ড এগিয়ে দিল ও। ‘এই নিন আমার কার্ড। যদি আরও কিছু মনে পড়ে, জানাবেন আশা করি।’

হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলো নিয়তি। নিজেকে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র বলে মনে হচ্ছে রাফসানের, বুক ধুক-পুক করছে। অনেকদিন পর যেন নতুন করে অনুভূতিটার সাথে পরিচিত হচ্ছে ও। ইচ্ছে হচ্ছে হাতটা ছুঁয়ে দেয়!

কার্ড নিয়ে কর্নার-স্ট্যান্ডে রাখা একটা ডায়েরিতে রেখে দিল নিয়তি, নিজের একটা কার্ড বের করে এনে বলল, ‘কোনো অগ্রগতি হলে,’ বলে আড়চোখে তাকাল শিহানের দিকে। ‘অথবা পরিস্থিতি একটু পরিষ্কার হলে, জানাবেন দয়া করে।’

‘অবশ্যই,’ বলে কার্ডটা পকেটে ভরে রাখল রাফসান।

*

ঠিক কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেল ওয়াজেথ, বলতে পারবে না। ওর শেষ স্মৃতি জলের অতলে তলিয়ে যাবার। চারপাশ থেকে কালো পানি

যেন ওকে নিজের পেটের ভেতর টেনে নিয়েছিল। নাগপাশে যেমন দম বন্ধ হয়ে আসে, তেমনি দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওর। ভেবেছিল, আর বোধহয় কোনোদিন দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য হবে না। কিন্তু না, এখন তো চারপাশে আবছা আলো দেখা দিচ্ছে!

ঘূর্ণির ভেতরে পড়েও তাহলে বেঁচে আছে ও!

কীভাবে সম্ভব! আচমকা নড়ে উঠল যুবক। সাথে-সাথে পানির স্পর্শ পেল হাতে, টলে উঠল পরিচিত দুনিয়া। বুঝতে পারল, এক টুকরা কাঠ সম্বল করে ভাসছে পানিতে। নড়ে ওঠায় খনিকের জন্য ভারসাম্য হারিয়েছে ওটা। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো পেলে তা-ও আঁকড়ে ধরে। আর ও পেয়েছে আস্ত একটা কাঠের টুকরা! হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু বাঁচল কী করে? কয়েকদিন আগে শোনা গল্প সব মনে পড়ে গেল ওর–দেবী মনসা আর তার ভাই, নাগ বাসুকির গল্প; নাগরাজ বাসুকির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলে আনার আখ্যান। এসবের তুলনায় ওকে উদ্ধার করা তো ছেলেখেলা মাত্র!

হঠাৎ কী মনে হতে হাত ঝট করে কোমরের কাছে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল ও। কিন্তু একটু আগের অভিজ্ঞতা ওকে থামিয়ে দিল। ধীরে-সুস্থেই কোমর স্পর্শ করল তাই, পরিচিত থলে আর তার ভেতরের ভারী বস্তুর অস্তিত্ব শান্ত করে তুলল ওকে। একবার গলাতে হাত দিতেও ভুলল না। আছে, জায়গামতোই আছে মালাগুলো।

অবশ্য এতে লাভ হলো নাকি ক্ষতি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ওয়াজেথ। দেবী মূর্তি আর মালার ওজন কম হবে না। ওগুলো ফেলে দিলে, বাঁচার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বাড়বে ওর। কিন্তু যেখানে বাঁচার সম্ভাবনাই ছিল না, সেখানে এখনও দম ফেলছে বলে ওগুলো ফেলে

দেবার সাহসও হচ্ছে না। যদি আসলেই দেবী মনসা ওর ওপর নজর রাখেন?

তারচেয়ে বড়ো কথা, যদি ওকে মূর্তি ফেলে দিতে দেখে রেগে যান?

থাক বাবা, মর্তের মানুষ হয়ে স্বর্গের দেবতার বিপক্ষে যাবার দরকার কী?

*

দীর্ঘ তিন দিন ধরে ভাসছে ওয়াজেথ। কোন নদীতে আছে, তা ঠাহর করতে পারছে না। তবে নদীতেই যে আছে এখনও–সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ক্ষুধায় কাতর দেহের একটাই সান্ত্বনা, অন্তত পানি পান করতে একদম কষ্ট হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত পানি সুমিষ্ট, যার অর্থ– কোনো এক নদীতেই আছে এখনও।

তবে স্বস্তিটুকুর স্থায়িত্ব অল্প কিছুক্ষণ। বয়স কম আর স্বাস্থ্য ভালো বলে তিন দিন টিকেছে ওয়াজেথ। যদিও ঝড়ের পর যে কত দিন পার হয়েছে, তা সে ঠিক করে বলতেই পারবে না। এভাবে আর বড়োজোর একদিন...প্রচণ্ড প্রাণশক্তির জোরে দুই দিন টিকলেও টিকতে পারে। কিন্তু তারপর? মৃত্যু সুনিশ্চিত। আর কত পানি খেয়ে থাকা যায়? কয়েকদিন পানিতে লাগাতার ভিজছে বলে দেহটাকে আরও অবসন্ন মনে হচ্ছে। ওর জানা নেই, ভবিষ্যতে এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করবেন, পানিতে বেশিক্ষণ ভিজলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে পানি বের হয়ে যেতে শুরু করে। ফলে দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় প্রাণঘাতী এক অবস্থার।

তবে হাজার বছর আগের ওয়াজেথ এত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানে না। কেবল জানে, ক্রমেই হারাতে শুরু করেছে শক্তি। চোখেও যেন ঝাপসা দেখছে। হাত দুটোকে মনে হয় যেন বট গাছের গুঁড়ি। ওগুলো ওঠাবে, সাধ্য কার?

শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহটাকে কাঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে চোখ মুদল বেচারা। হাল ছেড়ে দিতে মন চাইছে খুব। ইচ্ছা হচ্ছে একেবারে ঘুমিয়ে পড়তে, আর কখনও চোখ খুলবে কি খুলবে না সে চিন্তা বাদ।

ধড়মড় করে উঠে বসল ও, সাথে-সাথে কাঠ থেকে পরে গেল পানিতে। আতঙ্কিত দেহ মানুষকে দিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নেয়। ওর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। যে হাতগুলোকে মনে হচ্ছিল গাছের গুঁড়ি, সেগুলোই এখন তুলো মনে হচ্ছে। তুলো ভিজে ভারী হয়ে যাওয়ার পূর্বেই কোনোক্রমে সাঁতরে ধরল কাঠের খণ্ডটাকে। বুঝতে পারল, ঘুমিয়ে পড়েছিল কোনো এক ফাঁকে!

আবার মাথা রাখতে যাবে কাঠের টুকরাটায়, এমন সময় নজর চলে গেল সামনে। এ কী! এতদিন ধরে যে পানিই ছিল ওর একমাত্র সঙ্গী, সেই পানিকে হার মানিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সুবজাভ একদল বৃক্ষ। এগুলোকে যে ম্যানগ্রোভ বলে, তা অবশ্য জানে না ওয়াজেথ। জেনে কাজ কী? ওর দরকার আপাতত জান বাঁচানো, আর তার জন্য চাই মাটি। কারণ মাটি মানেই খাবার, আশ্রয়, বিশ্রাম, প্রাণ আর হয়তোবা...

...মানুষ!

দাঁড় নেই, তাই হাতই সই। এবার গুঁড়ির মতো ভারী হাতটুকু তুলোর মতো নয়, কাঠের বলে মনে হলো ওর। বাইতে শুরু করল ওগুলো দিয়ে। যে করেই হোক, ওই ভূ-খণ্ডে পৌঁছাতে হবে। নইলে প্রাণে বাঁচা যাবে না।

অর্ধেকটা দিন পার করে তীরে পৌঁছাল ওয়াজেথ। দেহের শতকরা সত্তর ভাগ পানি হলেও, মাটির সাথে কী যেন একটা সম্পর্ক আছে মানুষের। ওর স্পর্শ পেলেই জান ফিরে পায়। হয়তো এ কারণেই গ্রিকদের পুরাণে এমন অনেক ডেমিগডের কথা আছে, যারা পৃথিবীর সন্তান আর সেই সাথে মাটির স্পর্শ পাওয়া মাত্র হয়ে ওঠেন অপ্রতিরোধ্য।

ওয়াজেথ ডেমিগড বা সে জাতীয় কিছু না। মরণশীল মানুষের সন্তান, তারপরেও মাটিতে পা রেখে ওর মনে হলো যেন শরীরে একশো হাতির শক্তি ভর করেছে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল সামনে, ফল-মূল জাতীয় কিছু খুঁজে পেলে হয়তো শক্তি ফিরে পাবে। বোঝেনি যে মানুষের শরীর এত ধকল নিতে পারে না। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

*

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ওয়াজেথের মাথায় প্রথম যে কথাটি খেলে গেল তা হলো–ধ্যাত। খালি অজ্ঞান হচ্ছি গত কয়দিন ধরে। এর মাঝে ঘটে যাচ্ছে কত কিছু, তার কিছুই টের পাচ্ছি না!

আসলেই অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে এর মাঝে। ওয়াজেথের জানা নেই, সুন্দরবনের প্রান্তে এসে জ্ঞান হারিয়েছিল ও। সেখানে প্রায়শই মাছ শিকারে যেত এক গোত্র। গোত্রটা অনেকটাই আদিম। জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতরের দিকে বাস তাদের। থাকে গোলপাতা ছাওয়া কুটিরে, বন থেকেই অর্জন করে জীবিকা; তাই বাইরে যাবার দরকার পড়ে না খুব একটা। সুন্দরবনই তাদের খাদ্য জোগায়, জোগায় পথ্য আর উপহার দেয় প্রয়োজনীয় সব কিছু।

ওহ, আরেকটা ব্যাপার জানে না ওয়াজেথ। আর সেটা হলো গোত্রটা মাতৃ-কেন্দ্রিক।

এ-ও জানে না, মাতৃ-কেন্দ্রিক বলেই জানে বেঁচে আছে সে। নইলে মরতে হতো যেখানে জ্ঞান হারিয়েছে, সেখানেই।

অদ্ভুত এক গোত্র এটা। সাধারণত কৃষি-ভিত্তিক সমাজে মা পরিবারের প্রধান হয়ে থাকেন। আর এরকম সমাজ, যেখানে বনের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় সবাইকে, সেখানে প্রধান হয় পুরুষ। আসলে এই গোত্রের প্রধানও পুরুষই ছিল। তবে তা অনেক দিন আগের কথা। গোত্র-প্রধানের স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বার্থপরতার দরুণ বীতশ্রদ্ধ গোত্রের সবাই একদিন সিদ্ধান্ত নিলো, আর না। এবার নেতৃত্বে পরিবর্তন আসা দরকার। তখনই গোত্রের বড়োরা সিদ্ধান্ত নিলো–যেহেতু ঘর সামলায় মেয়েরা; তাই গোত্র সামলাতেও তাদের অসুবিধা হবার কথা না। অনেকটা পরীক্ষামূলক ভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো–মেয়েদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। তা প্রায় সোয়া শ' বছর আগের কথা। এখনও যেহেতু গোত্রে নারীদের আধিপত্য চলছে, তাই নিশ্চয়ই সেই পরীক্ষার ফল বলে দিতে হবে না!

যাই হোক, সেদিন মাছ শিকারে গিয়েছিলে অগ্নি আর তার দল। অগ্নি মেয়ে হলেও, তার প্রধান সহকারী, শুভঙ্কর পুরুষ। সাধারণত স্ত্রী কোনো দলের প্রধান হলে, তার সহকারীর দায়িত্ব পালন করে স্বামী। অগ্নির দলটাও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বামী শুভঙ্করকে নিয়ে মাসে একবার এমন অভিযানে বের হয় মেয়েটা। বড়ো মেয়ে পদ্মার বয়স ষোলো। অবশ্য প্রকৃতির নিজ হাতে উপহার দেওয়া সব খাবার আর প্রাকৃতিক সব উপকরণ পেয়ে গায়ে-গতরে বড়ো হয়ে উঠেছে খুব দ্রুতই। এখনই দেখে যুবতি বলে মনে হয়। এমন সোমত্ত মেয়েকে ঘরে ফেলে আসতে যেকোনো মায়ের বুক কেঁপে ওঠার কথা। তবে অগ্নির সেই ভয় নেই। এমনিতেই গোত্রে মেয়েদের ওপরে কেউ কথা

বলে না। তার ওপর গোত্র-প্রধানের মেয়ে, ভবিষ্যৎ গোত্র-প্রধান, তার দিকে কারও চোখ তুলে তাকাবার সাহস নেই!

সাধারণত এতদূর যায় না ওরা মাছ মারতে, তবে এবার গিয়েছে। আসলে সচরাচর মাছ ধরার জায়গাটায় যথেষ্ট পরিমাণ শিকার না মেলায়, একটু সামনে এগিয়েছিল ওরা। দশ জনের দলটা অবাক হয়ে দেখতে পেল, সামনের মাছগুলো আকারে বেশ বড়োসড়ো! চর্বিও কম নয় দেহে। তাই ভাবল, আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক। এরপর আরেকটু। আর এমন করে এগিয়েই আবিষ্কার করল ওয়াজেথকে।

শুভঙ্কর একটু রগচটা, আবার ভীতুও। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখে আসছে, ওদের গোত্রে কেবল মানুষ জন্মায় আর মারা যায়। কিন্তু কেউ ছেড়েও যায় না। আবার কেউ নতুন করে আসেও না। তাই অপরিচিত লোক মানেই শত্রু–এমন একটা ধারণা শক্তপোক্ত হয়ে গেঁড়ে বসেছে তার মনে। আর ওয়াজেথ তো দেখতেই অন্যরকম। সুন্দরবনের রোদে পোড়া আর জলে ভেজা মানুষের মতো না। গায়ের রঙটা একটু আলাদা, আলাদা দেহের গড়ন আর চেহারার অবয়বও। তাই প্রথম থেকেই সে দাবি জানিয়ে আসছিল–এই অপরিচিত শত্রুকে নিকেশ করে দেওয়া হোক। কিন্তু অগ্নির মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল যুবক, যেমনটা জেগেছিল অর্জুনের মনে। আসলেই, ওয়াজেথকে সম্ভবত কোনো দৈব শক্তি নিজ হাতে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে এত কাকতালীয় ঘটনা আর এত সৌভাগ্য কারও কপালে লেখা থাকার কথা না। পরের দিকে এই একই কথাগুলো নিজেও ভেবেছে ওয়াজেথ। যতোই ভেবেছে, ততোই শ্রদ্ধায় নত হয়ে এসেছে ওর মাথা। দেবী ওয়াজেঠথ আর তার বোন, দেবী মনসাকে উদ্দেশ্য করে বারবার পূজা দিয়েছে, বারবার জানিয়েছে সম্মান।

তাদেরকে যেন মানুষ ভুলে না যায়, সেজন্যই তো...

আপাতত থাক সে কথা।

*

ছোট্ট একটা কুটিরে ঠাঁই হয়েছে ওয়াজেথের। জ্ঞান ফিরে পাবার পর পার হয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ। এর মাঝে দুজন মাত্র মানুষকে দেখেছে ও। একজন নারী, অন্যজন পুরুষ। পুরুষ লোকটা ওর কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। যখনই বের হতে চায় ওয়াজেথ, তখনই বাধা দেয়। কথা বলে না কোনো, কেবল দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সামনে। প্রথম-প্রথম মিশরীয় যুবকের ধারণা ছিল, হয়তো ওর ভাষা বোঝে না লোকটা। প্রথমে বাংলা, এরপর পারস্য আর সবশেষে প্রায় ভুলতে বসা মিশরীয়–সব ভাষাতেই চেষ্টা করে দেখেছে ও। কিন্তু লোকটা যেন...ওই যে, দেওয়াল! তবে ভাষা যে বুঝতে পারে, তা পরিষ্কার। আর সেই ভাষাটাও বাংলা, কেননা প্রথম যখন প্রস্রাবের চাপে তলপেট প্রায় ফেটে যাবে যাবে করছে, তখন চিৎকার করে বলেছিল ও, 'মুততেও দিবা না?' লজ্জা আর রাগের আভা ফুটে উঠেছিল লোকটার চেহারায়। তবে দিয়েছিল সে, 'মুততে' দিয়েছিল!

কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি মেলে ওয়াজেথের। বাকি সময়টা কাটাতে হয় ঘরের ভেতরেই। তবে চালু ছেলে ও। তাই যে কয়েকটা মিনিট বাইরে থাকার সুযোগ পায়, তার মধ্যেই চারপাশ সম্পর্কে বেশ ভালো একটা ধারণা নিয়ে ফেলেছে!

বনের একটা বিশেষ অংশে আছে এখন ও। তবে বন হলেও, জায়গা খুব একটা ঘন নয়। গাছের এক কী দুই সারি পরেই যে জনবসতি আছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সম্ভবত ও একজন কয়েদি, আর কয়েদিদের জন্য আলাদা করে বানানো হয়েছে ওই কুটির। মাঝে-

মাঝেই অল্প কিছু দূর থেকে ধোঁয়া আর খাবারের গন্ধ ভেসে আসে ওর নাকে। তাই ধারণাটা সঠিক হবার সম্ভাবনাই প্রবল। এক মুহূর্তের জন্য সামনে দাঁড়ানো প্রহরীকে সরতে দেখেনি যুবক। যখন সে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারে, তখন প্রহরীও সারে। যখন সে খায়, তখন প্রহরী খেয়ে নেয়। ঘুমায় কুটিরের দরজায় হেলান দিয়ে। তাই বের হবার সুযোগ মেলে না।

অন্য যে মুখটা দেখে ওয়াজেথ, তা এক যুবতির। সুন্দর মুখশ্রী যে রোগাক্রান্ত শরীরকে সুস্থ হতে বাড়তি অনুপ্রেরণা দেয়, তা তো সবাই জানে! কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে বটে ওয়াজেথ, কিন্তু মেয়েটা যেন পাথরের মূর্তি। কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট দুটো থেকে একটা শব্দও বের হয়নি। মেয়েটা দিনে তিনবার করে আসে। খাবার-দাবার পৌঁছে দিয়ে যায়।

মেয়েটার আসা যাওয়ার সময়টুকুর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ও। সকালে রুটির মতো একটা জিনিস নিয়ে আসে মেয়েটি। দুপুরে আর রাতে ভাত-মাছ। কখনও কখনও থাকে ফল-মূল, আবার শুধু মাছও থাকে অনেক সময়। দুই একবার মাংসও মিলেছে। তবে ওয়াজেথের মাংসে খুব একটা আসক্তি নেই।

সামনে দাঁড়ানো পাহাড় আর এই মেয়েটা একই গোত্রের বলে মনেই হয় না। লোকটা মিশমিশে কালো না হলেও, খুব একটা কমও না। এদিকে মেয়েটার রং তামাটে। ফর্সা এক মেয়ে অনেকদিন রোদে থাকলে যেমন একটা তামাটে রং ধারণ করে, ঠিক তেমনই। ওয়াজেথ নিজে বেশ লম্বা, আধুনিক মাপ অনুযায়ী পাঁচ ফুট দশ হবে। মেয়েটা এত লম্বা না, টেনে টুনে পাঁচ ফুট চার। তবে এদিকে আসার পর এমন লম্বা মেয়ে দেখেনি ও কখনও। ঘন কালো চুল সরু কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়ে বারবার যেন সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। নিটোল পা, কিছুটা মাংসল হাত আর চুলের চাইতেও কালো চোখ

জোড়ায় যেন সর্বদা নিমন্ত্রণ খেলা করে। কিন্তু কীসের? বুনো, জংলি ফুলের মতো রং-বেরঙের এক আদর্শ নিদর্শন যেন মেয়েটা। অথচ কখনও চোখ তুলে তাকায় না, মুখ দিয়ে সরে না রা। মেয়েটার মাঝে একই সঙ্গে আকর্ষণ, আর ব্যক্তিত্বের মাঝে বিকর্ষণ এমন তীব্রভাবে খেলা করে যে কী করবে ওয়াজেথ তা বুঝেই পায় না!

তবে বন্দিকারীরা ভালো মানুষ–এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। এই ধারণার পেছনে কারণ আছে কয়েকটা। প্রথমত, ওকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যকর আর সুস্বাদু খাবার খেতে দেওয়া হচ্ছে ওকে। আর তৃতীয়, তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ–জ্ঞান ফিরে পেয়ে মালা আর থলেসহ মূর্তি, দুটোই মাথার ঠিক পাশে খুঁজে পেয়েছে।

অন্যান্য দিনের মতো আজকেও বাইরে থেকে ভেসে আসা ‘খসখস’ আওয়াজ শুনতে পেয়ে, চোখ না তুলেই প্রশ্ন করে বসল ওয়াজেথ। ‘নাম কী তোমার?’

জানত উত্তর পাবে না, তাই এক মুহূর্ত দেরি হলো চোখ তুলতে। কিন্তু যখন তুলল, তখন চমকে উঠল প্রবলভাবে। সেই দশাসই আকৃতির প্রহরী ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে! হাতে ইয়া বড়ো এক লাঠি। অবশ্য এখানে আসার পর থেকে লাঠি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নজরে পড়েনি ওয়াজেথের।

‘ক...কী চাই?’ একটু আগের উড়ু উড়ুভাব অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তেল চিকচিকে লাঠিটা দেখে।

‘গোত্র প্রধানের নির্দেশ এসেছে,’ গমগমে কণ্ঠে কথা বলে উঠল প্রহরী। ‘তোমাকে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন তিনি। কথা বলতে চান।’

আপত্তি করার সুযোগ পেল না ওয়াজেথ, ইচ্ছাও ছিল না। নিজেও এই বন্দি দশার পরিবর্তন চায়। তাই সুর সুর করে চলে গেল প্রহরীর পেছন পেছন।

*

যেমনটা ভেবেছিল, গ্রামের একদম কাছেই একটা কুটিরে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে।

অবাক-দৃষ্টিতে জংলি এই গোত্রটার জীবন ধারা দেখতে দেখতে এগোল ওয়াজেথ। এমন মুগ্ধ হয়ে দেখছে যে মেয়েটার কথা যেন ভুলেই গিয়েছে! চারপাশে বেড়া দিয়ে একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছে এরা। বেড়াটাও প্রাকৃতিক, গাছের সারি বেড়ে উঠে একটা গোলাকার বৃত্তের মতো ঘিরে ধরেছে পুরো আবাসটাকে। কম করে হলেও একশো ঘর এখানে। ছোটো গোত্র, মনে-মনে ভাবল ও। অবশ্য চম্পক নগরীর জাঁকজমক আর ব্যস্ততা দেখার পর, এই কয়েকশো লোকের গ্রামকে বড়ো মনে হবার কারণ নেই।

জীবন-যাপন এখানে সাধারণ। ওয়াজেথের জানা নেই, তবে গোত্রটা কয়েক ভাগে বিভক্ত। পুরো গোত্রের সবাই একসাথে থাকে না। প্রহরার পাশাপাশি, পুরো এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্বটাও নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে দলটা। আর তাই কেবল দরকারি জায়গাগুলোতে গড়ে তুলেছে তারা বসতি, এরকম বসতি আছে আরও পাঁচটা। আর প্রতিরক্ষার কাজটা করে নিজেদের খাতিরেই, যেন বেঁচে থাকার রসদের কমতি না হয়।

যাই হোক, ওয়াজেথকে নিয়ে আসা হয়েছে গোত্র-প্রধান, অগ্নির বসতিতে। মহিলা শিকার থেকে এসেই বিশেষ কাজে অন্য এক বসতিতে গিয়েছিল বলে, দেরি হলো ওর বিচারে। বিচারই বলতে হয়, কেননা অগ্নির গোত্র, মানে উরগ গোত্রের সীমানায় অন্য কারও পা রাখার শাস্তি ভয়াবহ।

নামেই বোঝা যাচ্ছে, এই গোত্রও সর্প-পূজারী। অবশ্য যে জায়গায় থাকে তারা, তাতে সর্প-পূজারী না হয়ে লাভ নেই। আরও এক দেবতার পূজা করে এরা। বনের রাজা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার যার অধীনে, সেই দক্ষিণ রায়ের পূজা। উরগ নামের এই গ্রামের সীমানায় যে পা দেয়, তার কপালে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু জোটে না। ওয়াজেথকেও সেই উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। তবে তার আগে জেনে নেওয়া হবে ওর পরিচয়, অগ্নির জানা থাকা দরকার–অন্য কোনো গোত্র ওদের এই অভয়ারণ্যের কথা জেনে গিয়েছে কিনা!

এরপর মারা যাবে ওয়াজেথ...

...তবে কীভাবে মরবে, সেটা নির্ভর করবে ওর ইচ্ছার ওপর।

হয় সাপের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে ওকে, আর নয়তো বাঘের মুখে ছুড়ে দেওয়া হবে।

এসবের কিছুই জানা নেই ওয়াজেথের, তবে জানবে। কেননা ওকে জানবার আর জানাবার জন্যই বসেছে আজকের এই আসর!

*

চুপচাপ অগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াজেথ, ভাবছে নিজের কপালের কথা। কোথায় যাবার কথা ছিল, আর কী হয়ে গেল!

ভেবেছিল, মানুষের দেখা পেয়েছে; পা রাখতে পেরেছে মাটিতে। নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনোভাবে বেঁচে যাবে। এখন তো দেখছে, এর চাইতে পানিতে ডুবে মরলেই ভালো হতো। সাপের ছোবল বা বাঘের কামড়–কোনোটাই ঠিক উপাদেয় হবে বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু উপায়ও নেই আর কোনো। নিজের গল্প পুরোটাই বলেছে ও গোত্র-প্রধান আর উপস্থিত অন্যান্যদেরকে। এদের মাঝে আছে সেই কালো চুলের সুন্দরী মেয়েটাও। থেকে থেকে মেয়েটা চোরা চাহনি দিচ্ছে ওর দিকে। অন্য সময় হলে খুশিই হতো হয়তো ওয়াজেথ, কিন্তু এখন মৃত্যু চিন্তায় কাতর হয়ে কিছুই ভাবতে মন চাইছে না।

'সময় লাগবে সিদ্ধান্ত নিতে?' আচমকা নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল অগ্নি।

'মহামান্য,' শুরু করল ওয়াজেথ। ভাষায় একটু আঞ্চলিক টান আর মাঝে-মাঝে দুই একটা অপরিচিত শব্দ চলে এলেও, ওর বুঝতে একদম অসুবিধা হচ্ছে না। 'আমি আসলে এমন রীতির সঙ্গে পরিচিত না। যেখানে বাঙ্গাল মুলুকের সব জায়গায় অতিথিকে দেবতার সম্মান দেওয়া হয়, সেখানে–'

ওকে কথা শেষ না করতে দিয়ে থামিয়ে দিল শুভঙ্কর। অগ্নির স্বামী হবার পাশাপাশি সে উরগ গোত্রের যোদ্ধাদের উপ-প্রধানও বটে। 'আমাদের গোত্রে অগণিত কাল ধরে এমনটাই চলে এসেছে। আমাদের বাপরা এ কাজ শিখেছেন তাদের বাবাদের কাছ থেকে। তারা শিখেছেন, তাদের বাবাদের কাছ থেকে। এভাবেই আমরা শত শত বছর ধরে নিজেদেরকে সুরক্ষা আর আত্মগোপন করে আছি।'

'কিন্তু তাই বলে মৃত্যুদণ্ড? সাজাটা মশা মারতে কামান দাগার মতো হয়ে গেল না?' তবুও আপত্তি জানাল ওয়াজেথ।

খ্যাপে লাল হয়ে গেল শুভঙ্কর। প্রথম থেকেই এই লোকটার উপস্থিতি ওকে বিরক্ত আর ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এখন আবার দেখা যাচ্ছে, মুখে মুখে তর্ক করছে বন্দি! আরে পিঁপড়া, মনে-মনে ভাবল সে। চাইলে এখনই তোকে পিষে মারতে পারি।

মনে-মনে ভাবা বাক্যটা নিজেরই এত পছন্দ হয়ে গেল যে মুখে আরেকটু হলে বলেই ফেলছিল, এমন সময় হাত তুলে ওকে থামাল অগ্নি।

'দেখ যুবক,' ঠান্ডা কণ্ঠে উত্তর দিল সে। 'তোমার কাছে আমাদের রীতি যেমন অবাক লাগছে। আমার কাছেও তোমার রীতি অবাক লাগছে। আমাদের এক যোদ্ধার সঙ্গে লড়তে চাইছ তুমি। বলছ, যে জিতবে, সে-ই সঠিক। এটা কী করে হয়? মনে করো, তুমি আমাদের কাছ থেকে কিছু একটা চুরি করেছ। কিন্তু আমাদের কোনো যোদ্ধা তোমার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখে না। তাহলে তো এমন ধরনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সব সময় তোমারই জিত হবে। ব্যাপারটা তো ঠিক সভ্য মানুষের মতো আচরণ হলো না। জোর যার, মুল্লুক তার হয়ে গেল!'

তোমাদের কেউ দাঁড়াতে পারবে না বলেই তো দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চাইছি, মনে-মনে ভাবল ওয়াজেথ। এখানে আসার পর, লাঠি-বর্শা ছাড়া আর একটাও অস্ত্র দেখেনি ও। তাই মোটামুটি নিঃসন্দেহ, লড়াইয়ে নামলে নিজের উন্নত রণ কৌশল দিয়ে হারিয়ে দিতে পারবে যে কাউকে। এজন্যই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাবটা দিয়েছিল ও।

'যেহেতু আমার জানটাই মৃত্যুর মুখোমুখি, তাই আমার রীতিটা অনুসরণ করলেই ভালো হতো না?' মিন মিন করে বলল সে।

হেসে ফেলল অগ্নি। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।' মহিলার নিজের কাছেও অপরিচিতকে দেখা মাত্র মেরে ফেলার এই নীতিটা বড়ো বর্বর মনে

হয়। তাই ভাবল, দেওয়াই যাক না একটা সুযোগ। 'যদি হেরে যাও, তাহলে কী হবে?'

'মৃত্যু,' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল যুবক। 'কিন্তু যদি জিতে যাই, তাহলে কী হবে?'

ওয়াজেথের বেয়াদবিতে খ্যাপে উঠল শুভঙ্কর। হারামি ছেলেটা ভাবছে–জিতে যাবে! মনে-মনে ভাবল সে। দাবড়ানি দেবার জন্য মুখ খুলতে যাবে, এমন সময় অগ্নি বলল, 'জিতলে আমাদের গোত্রের একজন পরিপূর্ণ সদস্য হিসেবে মেনে নেওয়া হবে তোমাকে। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হবে গোত্রের সব নিয়ম-কানুন।'

'পরিপূর্ণভাবে?' পূর্ণ দৃষ্টিতে কমনীয় সেই মেয়েটার দিকে তাকাল ও। ছেলেটার মনের কথা বুঝতে কোনো কষ্টই হলো না উপস্থিত কারও। সবার মনোযোগ নিজের দিকে টের পেয়ে, লাল হয়ে উঠল মেয়েটার গাল।

'পুরোপুরিভাবে।' নিশ্চয়তা দিল যেন অগ্নি। 'ভালো কথা, যেহেতু দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব তুমি দিয়েছ, তাই অস্ত্র আমাদের যোদ্ধা পছন্দ করবে। নাকি বলো?'

হাঁ হয়ে গেল ওয়াজেথ, এরা যে এমন একটা ফাঁদে ফেলবে, সেটা বুঝতেই পারেনি!

'ওহ হ্যাঁ, আমাদের যোদ্ধা কে, সেটাই তো বলা হয়নি।' মুচকি হাসি হেসে বলল অগ্নি। স্ত্রী'র কথা শুনে এক পা এগিয়ে এলো শুভঙ্কর। জানে, সারা উরগ গোত্রে ওর চাইতে দক্ষ যোদ্ধা পাওয়া যাবে না। অস্ত্র হিসেবে কী নেবে, তা-ও ঠিক করে ফেলেছে। মাছ মারার বর্শা।

কিন্তু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই অগ্নি বলে উঠল, 'তোমার প্রতিপক্ষ হচ্ছে আমার মেয়ে, পদ্মা।' আঙুল দিয়ে যে মেয়েটির দিকে

তাকিয়ে ছিল ওয়াজেথ, তাকে দেখিয়ে দিল সে।

ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল উপস্থিত সবাই। বলাবলি করছে, গোত্র-প্রধানের মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো!

কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল শুভঙ্কর আর ওয়াজেথ। অর্থটা কান থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছাতেই, হো হো করে হেসে উঠল দুজনেই। পরক্ষণেই হাসি বন্ধ করে একে-অন্যের দিকে চোখ গরম করে তাকাল।

স্ত্রী'র দিকে এগিয়ে গেল শুভঙ্কর। 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? এই হাট্টা কাট্টা জোয়ানের সঙ্গে আমাদের ছোট্ট মেয়ে–' আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল হয়তো তার, কিন্তু অগ্নির চোখ থেকে বের হওয়া অগ্নিগোলক দেখে চুপ করে গেল।

'কেন? আমাদের মেয়ে কী গোত্রের ভবিষ্যৎ প্রধান নয়? তোমাকে কী আমি বিয়ের আগে বহুবার অস্ত্র যুদ্ধে হারাইনি? ভুলে গেলে, আমাকে হারাতে এসে উলটো নিজেই হেরে গিয়েছ কতবার?'

উরগ গোত্রের নিয়ম এটা, যখন একজন পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে, তখন তারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে উপনীত হয়। ছেলেটা জিতলে, মেয়ে তাকে স্বামী হিসেবে মেনে নেয়। আর মেয়ে জিতলে ছেলের জীবন চলে যায় তার হাতে। মেরে ফেললেও কারও বলার কিছু নেই, বিয়ে করলেও বলার কিছু নেই। আর যদি কোনোটাই না করে আজীবন দাস বানিয়ে রাখে, তাহলেও বলার কিছু নেই। এ কারণেই পদ্মার বয়স ষোলো পার হয়ে সতেরো ছুঁই ছুঁই করা সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত কেউ ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি।

হার মেনে পিছিয়ে এলো শুভঙ্কর। এদিকে মায়ের আদেশ শুনতে পেয়ে, ধীর পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পদ্মা।

‘বলো, হে উরগের প্রতিনিধি যোদ্ধা,’ আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বলল অগ্নি। ‘কোন অস্ত্র বেছে নিয়েছ তুমি? আর ফলাফলই বা নির্ধারণ করবে কীভাবে? আমৃত্যু নাকি কেউ একজন হার মেনে না নেওয়া পর্যন্ত? তবে মনে রেখ, যেহেতু এটা সাধারণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নয়, তাই তুমি জিতলেও এই যুবকের ওপর কর্তৃত্ব পাবে না। তবে হ্যাঁ, এরপর যদি মৃত্যু কূপ বা বাঘের গুহা থেকে ফিরে আসতে পারে সে, তবে তোমার দাস হয়ে থাকবে আজীবন। রাজি আছ?’

দুই যোদ্ধার দিকেই এক সেকেন্ড করে তাকাল সে। দুজনে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, আপত্তি নেই।

এরপর সুমিষ্ট কণ্ঠটা শুনতে পেল ওয়াজেথ, যে কণ্ঠটা শোনার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছে। ‘লাঠি। আর লড়াই চলবে কেউ একজন হার মেনে নেওয়ার আগ পর্যন্ত।’

‘তথাস্তু।’ বলে আয়োজন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিল অগ্নি।

*

এক ঘণ্টা পর, উরগ গোত্রের পদ্মা আর মিশরীয় ওয়াজেথ সামনা-সামনি হলো দ্বন্দ্ব যুদ্ধে।

দুজনের হাতেই শোভা পাচ্ছে তেল চিকচিকে কাঠের লাঠি। অতি দক্ষ ভঙ্গিতে লাঠিটা নাড়াচাড়া করছে ওয়াজেথ। মিশর-পারস্য-চম্পক, তিন জায়গাতেই লাঠি খেলা খেলেছে অনেক। আত্মবিশ্বাস আছে, সহজেই হার মানাতে পারবে পদ্মা নামের এই সুদর্শনাকে।

এদিকে পদ্মার মাঝে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, এমনকী দেখছেও না ওর দিকে তাকিয়ে। নিজের পরিধেয় আর অস্ত্রটার ভারকেন্দ্র বুঝে

নেওয়ায় ব্যস্ত।

অগ্নি নির্দেশ দিতেই দুই যোদ্ধা মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। দুজনের উচ্চতার মাঝে প্রায় আধ-ফুটের তফাৎ। মুচকি হাসি খেলে গেল মিশরীয় যুবকের মুখে, নিজের জয়ের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত।

'শুরু,' বলেই লাফিয়ে একপাশে সরে গেল অগ্নি।

শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র, সামনে এগিয়ে এলো ওয়াজেথ। এক হাতে লাঠির নিচের দিক আর অন্য হাতে মাঝখানটা ধরে রেখেছে। পদ্মাকে আক্রমণে যাবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না ও। ডান হাত দিয়ে লাঠির নিচের দিকটা ধরেছিল ওয়াজেথ, এবার বাম হাত দিয়ে মাঝখানে জোরের সাথে নামিয়ে আনল উলম্বভাবে।

ভেবেছিল, এক আঘাতেই ধরাশায়ী করে দিবে মেয়েটাকে। কিন্তু না! আশ্চর্য দক্ষতায় মাথার ওপর লাঠিটা ধরে আঘাত ঠেকিয়ে দিল সে। তবে ওয়াজেথ আশা করেছিল ব্যাপারটা, শুধু-শুধু তো আর যোদ্ধা এক জাতি এই মেয়ের হাতে অস্ত্র তুলে সামনে নামিয়ে দেয়নি, তাই না? তাই এবার ডান হাতটা লাঠির একটু ওপরে নিয়ে এসে নিচ থেকে আঘাত হানল। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই মারটাও ঠেকিয়ে দিল মেয়েটা। ওস্তাদ লাঠিয়াল মনে হচ্ছে, মনে-মনে ভাবল ওয়াজেথ।

তবে তাই বলে আক্রমণ থামায়নি। সামলে নিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে লাঠিটা কাত করে নিয়ে এলো পদ্মার দিকে। পদ্মা আগেই ধারণা করতে পেরেছিল ব্যাপারটা। তাই নিজেও পাশ থেকে আঘাত করে ওয়াজেথের আক্রমণ ঠেকাল।

মওকা বুঝে এক পা পিছিয়ে এলো ওয়াজেথ, শরীরের মাঝখানে নিয়ে এলো লাঠিটাকে, সোজা চালিয়ে দিল পদ্মার পাকস্থলী বরাবর।

আঘাতটা ছিল দারুণ শক্তিশালী। লাগলে এমনকি মারাও যেতে পারত বেচারি মেয়েটা। কিন্তু কমবয়সি চটপটে শরীরটা তার খেল দেখাল, এক পা পিছিয়ে গেল সে। লাঠি দিয়ে আলতো করে সরিয়ে দিল আক্রমণটা।

এক মুহূর্তের জন্য তাল হারিয়ে ফেলল ওয়াজেথ, পরক্ষণেই সামলে নিলো নিজেকে। ভাগ্য ভালো, আঘাত প্রতিহত করার জন্য পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল পদ্মা। নয়তো এই এক মুহূর্তের অসাবধানতার মাসুল ওকে গুণতে হতো মাটির আলিঙ্গনে আশ্রয় নিয়ে!

নিজের দক্ষতা আর শক্তির ওপর বেশ ভরসা আছে ওয়াজেথের। জানে, শক্তির লড়াইয়ে এই কমনীয় দেহের ছোট্ট বালিকা ওর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। তাই প্রতিপক্ষকে সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়ে আগে বাড়ল সে, কোপ বসাল আড়াআড়িভাবে। আশা ছিল, মেয়েটা আগের বারের মতোই নিজেও কোপ দিয়ে আঘাত প্রতিহত করবে।

হলোও তাই, আর এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল ওয়াজেথ। গায়ের জোর খাটিয়ে পদ্মার লাঠিটা নামিয়ে আনল মাটিতে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মেয়েটা। ওয়াজেথ বুঝতে পারল, বাগে পেয়েছে শত্রুকে।

প্রশিক্ষণ বলে, এসময় শত্রুর মাথা বরাবর দেহের সর্বশক্তিতে আঘাত হানা উচিত। আজীবন তা করেও এসেছে যুবক। কিন্তু সুন্দরী মেয়েটার মাথায় আঘাত হানলে চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে–এ কথা ভেবে ইতস্তত করল এক মুহূর্ত। এই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট পদ্মার জন্য। ভারসাম্য ঠিক করে নিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ল সে।

সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছে, বুঝতে পেরে নিজের ওপরেই খ্যাপে উঠল ওয়াজেথ। আর না, অনেক হয়েছে, ভেবে পাশ থেকে লাঠি নামিয়ে আনল পদ্মার পা বরাবর। কিন্তু পদ্মা কী আর আঘাত সহ্য করার জন্য বসে আছে? লাফিয়ে উঠে আঘাতটা এড়াল ও।

এতক্ষণে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওয়াজেথ। দেহটাকে পাক খাইয়ে আঘাত হানতে চাইছিল ও। পুরো পাক শেষ না করেই লাঠি চালিয়ে দিল পদ্মার দেহের মাঝ বরাবর। আয়েশের সাথে আঘাতটা নিজ লাঠির পাশ দিয়ে থামিয়ে দিল মেয়েটা।

চমকে উঠল ওয়াজেথ। বুঝতে পারল যে শক্তির গর্বে অন্ধ হয়ে ছিল ও, সেটাকে চটপটে দেহ দিয়ে সহজেই হার মানাচ্ছে পদ্মা! মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ করতে লাগল সে। কিন্তু একটাও কায়দামতো হলো না বলে আলগোছেই সবগুলো পাশ কাটাতে সক্ষম হলো মেয়েটা। এমনকী ওগুলো ঠেকাতে লাঠি ব্যবহার করার প্রয়োজনটাও পড়ল না।

আস্তে-আস্তে হাঁপাতে শুরু করল ওয়াজেথ, বিগত কয়েক দিনের ক্লান্তি যেন আবার ভর করতে শুরু করেছে ওর দেহে। ভেবেছিল, কয়েকদিনের বিশ্রাম পেয়ে আগের মতো হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা যে হবার নয়, আঁচ করতে পারেনি।

যুবকের রক্ষণে ফাঁক দেখতে পেয়ে আক্রমণ হানতে শুরু করল পদ্মা। ওর আঘাতগুলো খুব বেশি ভারী না হলেও, সেগুলো আটকাতেই হিমশিম খেতে হলো ওয়াজেথকে। পদ্মার ওপর দিয়ে উলম্বভাবে নামিয়ে আনা একটা আঘাত ঠেকাতে গিয়ে, নিজের লাঠিটাকে আনুভূমিকভাবে মাথার ওপরে ধরতে হলো ওর। কিন্তু আফসোস, দূরত্বটা আন্দাজ করতে ভুল হয়ে গিয়েছে। মেয়েটা যে ওর চাইতে ইঞ্চি ছয়েক ছোটো, মরিয়া হয়ে সেটা ভুলেই বসেছিল ওয়াজেথ। পদ্মার ফাঁদে পা দিয়ে বসল ও, মেয়েটার লাঠি ওর লাঠিতে হালকা স্পর্শ করে নেমে এলো মাটিতে।

পরের মারটা যে ওর পাকস্থলী বা গলা বরাবর হবে, সেটা আঁচ করতে পারছিল ওয়াজেথ। কিন্তু না নড়ার মতো সময় আছে, আর না লাঠি নামিয়ে আনার মতো। তাই যা হবার তাই হলো, পাকস্থলীতে

তীব্র একটা খোঁচা খেয়ে ককিয়ে উঠল ও। ব্যথায় চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, দম নিতে কষ্ট হলো বেচারার।

ঠিক তখনই, পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওয়াজেথের কাছে। কোনো এক জঙ্গলি গোত্রের, সতেরো বছর বয়সি অবলার মুখোমুখি দাঁড়ায়নি ও। দাঁড়িয়েছে লাঠি খেলায় ওর ওস্তাদদের চাইতেও দক্ষ এক মেয়ের সামনে।

পরের দুটো মিনিট যেন এক বিভীষিকা! একের পর এক মার খেয়ে কাতর হয়ে পড়ল ওয়াজেথ। কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়ল না। পদ্মাও যেন মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথম মিনিটটা ইঁদুর-বিড়াল খেলার মতো করে কাটল। এরপর যেন মায়া করেই যুদ্ধ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

এতক্ষণ ধরে নানা কসরত দেখিয়ে এসেছে মেয়েটা। আঘাত হেনেছে ওয়াজেথের দেহের এখানে সেখানে। এবার মাথা লক্ষ্য বানাল। পাশ থেকে কয়েকটা আঘাত হেনে শুরু করল আসল আক্রমণ। প্রথম আঘাতটা নিজের লাঠি আনুভূমিকভাবে রেখে সহজেই ঠেকাল ওয়াজেথ। দ্বিতীয় আঘাতটাও ওদিক দিয়েই আসতে দেখে প্রস্তুত করে নিলো নিজেকে।

কিন্তু না, দক্ষতার খেল দেখানো বাকি ছিল পদ্মার। ওর লক্ষ্য যে আসলে ওয়াজেথের মাথা নয়, আঙুলের গাঁট, তা বুঝিয়ে দিল দ্বিতীয় আঘাতেই। ওয়াজেথের মনে হলো, পাঁচ মণ ওজনের পাথর যেন নেমে এসেছে ওর হাতের ওপর। সাথে-সাথে আত্মরক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনল সে। এতক্ষণ শক্ত মুঠি করে ধরে ছিল লাঠিটাকে। এরপরের আক্রমণটা ঠেকানোর সময় খুলে ফেলল মুঠি।

এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল পদ্মা। মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ধরা লাঠিকে নিচ থেকে আঘাত হেনে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু মুষ্টি খোলা

থাকলে তা একেবারেই সহজ। তাই ওপর থেকে আঘাত হানল সে। যা ভেবেছিল, নিজের লাঠি দিয়ে ঠেকাল সেটা ওয়াজেথ। পরক্ষণেই, লাঠির নিচের অংশ দিয়ে সর্বশক্তিতে ওপরের দিকে আঘাত করল ও ওয়াজেথের লাঠিতে। দুর্বল ওয়াজেথ ধরে রাখতে পারল না লাঠিটা। উড়ে বনের ভেতর পড়ল তার অস্ত্র।

কালক্ষেপণ না করে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল ওয়াজেথ।

লড়াই শেষ!

*

দুই যোদ্ধাকে নিয়ে আসা হলো অগ্নির সামনে। পরাজিত ওয়াজেথ মাথা নিচু করে আছে। এখনও ওর বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে এত সহজে হেরে গিয়েছে ও!

'তাহলে এবার,' মুচকি হেসে বলল অগ্নি। 'বীর মিশরীয় যোদ্ধা। হেরে তো গেলে, মৃত্যুর জন্য এখন কোন পন্থা বেছে নিতে চাও? বাঘের গুহা, নাকি মৃত্যুকূপ?'

বাঁচার উপায় খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাল ওয়াজেথের মস্তিষ্ক। কিন্তু না, কোনো উপায় এলো না মাথায়। এদিকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে উরগের সদস্যরা। একটু গোলমাল দেখতে পেলে হয়তো আর অপেক্ষা করবে না। এখানেই মেরে ফেলবে।

'স...সাপের গর্ত।' কোনোক্রমে বলল ও।

'বেশ, তাহলে আজরাতে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে সাপের গর্তে। ঢেকে দেওয়া হবে সুন্দরীর পাতা আর গোল পাতা দিয়ে। যদি সারা

রাত ওখানে থাকার পরও সকালে বেঁচে থাকো, তাহলে আমরা ধরে নেব যে তোমার ওপরে দেবতাদের রয়েছে অসীম অনুগ্রহ।'

'আর...আর যদি বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে?' জানে অসম্ভব ব্যাপারটা। কিন্তু তাই বলে আশা করতে দোষ কী? এর আগে কী দেবী ওয়াজেঠথ ওকে অগণিত বিপদ থেকে মুক্ত করেননি? হয়তো এবারও করবেন!

'তাহলে আর কী?' হাত দিকে পদ্মাকে দেখাল অগ্নি। 'তুমি আমার মেয়ে পদ্মার দাস হিসেবে কাটাবে বাকি জীবন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াজেথ। মারা গেলে তো গেলই, যদি বেঁচেও থাকে, তাহলে কপালে জুটবে দাসত্ব। তবে তা জুটুক, অন্তত পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস তো নিতে পারবে!

*

মাঝরাত।

বেচারা ওয়াজেথের দেহ থেকে কেবলমাত্র নেংটি বাদে আর সবকিছুই খুলে নেওয়া হয়েছে। হাজার অনুরোধ করেও দেবী ওয়াজেঠথের মূর্তিটা নেবার অনুমতি মেলেনি। উরগ গোত্রের নিয়মই নাকি এটা। কোনো কিছু ছাড়া ঢুকতে হয় কূপের বা গুহার ভেতর।

রাতের খাবারটা বেশ সুস্বাদু হলেও, বলতে গেলে কিছুই মুখে তুলতে পারল না ওয়াজেথ। রুচি নেই এক বিন্দু।

রওনা দিতে হবে মাঝরাতে। তার আগে একটু ঘুমিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়ার জন্য একা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওকে। কিন্তু যার হাতে

রয়েছেই আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, সে কীভাবে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করবে?

আচমকা বাইরে থেকে আসা হইচইয়ের আওয়াজে চমকে উঠল যুবক। জীবন এ কোন নতুন চমক নিয়ে এলো ওর জন্য?

‘আমি ওর মনিব। নিজের দাসের সঙ্গে দেখা করার অধিকার আমার আছে।’ সুমিষ্ট একটা কণ্ঠ ভেসে এলো দরজার ওপাশ থেকে।

‘কিন্তু...’

‘কিন্তু-টিন্তু আবার কী? আমি কে, তা তুমি জানো না?’ দৃঢ় কণ্ঠ মেয়েটার।

প্রহরী নিশ্চয়ই হার মেনেছে, কেননা এক মুহূর্ত পর ভেতরে প্রবেশ করল পদ্মা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ একে-অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল দুই নর-নারী। কথা বলার দরকার পড়ছে না, ওদের ভেতরে যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক এরইমাঝে গড়ে উঠেছে তা বিনা বাক্য ব্যয়েই দুজনের কাছে পরিষ্কার।

হঠাৎ এক হাত ওয়াজেথের দিকে বাড়িয়ে দিল পদ্মা। ‘শুনলাম তুমি চাইছিলে?’ হাতের মুঠি খুলতেই দেখা গেল, ওতে শোভা পাচ্ছে ওয়াজেথের সব সময়কার সঙ্গী সেই মালা তিনটা।

‘আমি তোমার সাফল্যের জন্য মা মনসা আর বাবা দক্ষিণ রায়ের কাছে প্রার্থনা করব। তবে মালা তিনটা বাইরে যেন না থাকে। নেংটির মাঝে রেখ।’

স্মিত হাসি হাসল ওয়াজেথ, সেই হাসিতে লুকিয়ে ছিল দুঃখ।

প্রেমের দেখা পেল অবশেষে।

কিন্তু সেই প্রেমের কাছে ফিরতে পারবে কিনা, কে জানে!

*

পদ্মার পায়চারী দেখার মতো। কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলে তাকিয়ে নেই ওর দিকে।

সারারাত অনেক দুশ্চিন্তার মাঝে কেটেছে বেচারির। উঠতে বসতে নিজেকেই বকতে মন চাচ্ছে ওর। হেরে গেলেই বা এমনকী অসুবিধা হতো? ওর তো আর কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু বেঁচে যেত মিশরীয় ওই যুবকটা। অথচ...

সূর্য ওঠার আর বেশি বাকি নেই, কে জানে যুবক ফিরতে পারবে কিনা। না পারলে আফসোসের সীমা থাকবে না ওর।

*

রাত খুব একটা খারাপ কাটেনি ওয়াজেথের। ওকে যে কুটিরে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে খানিকটা দূরেই অবস্থিত মৃত্যুকূপ নামে খ্যাত জায়গাটা। দুই মানুষ গভীর গর্তটা সাপে পূর্ণ। আস্তে করে ওকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। ওপর দিয়ে ঢেকে দিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরীরা।

গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াজেথ। নড়া তো দূরের কথা, শ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে সে। রাতের বেলা বিড়ালের মতো সাপের চোখ জ্বলজ্বল করে বলে শুনেছিল বটে, কিন্তু এখন দেখছে–কথাটা মিথ্যা!

সত্য হলেও হয়তো শান্তি পেত কিছুটা। মানুষকে বনের বাঘের চাইতে মনের বাঘ খায় বেশি। চোখের সামনে সাপের অবস্থান দেখলে হয়তো কখন কামড় দিয়ে বসে, এই ভয় থেকে মুক্ত হতে পারত। এখন তো মনে হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো দিক থেকে আসতে পারে কামড়।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল প্রায়।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব মতে সেটাকে অবশ্য পাঁচ ঘণ্টাও বলা চলে। বিজ্ঞানী বলেছিলেন, মানুষ যখন অপছন্দের কাজ করে, তখন সময় আস্তে চলে। মৃত্যুকূপে দাঁড়িয়ে সাপের কামড়ে মরার অপেক্ষা করাটা নিশ্চয়ই কারও পছন্দের হতে পারে না!

আচমকা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পূর্ণ চাঁদ। বনজোছনার আলোতে চন্দ্রাহত শত শত সাপ দেখতে পেল ওয়াজেথ।

চন্দ্রাহত না বলে উপায় কী? চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবগুলো। মনে হচ্ছে যেন কোনো আলোচনা সভার মধ্যমণি ওয়াজেথ, আর সাপগুলো সেই সভার অভ্যাগত। ফণা তুলে মন দিয়ে শুনছে যুবকের কথা।

মানে মানে কোমরে হাত বুলাল ওয়াজেথ। নেংটির ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল মালাগুলোকে। প্রহরীদের নজরে পড়লে এগুলোকেও নিয়ে নিত তারা। একটা মালা বের করে মনে-প্রাণে কখন যে মনসাকে ডাকতে শুরু করেছে–জানেই না সে।

আরও কিছুক্ষণ চাঁদের আলো পড়ল গর্তে...আরও কিছুক্ষণ নিশ্চিত মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো বেচারাকে।

তারপর অন্ধকার। নিকষ কালো অন্ধকারে শিউরে উঠল ওয়াজেথ। আবার ওকে ঘিরে ধরেছে অজানার ভয়। আচমকা পায়ের সাথে ঠান্ডা

কিছু একটার স্পর্শ পেল সে।

নড়ছে ওটা!

সাপ! সাপ এসে গা ঘষছে ওর দেহের সাথে!

আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেল ওয়াজেথ। সর্প দেবীকে উপাস্য বানিয়েছে বটে, কিন্তু মানবজাতির সাপকে ঘৃণা করার বোধটা লুকাবে কী করে। গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। একবার ভাবল, লাথি মেরে সরিয়ে দেয় ওটাকে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলো।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আঁশ!

আচমকা আরও এটা ঠান্ডা দড়ির মতো স্পর্শ অনুভব করল ও, এবার অন্য পায়ে। তারপর আরেকটা...তারপর আরেকটা...

কয়েক মিনিটের মাঝেই নিজের সারা দেহে ঠান্ডা সর্প শরীরের স্পর্শ টের পেতে শুরু করল ওয়াজেথ।

আর পারল না বেচারা, মোচড়া-মুচড়ি করতে শুরু করল ওর দেহ। একটু নড়েই চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। জানে, এখনই এসে আঘাত হানবে মরণকামড়।

আচ্ছা, খুব বেশি ব্যথা করবে না তো?

মনে-মনে এক নতুন প্রার্থনা করতে শুরু করল ও। হে মনসা, আমাকে দ্রুত মৃত্যু দিন। অর্জুনের মতো ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু আমি চাই না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সাপের ছোবল খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। যা হয়, তা যেন দ্রুতই হয়।

কী আশ্চর্য! একে-একে কেটে গেল স্নায়ু-বিধ্বংসী অনেকগুলো মিনিট। কিন্তু একটা ছোবলও বসল না ওর দেহে।

অবশ্য কমল না শীতল দেহের চাপও।

সাহস পেয়ে আরেকটু নড়তে শুরু করল ওয়াজেথ। একটু নড়ে, তারপরেই থমকে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর বুঝতে পারল, এই সাপগুলো ওর দেহ স্পর্শ করেই সন্তুষ্ট। তাদের ওকে কামড় দেবার কোনো ইচ্ছা নেই।

মাঝরাতে কূপে নামতে হয়েছে ওকে। তার আগে অদ্ভুত এক গল্প শুনেছে। অনেক কাল আগে নাকি এখানে ছিলেন এক সাধু। গোত্রের যাবতীয় ধর্মীয় কাজ তিনিই করতেন। মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন, আরেকজন সাধু আসবেন। তাকে দেখে সাধু মনে হবে না। কিন্তু সর্প দেবীর খাস লোক হবেন তিনি। তাকে কোনোদিন সাপ কামড়াবে না। ওদেরকে সেই সাধু গৃহপালিত পশুর মতোই বশ করতে পারবেন। তিনি এলে, তার আদেশ পালন করতে হবে সবাইকে। নইলে ধ্বংস অনিবার্য।

অনেকক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল যুবক। মনে-মনে দেবীর কৃপার সামনে বার-বার মাথা নত করছে। মা মনসা তাকে শুধুই বাঁচাননি, নিজের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে সম্ভবত মনোনীতও করেছেন।

অপেক্ষার রাত ফুরিয়ে এলো ধীরে-ধীরে। পূর্ব দিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ওপরে ছাওয়া পাতা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে সেই আলো।

অবশেষে ফুরোল ওয়াজেথের জীবনের ভয়াল কালো অথবা অসাধারণ ভালো রাতটা।

*

সকাল হতেই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ল গোত্র জুড়ে। এক বিদেশি এসে সারারাত মৃত্যুকূপে কাটিয়ে দিয়েছে, ভাবা যায়! বহুদিন আগের সেই ভবিষ্যদ্বাণী এবার সত্য হতে চলেছে। উরগ গোত্র পেয়েছে তার পুরোহিতকে।

পদ্মা আর ওয়াজেথ দাঁড়িয়ে আছে অগ্নির সামনে। দুজনের নজরই নিচের দিকে।

'তাহলে, মিশরীয় যুবক।' হাসতে হাসতে বলল অগ্নি। 'বেঁচে আছ দেখছি।'

'জি, মহামান্য।' ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাল যেন ওয়াজেথ।

'মহামান্য!' অবাক হয়ে গেল অগ্নি। তবে কথা বাড়াল না। 'বেঁচে ফিরেছ বটে, কিন্তু এরপর কী হবে তা বুঝতে পারছ?'

'অবশ্যই, মহামান্য।'

'এখন তুমি আমার কন্যা, পদ্মার দাসানুদাস। ওর ইচ্ছাই এখন তোমার জন্য আদেশ। তোমাকে আমরা পুরোহিত হিসেবে মেনে নেব কিনা, তা এখানে গৌণ।'

পাশে দাঁড়ান মেয়েটার দিকে আড়চোখে এক পলক তাকাল ওয়াজেথ। 'জি, মহামান্য।'

হেসে ফেলল অগ্নি, সেই হাসির অর্থ বুঝতে পেরে লাল হয়ে গেল পদ্মার গাল।

নয়

ছটফট করতে-করতে রাত কাটাল রাফসান।

গতকাল বিকাল পর্যন্তই যা কিছুটা কাজ হয়েছে, তারপর এক এক ফোঁটাও এগোয়নি তদন্ত। বৃথাই এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করেছে। উমার ব্যক্তিগত উকিল ছিল, সে ব্যাটা আবার শুক্রবার ছুটিতে থাকে। হাজার ফোন করেও তাকে পাওয়া যায় না। তাই লোকটার কাছে কিছু থেকে থাকলেও, জানার জন্য একদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

রাতটা তাই বলতে গেলে নির্ঘুম কাটিয়েছে রাফসান।

পরের দিন সকালে, সূর্যের আলো ফোটার সাথে-সাথে আবার কাজে নেমেছে ও। কাজে বলতে শিহানের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটাকে ডেকে তোলা। ঘুম-ঘুম চোখে যখন নাস্তা করতে বসেছে শিহান, তখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে। এত সকালে কোথাও যেয়ে যে লাভ হবে না, তা রাফসানকে বুঝিয়েছে ও।

নিমরাজি হয়ে তাই খেতে বসেছে রাফসান।

নাস্তা শেষ হবার সাথে-সাথে আবার শুরু করেছে তাড়া। সকাল নয়টার আগেই সি.ডি.আর.সি.র অফিসে দেখা গেল ওদের। বেশ কিছুক্ষণ এখানে-সেখানে খোঁজার প্রয়াস পেল রাফসানরা। কিন্তু এগারোটার দিকে হাল ছেড়ে দিল শিহান। রাফসানকে অফিসে রেখে, মারুফ স্যারকে রিপোর্ট করার অজুহাত দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

আরও কিছুক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে রইল রাফসান। বারবার দেখছে উমার মেইলগুলো। কিন্তু হাজারবার পড়েও আগা-মাথা ধরতে

পারছে না।

বিকালের দিকে তাই হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে শুরু করল। সামনের কয়েকদিন দম ফেলার ফুসরত পাওয়া যাবে না, তাই আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে চায়। কাজে এমন তন্ময় হয়েছিল যে কখন ওর বস চলে এসেছেন, তা টেরই পায়নি!

'এখনও বসে আছ?' জানতে চাইলেন সাজিদ রহমান।

'হ্যাঁ, সাজিদ ভাই।' উত্তর দিল রাফসান। 'আর তো কোনো উপায় দেখছি না।'

'অগ্রগতি হয়েছে কিছু?'

'অল্পই।' বলে নিয়তির সাথে হওয়া আলোচনা পর্যন্ত সব জানাল রাফসান। যতটা না ভদ্রলোককে জানাবার জন্য, তারচাইতে বেশি নিজের মনে গুছিয়ে নেবার জন্য। অনেক সময় সমস্যা বারবার মুখে বললে, অন্যরকম একটা সমাধান বেরিয়ে আসে...সেই আশাতেই করল কাজটা।

'বুঝতে পারলাম,' বললেন সাজিদ রহমান। 'আমি যে কোনো পরামর্শ দেবো, তা-ও পারছি না। অবশ্য কনভেনশনের অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্বে যিনি আছেন, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওদিক থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

'গেলে তো খুবই উপকার হয়, ভাই।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাফসানের মুখ। 'জানাবেন কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে।'

'অবশ্যই,' অভয় দিলেন সাজিদ রহমান। 'তুমিও নতুন কিছু জানতে পারলে জানিয়ো। আমার সুবিধা হবে।' আরও কিছু কথা বলে বিদায় নিলেন তিনি।

মলিন হাসি হাসল রাফসান।

সবাই দেখি কেসের অগ্রগতি জানতে চায়, তা কিছু হলে তো জানাব!

সাজিদ রহমানের সাথে কথা বলা মাত্র, প্রীতম চক্রবর্তীর কথা মনে হলো ওর। হাতে তুলে নিলো মোবাইল, নম্বর আছে ওর কাছে; আগের দিনই নিয়ে নিয়েছে। ফোন করবে? করেই বা লাভ কী? কী জানাবে একমাত্র মেয়ের বাবা, বৃদ্ধ লোকটাকে? এই যে, আমি ব্যর্থ? কোনো সূত্র বের করতে পারিনি?

বিরক্ত হয়ে মোবাইলটা পকেটে রাখতে যাবে, এমনসময় কাঁপতে শুরু করল ওটা।

একটাই শব্দ দেখা যাচ্ছে কলারের নামের জায়গায়–নিয়তি।

হতাশা ভুলে গেল রাফসান, কাঁপা-কাঁপা হাতে ফোন রিসিভ করে কানে ঠেকাল।

‘ডা. রাফসান?’ মেয়েটার মিষ্টি কণ্ঠ শুনতে পেল ও।

‘বলছি, মিস নিয়তি।’

‘আপনি নম্বর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে নতুন কিছু মনে পড়লে যেন জানাই।’ এক নাগাড়ে বলে গেল মেয়েটা। ‘নতুন কিছু মনে পড়েনি। তবে একটা ঘটনা ঘটেছে। বিকালের দিকে একটা ফোন এসেছিল মোবাইলে। রিসিভ করা মাত্র জানানো হলো, আমার নাকি একটা কুরিয়ার এসেছে। বাসায়ও নাকি গিয়েছিল, ফোন দিয়েছে। কিন্তু তখন স্কুলে ছিলাম বলে রিসিভ করতে পারিনি। যাই হোক, গিয়ে নিয়ে এলাম কুরিয়ারটা।’ বলেই চুপ করে গেল সে।

‘হুম, তারপর?’ কয়েক সেকেন্ড পর কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে বলল রাফসান।

‘কুরিয়ারটার প্রেরকের জায়গায় উমার নাম লেখা!’ বোম ফাটাল যেন নিয়তি!

*

নিজের কান এবং সৌভাগ্য, কোনোটাকেই বিশ্বাস হতে চাইছে না রাফসানের। কোনো সূত্রই ছিল না হাতে। এখন শুনছে সূত্র নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে!

'খুলেছেন?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ।' জবাব পেল। 'ভেতরে একটা ডায়েরি দেখতে পেলাম। তবে পড়িনি।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি!' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল রাফসান। আচমকা মনে হলো, ডায়েরিটার জন্য কিছুটা হলেও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। 'আপনি একটা কাজ করতে পারবেন?' বলেই উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগ করল। 'পাশের বিল্ডিঙে দুই-একজন কনস্টেবল থাকার কথা। ওদেরকে গিয়ে বলবেন–'

কথা শেষ করার আগেই রাফসানকে থামিয়ে দিল নিয়তি। 'ওরা তো নেই। গতকাল বিকাল থেকেই দেখছি না।'

'নেই মানে?' অবাক হয়ে গেল রাফসান! এমন তো হবার কথা না। কেসের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে থাকার কথা পুলিশের। না হলেও কমপক্ষে আরও কিছুদিন তো থাকবেই।

'গতকালই না বললাম, এক সিকিউরিটি গার্ডের মৃত্যুর জন্য...'

'সিকিউরিটি গার্ড!' আঁতকে উঠল রাফসান। একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে ওর মনে।

'হুম, কেন? পেপার পড়েন না?'

‘পড়ি।’ নিজের সন্দেহের কথা আর বলল না রাফসান। ‘মিস নিয়তি, আপনার সুরক্ষার দরকার। আমি লোক পাঠাচ্ছি। একটু দেরি হতে পারে–’

‘দরকার নেই,’ আবারও ওকে থামিয়ে দিল নিয়তি, যেন মেয়েটার অভ্যাসই এই। ‘আমার বয়স যথেষ্ট, ঢাকা শহরে একা মেয়ে-মানুষ আমি। আন-আর্মড কমব্যাটের ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা আছে। আমার কিছু হবে না।’

রাফসানের ধারণা সঠিক হলে যে শত্রু অস্ত্র নিয়ে আসবে, তা আর বলল না মেয়েটাকে। বলে সম্ভবত লাভও হবে না, পাত্তাই দেবে না নিয়তি। তাই বলল, ‘সাবধানে থাকবেন। আমি লোক পাঠাচ্ছি, নিজেও রওনা হচ্ছি।’

বলেই ফোন রেখে দিল রাফসান, আবার বসে পড়ল কম্পিউটারের সামনে। এবার ব্রাউজার খুলে ঢুকে পড়ল প্রথম পাতা খবরের কাগজের ওয়েবপেজে। একটু ঘাঁটতেই পেয়ে গেল খুন হওয়া সিকিউরিটি গার্ডের নাম। ওটা একটা কাগজে টুকে নিয়ে ইন্টারকমে ফোন দিল সিকিউরিটিতে। নিরাপত্তা প্রধান, আজমল সাহেব এখনও থাকার কথা অফিসে। কাজের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, উমার হত্যাকাণ্ডটাকে হজম করতে পারছেন না। একবার রিং হওয়ার সাথে-সাথে ফোন তুললেন তিনি।

‘হ্যালো, রাফসান বলছি।’ সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো রাফসান। ‘আমাদের সিকিউরিটি গার্ডরা কোন সংস্থার?’

‘এস.ফর.ইউ.।’ উত্তর দিলেন আজমল।

‘সব গার্ডই?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোনো গার্ড কি বিগত কিছু দিন হলো বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত? বা কারও দুর্ঘটনা ঘটেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘নাম বলতে পারবেন? আমি হোল্ডে আছি।’

‘হোল্ডে থাকতে হবে না। আমার নাম মুখস্থ আছে।’

ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল রাফসানের শিরদাঁড়া বয়ে, সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে ওর সন্দেহ। ‘কেন?’

‘খুন হয়েছে একজন গার্ড।’

‘নাম কী ওর?’ প্রশ্নটা করার আগেই উত্তর আঁচ করতে পারছে রাফসান।

‘সানি।’

*

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি রাফসান, সাথে-সাথে ফোন দিয়েছে শিহানকে। আরেকটা প্রশ্ন করেছিল ও আজমল সাহেবকে। খুন হবার আগে, শেষ ডিউটিতে কী-কার্ড জমা দেয়নি সানি নামের ছেলেটা। এ কথা শোনার পর, আর দেরি করার সাহস হয়নি ওর।

সবার চোখে ধুলো দিয়েছে শত্রুপক্ষ। সানির হত্যাকাণ্ডকে ব্যক্তিগত বলে চালানো হয়েছে। আসলে ওই কী-কার্ডের জন্যই খুন করা হয়েছে ছেলেটাকে। বেকুব তদন্ত কর্মকর্তা তা ধরতে পারেনি।

সফল হয়েছে অজানা শত্রুর পরিকল্পনা।

আরেকজনকে সাথে নিয়ে, শিহানকে নিয়তির বাসায় চলে যেতে বলেছে রাফসান। বলেছে মেয়েটাকে পাহারা দিতে। নিজেও রওনা দিয়েছে তখুনি। কিন্তু কপাল মন্দ, মহাখালী থেকে বনশ্রী যাবার রাস্তা শনিবার ফাঁকা থাকার কথা। অথচ আজকেই কোনো এক মন্ত্রী যাচ্ছেন গুলশান দিয়ে। পুরা রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যেতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকেই।

আরও কমপক্ষে এক-দেড় ঘণ্টা লাগবে বনশ্রী পৌঁছাতে। ঘড়ির দিকে তাকাল রাফসান, সাড়ে ছয়টা বাজে। আটটা-সাড়ে আটটার আগে পৌঁছবে না ধরে নেওয়াই ভালো। ফোন বের করে মারুফ স্যারকে কল করল ও। সবকিছু জানাল। কী করতে চাচ্ছে, সেটাও বাদ গেল না।

ফোন রাখার আগ মুহূর্তে মনে পড়ে গেল প্রীতমের কথা। ছোট্ট একটা টেক্সট পাঠিয়ে দিল তাকে। জানাল, তদন্তের কিছু অগ্রগতি হয়েছে। আশা করা যায়, ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আসতে যাচ্ছে সামনে।

কাজ শেষে ফোন ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। এবার মন্ত্রীর পার হবার অপেক্ষা।

অধৈর্য রাফসানের ইচ্ছা হচ্ছে, গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চলে যায়!

কিন্তু না, হেঁটেও পার হতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে।

শালার কপাল, গাড়িতে বসে ফুঁসতে লাগল রাফসান।

*

সন্ধ্যা নেমেছে আরও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে। রাফসান যখন ফোন করেছে, তখন বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে শিহান। ফোন পেয়ে আর দেরি করেনি, এস.আই. জুয়েলকে নিয়ে রওনা দিয়েছে।

কথা ছিল, বাড়িতে বসে পাহারা দিতে হবে নিয়তি নামের মেয়েটাকে। কিন্তু কেন যেন মেয়েটার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা-বার্তা পছন্দ হয়নি শিহানের। তাই বাসার ভেতরে ঢোকার একদম ইচ্ছা নেই ওর। সেই সাথে আরও একটা চিন্তা এসেছে মাথায়।

সত্যি সত্যি যদি এই মেয়ে শত্রুর টার্গেট হয়ে থাকে, তাহলে বাড়িতে বসে না থেকে বাইরে থেকে নজর রাখলেই তো হয়। কোনো শত্রু এলে, টুপ করে ধরে নেওয়া যাবে।

তাই বাড়িটা থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি পার্ক করেছে ওরা। বনশ্রী বর্ধনশীল এলাকা। তবে এই ব্লকটা পেছনের দিকে, আর রাস্তাটাও এক মাথায় হওয়ায় আশপাশের এলাকা বেশ নির্জন। তারপর স্কুলের ঠিক পেছনেই বলে, দোকান-পাটও কম। বেশিরভাগ স্কুলের সামনেই। কয়েকটা প্লট তো এখনও ফাঁকাই পড়ে আছে।

'ভিতরে গেলেই ভালো হইত না?' প্রশ্ন করল জুয়েল। বুদ্ধির দিক দিয়ে একটু কমতি আছে বেচারার। তবে আদেশ পালনে জুড়ি নেই। বি.এ. পাশ করা নিয়েই টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। পরে কীভাবে কীভাবে যেন পাশ করে লোকটা, সহপাঠীদের মতে–নকল করে। মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে প্রথমে ঢোকে এস.আই. পদে। এরপর আরও মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে ঢাকায় চলে আসে। সিনিয়রদের আদেশ বেদবাক্যের মতো মান্য করে। তাই বাইরে বসে থাকাটা ওর ভালো লাগছে না।

'আরে ব্যাটা, মাথা একটু খাটা।' সমবয়সি ওরা দুইজন, তাই তুই-তোকারীর সম্পর্ক। 'এইখান থেকে নজর রাখাই তো ভালো। শয়তান

কেউ আসলে দেখা যাবে। এখন পর্যন্ত কেসের যে অবস্থা, তাতে এরচেয়ে ভালো সুযোগ তো পাব বলে মনে হয় না। ওই নিয়তি মেয়েটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।'

সায় জানাল জুয়েল, সম্ভবত কিছু বোঝেনি। কিন্তু বন্ধুর সামনে বোকা প্রতিপন্ন হতে চায় না। 'কিন্তু,' তারপরেও না বলে পারল না সে। 'যদি মাইয়াটার ক্ষতি হয়!'

বিরক্ত হয়ে গেল শিহান। 'কথা না বলে, নজর রাখ্। হাঁদারাম কোথাকার।'

বন্ধুর মেজাজ ভালো না টের পেয়ে, চুপ হয়ে গেল জুয়েল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরের কথা, অন্ধকার ভালোমতোই নেমেছে। আচমকা এদিকেই আসতে দেখা গেল একটা ছায়া অবয়বকে। নড়েচড়ে বসল পুলিশের দুই সদস্য। অবশেষে কী তাহলে মেওয়া ফলল? কিন্তু না, লোকটা সরাসরি ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সাদা একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে ওরা, পুলিশের গাড়ি আনেনি। ওদের পরনেও নেই উর্দি। তাই কিছুটা সতর্ক না হয়ে পারল না।

'হ্যালো ভাই,' জানালায় টোকা দিয়ে জানতে চাইল লোকটা। 'এই ঠিকানা কোথায়, বলতে পারেন?'

'নাহ, জানি না।' বিরক্ত শিহান না দেখেই উত্তর দিল।

'না দেখেই বললেন? একবার দেখে তো নিতেন।'

'বললাম না জানি না,' শিহানের কণ্ঠে এবার রাগ। 'অন্য দিকে যায়া জিজ্ঞেস কর্।'

'তুই-তোকারি করছিস ক্যান বে?' খ্যাপে গিয়েছে অচেনা লোকটাও। 'হ্যাডা বাড়ছে?'

আর সহ্য হলো না শিহানের। দুই দিন ধরে রাগে ফুঁসছে ওর ভেতরটা। এই কেসটাকে ক্যারিয়ার বানাবার কেস হিসেবে ধরে নিয়েছিল সে। প্রথম-প্রথম রাফসানের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আনন্দিতও হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীতে রাফসানের নাম এখনও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। কিন্তু কয়েকঘণ্টার মাঝেই লোকটার ওপর বিষিয়ে উঠতে থাকে ওর মন।

নরম হয়ে গিয়েছে এই রাফসান। কিংবদন্তির লোকটা যদি বাঘ হয়, তাহলে এই ব্যাটা বিলাই ছাড়া আর কিছু না। বিশেষ করে গতকাল এই মেয়েটাকে দেখার পর যে আচরণ করছিল, তাতে সম্মানের শেষ বিন্দুটুকুও মুছে গিয়েছে ওর মন থেকে।

'শালা,' দরজা খুলতে খুলতে বলল ও। এদিকে অচেনা লোকটা স্যাঁত করে সরে গিয়েছে এক পা। 'হ্যাডা দেখবার চাস?' বলে বাইরে বেরিয়ে এলো ও।

হালকা শীত আছে এখনও। তাই লোকটার পরনের ভারী কাপড় যে কিছু একটা আড়ালে রাখার জন্য গায়ে চড়ানো হতে পারে–সেটা ভাবেনি। অনভিজ্ঞতার মাসুল চুকাতে হলো চরমভাবে।

দরজা খুলে নেমে এসেছে ও, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটার কলারের দিকে। ইচ্ছা–এক হাতে কলার চেপে অন্য হাত দিয়ে চাপড় বসিয়ে দেবে। কিন্তু কলার ধরার আগেই মনে হলো, কেউ যেন ওর পেটে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়েছে।

কুঁচকে গেল শিহানের দেহটা। এক পা পিছিয়ে এলো ও; পেটে হাত দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, কালচে কিছু একটা বেরোচ্ছে ওখান থেকে। ভেজা ভেজা লাগছে শার্টটা। পরক্ষণেই পায়ের ওপর আরেকটা হাতুড়ির বাড়ি এসে পড়ল, বাঁ পায়ের মালাইচাকি গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

অথচ কী আশ্চর্য! ধুপ ধুপ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি সে!

জুয়েল বেচারার মাথা কাজ করে, তবে একটু ধীর গতিতে। নইলে হয়তো সে আন্দাজ করতে পারত কিছু একটা। শিহানকে পড়ে যেতে দেখেছে সে, তবে চোখের কোণ দিয়ে। নিশ্চিত হবার জন্য মাথা ঘোরাতে চাইল ও, কিন্তু পুরোপুরি ঘোরাবার আগেই কপালে লাল একটা বৃত্ত নিয়ে মারা গেল বেচারা।

তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছে শিহান। আকস্মিকতায় চিৎকার করতে ভুলে গিয়েছে। রাগের মাথায় গাড়ির ভেতরেই অস্ত্র ফেলে বেরিয়ে এসেছে। তাই বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার রইল না। দেখতে পেল, ব্লেজারের পকেট থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক বের করেছে এনেছে আগন্তুক। ওর দিকে এগিয়ে এলো লোকটা, চোখে চোখ রেখে বলল, 'শালা, বাইনচোত! হ্যাডম দেখাও? শিকদারের লগে হ্যাডম?'

মাথায় গুলি খাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আক্রমণকারীকে চিনতে পারল শিহান...

...ঢাকার নতুন ডন...শিকদার।

*

গালি দিতে দিতে অস্ত্রটাকে পকেটে ভরে রাখল শিকদার।

একা আসেনি ও, আরও তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এসব ছোটোখাটো মামলায় নিজে জড়াতে চায় না সে। কিন্তু পর্দার আড়ালে থাকা লোকটার কড়া নির্দেশ–ওকেই সামলাতে হবে এগুলো। তাই বাধ্য হয়েছে আসতে।

‘লাশ দুইটা ওই বিল্ডিঙে ফেলে দে,’ শিষ্যদেরকে ইঙ্গিতে নির্মাণাধীন দালানটা দেখাল। ‘তারপর তুই, দেলু, বাইরে পাহারা দিবি। আর তোরা দুইজন আয় আমার সঙ্গে।’

চুপচাপ দাঁড়িয়ে নির্দেশ পালন হতে দেখল শিকদার।

তারপর দুই সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল।

হাত বাড়াল উম্মে হানী (নিয়তি ম্যাডাম)-লেখা সাইনবোর্ডটার পাশের কলিং বেলে।

চল্লিশ বছর পর

একটানা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সর্প-দেবীর মন্দির চালিয়ে আসছে ওয়াজেথ। ওর বয়স এখন আটষট্টি। কেউ কেউ বলে, খুব একটা বয়স হয়নি ওর। কিন্তু শরীর সেই 'কেউ'-এর দলে নাম লেখায়নি।

জরা এসে বাসা বেঁধেছে শরীরে। নড়তে-চড়তে আজকাল কষ্ট হয় খুব। ওর স্ত্রী, গোত্র-প্রধান পদ্মার বয়স এখন সাতান্ন। আগের মতোই আছে তার উদ্যম আর দেহ। দক্ষ হাতে গত পঁচিশ বছর ধরে গোত্র চালিয়ে আসছে সে। আর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন সর্প-দেবীর মন্দিরে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে আসছে ওয়াজেথ। মন্দিরটার অবস্থান সেই মৃত্যুকূপের কাছেই। দেবী ওয়াজেঠথের যে মূর্তিটা নিয়ে এসেছিল যুবক সঙ্গে, সেটাকেই প্রতিমা বানিয়ে মন্দির স্থাপন করেছে সে। প্রতিনিয়ত পূজা চড়ায়, এমনকী বেদির পাশেই নিজ হাতে লাগিয়েছে একটা গাছ। ওই গাছের ফল কেবলমাত্র দেবীর অর্চনার কাজেই লাগায়।

গত এক বছর ধরে ধীরে-ধীরে খারাপ করতে শুরু করেছে ওয়াজেথের শরীর। বেচারা এখন শয্যাশায়ী। কোনোদিন আর উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

পদ্মার সাথে সুখের একটা জীবন কাটিয়েছে ও। দুই ছেলে আর এক মেয়ে উপহার দিয়েছে পদ্মা ওকে। মেয়ে ভাইবোনের ভেতর সবচেয়ে ছোটো, তবে এখন সবাই পূর্ণ বয়স্ক। দুই ছেলে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে মাছ শিকারের দায়িত্ব। মেয়ে, শুশ্রূষা, একই সঙ্গে গোত্র-প্রধান আর পুরোহিত হবার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে পদ্মা আর ওয়াজেথের কাছ থেকে।

বেচারার মৃত্যু শয্যায় সবাই ঘিরে ধরেছে তাকে। মাথার কাছে বসে আছে পদ্মা, দুই পাশে দুই ছেলে। মেয়েটা বাপের খুব ন্যাওটা হয়েছে। কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

'তোমরা...তোমরা শোন!' দম নিতেই কষ্ট হচ্ছে ওয়াজেথের। তাই ফিসফিস করে বলছে কথা। 'আমার...আমার দেশ অনেক দূরে। সে...সেখান থেকে অনেক পথ পার দিয়ে এসেছি এখানে। আমি চাই, আমাদের দেবী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। তাই তোমরা, আমার দুই ছেলে, দুই দিকে ছড়িয়ে পড়ো। একজন যাও বনের একদিকে, আর অন্যজন ভিন্ন দিকে। তবে শুশ্রূষা থাকবে আমার কাছে। কারও আপত্তি আছে?'

প্রস্তাবটার সাথে অনেক আগে থেকেই পরিচিত পদ্মা। তাই তার ভ্রুক্ষেপ হলো না। কিন্তু তিন ছেলেমেয়ের কাছে ব্যাপারটা একদম নতুন। তাই চমকে উঠল তিনজনই। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল ছেলে দুটো। নাহ, আপত্তি করার জন্য না। এমন কিছু ওরা কল্পনাই করতে পারে না। তবে মা-বোনকে ফেলে দূরে কোথাও যাবার ইচ্ছাও নেই খুব একটা।

'এই আমার শেষ ইচ্ছা, আশা করি কেউ মানা করবে না।' বলে শেষ বারের মতো চোখ বুজল ওয়াজেথ।

আর হ্যাঁ, পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনেছিল তার সন্তানেরা।

দশ

অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠেছে রাফসানের মন। এরইমাঝে বার দশেক ফোন করা হয়ে গিয়েছে শিহানের নাম্বারে। উত্তর পায়নি একটাও। তাই রামপুরা ব্রিজ পার হয়ে কিছুটা দ্রুতই গাড়ি ছোটাল ও ডি-ব্লক লক্ষ্য করে।

শুধু যে শিহান ফোন ধরছে না বলে ওর এই অস্বস্তি, তা কিন্তু নয়। বার তিনেক ফোন দিয়েছে নিয়তির নাম্বারেও। কিন্তু উত্তর পায়নি কোনো। বাড়িটাও কিছুটা নির্জন এলাকায়। তাই মন কু ডাকছে। সিদ্ধান্ত নিলো, ঝুঁকি নেবে না।

নিয়তিদের বাড়ি থেকে প্রায় আধ ব্লক দূরে গাড়ি পার্ক করল রাফসান। গাড়ি থেকে নেমে একবার দেখে নিলো চারপাশ। এখানে গাড়ি রাখলে সমস্যা হবে বলে মনে হলো না। আর হলেও পরে দেখা যাবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেল লক্ষ্যের দিকে।

অস্ত্র নেই সঙ্গে, পিস্তলটা বাড়িতেই রেখে এসেছে। খালি হাতে নিজেকে নগ্ন বলে মনে হচ্ছে ওর। যদি সমস্যা হয়ও, কীভাবে তা সামলাবে বুঝে উঠতে পারছে না। একবার ভাবল, সৈয়দ মারুফকে ফোন করে ব্যাকআপ নিয়ে আসা যাক। পরক্ষণেই বাদ দিয়ে দিল সেই চিন্তা। নিশ্চিত করে কিছুই তো বলতে পারছে না, পরে দেখা যাবে–মশা মারতে কামান দেগে বসেছে!

ছায়ায় ছায়ায় এগোতে লাগল রাফসান। বাড়িটা খোলা জায়গায় বলে সাবধানে এগোতে হচ্ছে। যদি আসলেই কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে শত্রুপক্ষ অনেক দূর থেকেই দেখতে পাবে ওর আসা! তাই এই বাড়তি সাবধানতা।

কাছাকাছি এসে প্রায় মিনিট দশেক আড়ালে লুকিয়ে রইল রাফসান। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শিহানদের গাড়িটাকে। ওটা যে শিহানদের তা নিশ্চিতভাবে না জানলেও, আন্দাজ করা যায়। নিজে পুলিশে চাকরি করার সময় প্রায়শই এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার করত। আলো জ্বলছে না ভেতরে। তাই এস.আই. যুবক ভেতরে আছে কিনা, নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

আচমকা একটা লাল বিন্দু নজর কেড়ে নিলো ওর। নাহ, গাড়ি থেকে না। নিয়তিদের পাশের নির্মাণাধীন দালানটা থেকে আসছে ওই আলো। সিগারেটের হবে, বুঝতে পারছে সে। কিন্তু ওখানে তো কারও থাকার কথা না। হ্যাঁ, স্থানীয় কোনো নেশাখোর হতে পারে। ঘড়িতে বাজে নয়টা। কম রাত হয়নি। হয়তো রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে, তারপরেও ঘটনাটা না দেখে এগোতে ইচ্ছা হলো না রাফসানের।

লুকাবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো ও, একটু ঘুরপথে রওনা দিল দালানটার দিকে। যদি ওর সন্দেহ সত্যি হয়, তাহলে শত্রুপক্ষ রাস্তার দিকেই নজর রাখবে। পেছন দিয়ে ঢুকতে তাই অসুবিধা হবার কথা না!

*

বস নিষেধ করেছিল বটে, কিন্তু সেটা কানে না তুলে সিগারেট ধরিয়েছে দেলু।

বাপ-মা আদর করে নাম রেখেছিল দোয়েল। ছেলেমানুষের নাম হিসেবে একটু অদ্ভুতই। কিন্তু আপত্তি করার মতো কেউ ছিল না। গ্রাম থেকে শহরে এসে রিকশাচালক বনে যাওয়া বাপ এবং গার্মেন্টস কর্মী মা-এর প্রথম সন্তান দোয়েল। বাস্তুহীন কৃষক ছিল বাপ, মা ছিল পাশের ভিটার বর্গাচাষী কৃষকের মেয়ে। প্রেম করে পালিয়ে এসে শহরে সংসার বেঁধেছিল।

প্রথম-প্রথম ভালোই যাচ্ছিল সব কিছু। বছর ঘুরতেই মায়ের কোল জুড়ে এসেছিল দোয়েল। তারপর হলো ছন্দপতন, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল বাবা। তবে সঙ্গে-সঙ্গে না। জমানো সব টাকা শেষ করে তারপর। মায়ের অবস্থা তখন দিশেহারা। স্বামীর দেখ-ভাল করবে? নাকি টাকা জমাবে? আর না দোয়েলকে দেখে রাখবে?

বাবা মারা যাবার পর, নতুন সমস্যা দেখা দিল মায়ের। জোয়ান মহিলা, একা-একা বস্তিতে থাকা কী আর সম্ভব? কু-প্রস্তাব দিতে থাকল সবাই। সবকিছু অগ্রাহ্য করে তবুও চলছিল মা।

একদিন আর পারল না। এলাকার উঠতি মাস্তানের লোক এসে তুলে নিয়ে গেল মাকে। আর ফিরল না মহিলা।

এতিমখানায় জায়গা হলো দেলুর, রাস্তায় নামতে হলো। জড়ালো সব অন্ধকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। আচমকা একদিন যোগ দিল শিকদারের দলে। নৃশংসতা প্রমাণ করে বনে গেল বসের কাছের লোক।

কিন্তু মানুষ তো? একাকী একজন মানুষের কাছে শীতের রাতে এক শলাকা সিগারেট যে কত দামি, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে জানে? ফেব্রুয়ারি মাস হলেও, ঠান্ডা আছে এখনও। তার ওপর একটু আগেই খুন করেছে দুইজন পুলিশ অফিসারকে। তাই পাহারা দেওয়ার কাজেও মন নেই খুব একটা। যারা নিরাপত্তা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল, তারাই তো খুন হয়ে গিয়েছে। এখন আর এত সাবধানতার দরকারটা কী?

প্রথমটা ছিল স্টার, একাকীত্বের সময় সঙ্গী হিসেবে স্টারের জুড়ি নেই। সেসময় প্রেমিকার চুম্বনের চাইতেও বেশি স্বাদ লাগে একেক টানে। তবে স্টারের চেয়েও ভালো হলো শুকনা, মানে গাঁজা। আজকাল রাতে শুকনায় টান না দিলে শরীরে বল পায় না দেলু।

প্রথম স্টারটা শেষ করার কিছুক্ষণের মাঝেই তাই গাঁজায় দম দিয়েছিল ও। সেটা শেষ করে আরেকটা ধরিয়েছে। আয়েশ করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে টানছে। ওপর থেকে নজর রাখতে সুবিধা হবে বলে তিনতলায় উঠে এসেছে সে। ওখানকার একটা অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টান দিচ্ছে। নিজেকে বোঝাচ্ছে, এই শলাকাই শেষ। তারপর আজ আর সিগারেটও ধরাবে না। বুঝিয়ে ফেলেছেও অনেকটা। তাই মন-প্রাণ দিয়ে টানছে।

একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে আজকের মিশনে। ওটা হাতেই ধরা। বাঁ হাতে অস্ত্র আর ডান হাতে গাঁজা–সময়টা ভালোই উপভোগ করছে দেলু। নেশার চোটে সঙ্গে আনা বাইনোকুলারটাও রেখে দিয়েছে পাশে।

আচমকা শলাকার দিকে নজর পড়ায় মন খারাপ হয়ে গেল ওর, বড়োজোর দুই কি তিনটা টান দেওয়া যাবে। বাতাস আড়াল করার জন্য পিস্তল ধরা বাঁ হাত দিয়ে শলাকাটাকে আড়াল করল লোকটা। তারপর টানল কষে। আগুনের উজ্জ্বল আলোয়, পরিষ্কার দেখা গেল ওর মুখ, চেহারা...হাতে ধরা পিস্তল।

হাতটা নামাবার সুযোগ পেল না বেচারা। তার আগেই মাথার ওপর যেন ভেঙে পড়ল আসমান।

*

হাত থেকে লোহার রডটা নামিয়ে রাখল রাফসান।

নির্মাণাধীন বাড়ি বলে, জিনিসটা পেতে কষ্ট হয়নি ওর। তিনতলায় ওঠার সময়ই অস্ত্র হিসেবে হাতে নিয়েছিল রডটা। একটু আগে দেখা

সিগারেটটা যদি স্থানীয় নেশাখোরও টেনে থাকে, তবুও অস্ত্র রাখা দরকার কাছে।

তিন তলায় উঠে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল রাফসান। লোকটার চালচলনে কেমন একটা আলসে ভঙ্গি। তাই ধরে নিয়েছিল–ভুল হচ্ছে ওর। কিন্তু যখন উজ্জ্বল আগুনের আলোয় হাতের অস্ত্রটা দেখল, আর দেরি করল না। এগিয়ে এসে রডটা বসিয়ে দিল মাথায়।

ইচ্ছা ছিল, অজ্ঞান করবে। তারপর যদি মিনিট দুয়েকের মাঝে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারে, তাহলে প্রশ্ন করা যাবে কয়েকটা।

কিন্তু একটু বেশিই জোরে হয়ে গিয়েছে আঘাতটা, অন্ধকারে ইচ্ছামতো জায়গায় লাগাতেও পারেনি। মেঝেতে পড়ার আগেই মারা গিয়েছে বেচারা।

আফসোস করে সময় নষ্ট করল না রাফসান। তুলে নিলো অস্ত্র আর বাইনোকুলার। তারপর নেমে গেল নিচে। প্রথমেই চেক করে দেখল শিহানদের গাড়িটাকে। কেউ নেই ভেতরে। গাড়ির ভেতরে বসল ও, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা ভাবা দরকার।

এরপর নজর দিল নিয়তিদের বাসার দিকে। দরজা খোলা, তবে পুরোটা না। বসার ঘরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে কিছুটা। ফাঁকা বলেই মনে হচ্ছে। কী মনে করে চোখে তুলল বাইনোকুলারটা। আগেরদিন দেখে এসেছে বাড়িটা, তাই ওই ঘরে কী কী আছে তা জানে। একটু এদিক-ওদিক করতেই, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ওপর গিয়ে পড়ল ওর নজর।

চমকে উঠল তৎক্ষণাৎ।

একটা চেয়ারে বাঁধা হয়েছে বয়স্ক এক মহিলাকে। সম্ভবত নিয়তির মা তিনি–বুঝতে পারল রাফসান। আরেকটা চেয়ারে বাঁধা হয়েছে খোদ

নিয়তিকেই। তিন জন রুক্ষ চেহারার মানুষ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে পিস্তল। রাফসান দেখতে দেখতেই ওদের একজন এগিয়ে এসে থাপ্পড় বসিয়ে দিল নিয়তির গালে।

বাইনোকুলার নামিয়ে রাখল রাফসান। সৈয়দ মারুফের মোবাইলে একটা এস.ও.এস. মেসেজ পাঠিয়েই গাড়ি থেকে নেমে এলো সে। জানে, ভদ্রলোক এর অর্থ ঠিক ধরতে পারবেন।

কিন্তু অপেক্ষা করতে পারবে না ও। এখনই কিছু না করলে, ব্যাকআপ এসেও আর লাভ হবে না।

*

শক্ত-পোক্ত মেয়ে নিয়তি। বাপের মৃত্যুতে কাঁদেনি, তার পার্টনারদের বিশ্বাসঘাতকতাও খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি ওর মনে। কিন্তু মাকে এভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখে নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

বিগত দুটো ঘণ্টা যেন দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। সন্ধ্যার পর আর ব্যাচ পড়ায় না নিয়তি, সন্ধ্যা আর রাতটুকু নিজের মতো করে কাটায়। আজকেও তাই করছিল। উমার ডায়েরিটা পড়তে বেশিক্ষণ লাগেনি। তারপর কী ভেবে যেন ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিল রান্নাঘরে, চালের বস্তার ভেতরে।

সন্ধ্যার একটু পর পর, আচমকা কলিং বেল বাজায় কেউ। তখন কেবল গোসল সেরে বেরিয়েছে নিয়তি। রাতে বাসায় থাকে কেবল ও আর মা। দিনের বেলা এক বুয়া আসে, সারাদিন থেকে সন্ধ্যার আগে আগে ফিরে যায়।

কোনোরকমে গায়ে কাপড় জড়িয়ে, দরজা খুলে দেয় ও।

পরক্ষণেই কপালের সঙ্গে শক্ত কাঠের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। যতক্ষণে আবার ফিরে পায়, ততক্ষণে ওকে আর মাকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা শেষ। বুঝতে পারে, ও দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে কেউ একজন লাথি মেরেছিল দরজায়। পাল্লা এসে বাড়ি খায় মাথায়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মেয়েটা সেই আঘাতেই।

'অবশেষে সুন্দরী চোখ খুলল!' সামনে অস্ত্র হাতে তিনজন রুক্ষ চেহারার লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও। দলনেতা বলে মনে হওয়া লোকটাই বলে কথাটা। 'আধ-ঘণ্টা নষ্ট করছ আমাদের।'

চিৎকার করতে চাইছিল নিয়তি, কিন্তু মুখের ভেতর গুঁজে থাকা কাপড়ের জন্য পারেনি। ওর বিস্ফারিত হয়ে যাওয়া চোখ, ফুলে ওঠা গলার পেশি নজর এড়ায়নি দলনেতা। হেসে ফেলে সে। 'চিৎকার করবি? কর। কিন্তু,' মায়ের মাথায় চেপে ধরে পিস্তলের মাযল। 'তাহলে তোর মা আগে মরবে। বুঝতে পেরেছিস।'

সাথে-সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নিয়তি। বলতে চাইল, চিৎকার করবে না সে।

দলনেতা ইঙ্গিত করতেই, দুই শিষ্যের একজন এগিয়ে এসে সরিয়ে দিল মুখের বাঁধন।

'যা বলব, ঠিক-ঠাক উত্তর দিবি। নইলে...' হুমকি দিল দলনেতা।

'ঠি-ঠিক আছে।' ভয়ে কেঁপে উঠল নিয়তি।

'ডায়েরি কোথায়?'

চমকে উঠল মেয়েটা।

'কই ডায়েরি?' আবার জিজ্ঞেস করল দলনেতা।

'কী-কীসের ডায়েরি?' আমতা-আমতা করে জানতে চাইল নিয়তি।

'যেটা আজকে কুরিয়ারে পাইছিস।'

'আজকে কুরিয়ারে?' এমন ভাব করল যেন ওর মনে পড়ছে না। আসলে কালক্ষেপণ করতে চাইছে মেয়েটা। রাফসান বলেছিল, শিহানকে পাঠাবে। তা-ও অনেকক্ষণ আগের কথা।

যদি সময়মতো পাঠায় তাহলে হয়তো...

এগিয়ে এসে ওর গালে কষে থাপ্পড় বসালো দলনেতা। নোনতা স্বাদে ভরে উঠল নিয়তির মুখের ভেতরটা। 'নাটক করিস না। আমরা সব জানি। এখন বল, কই ডায়েরিটা?'

মাথা চলছে নিয়তির। এদেরকে পেশাদার বলেই মনে হচ্ছে। ডায়েরির কথা বলে দিলেও যে রক্ষা পাবে ওরা দুইজন, তা মনে হচ্ছে না। খুন হতেই হবে, তার আগে আরও অসম্মানিত হতে হয় কিনা, এখন প্রশ্ন সেটাই। তাই সত্যটা না বলার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

'একটা কুরিয়ার এসেছে বটে।' যেন আচমকা মনে পড়েছে, এমনভাব করে উত্তর দিল নিয়তি। 'কিন্তু আমি খুলে দেখিনি। জানি না কী আছে ভেতরে।'

চোখ চকচক করে উঠল দলনেতা। 'কোথায় সেইটা?'

'আমার ঘরে থাকার কথা, নিশ্চিত মনে নেই।'

এগিয়ে এসে আবার হাত তুলল লোকটা। কিন্তু আঘাত করে বসার আগেই বলল নিয়তি। 'আমি কী আর জানি নাকি যে ওই জিনিসের খোঁজে রাতে ডাকাত পড়বে বাড়িতে? জানলে নাহয় গুছিয়ে রাখতাম। আমাকে একটু খোঁজার সুযোগ দিলে–'

হো হো করে হেসে ফেলল দলনেতা। ‘ইয়েলো বেল্টধারী মেয়ে তুই, জানি আমি। খোঁজ-খবর না নিয়ে শিকারে নামি না। তোকে কিছু করতে হবে না, আমার লোকই খুঁজে দেখবে।’ বলে এক শিষ্যের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ‘যা তো, দেখে আয়।’

‘কোন ঘর?’ জানতে চাইল শিষ্য।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে নিয়তির দিকে তাকাল দলনেতা।

‘এটার সঙ্গেরটাই।’ মিথ্যা উত্তর দিল নিয়তি। এভাবে তিনঘরই খোঁজাবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে করে কিছুটা হলেও সময় মিলবে হয়তো।

মিনিট দশেক পর, খালি হাতে ফিরে এলো শিষ্য। শ্রাগ করল দলনেতার দিকে তাকিয়ে।

বিরক্তি খেলে গেল দলনেতার চেহারায়। নিয়তির দিকে এগিয়ে এলো সে।

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটা, আরেকটা থাপ্পড় খেতে হবে–বুঝতে পারছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিকট আওয়াজ করে অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

*

দুরু দুরু বুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রাফসান, হাতের অস্ত্রটা তোলাই আছে। তবে সাইলেন্সার লাগানো নেই এটাতে। আয়নায় দেখা দৃশ্য অনুসারে, ভেতরে রয়েছে তিনজন লোক। সবাই সশস্ত্র। তাই পিস্তল থাকলেও ব্যবহার করতে চাইছে না। বাঁ হাতে ধরে আছে একটা

ছোরা, ওটার ওপরেই আলতো করে রেখে দিয়েছে অস্ত্র ধরা ডানহাত।

লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়তিদের বাড়ির পেছন দিকে চলে এসেছিল ও। মনে-মনে খুব করে চাইছিল, যেন পেছনের একটা জানালা খোলা থাকে। কপাল ভালো, থাই জানালা। গরাদ নেই। অন্য জানালাগুলো বন্ধ হলেও, মাস্টার বেডের জানালাটা তখনও খোলা। হয়তো শোয়ার আগে বন্ধ করে শোয়ার অভ্যাস নিয়তির–ভেবেছিল রাফসান। তবে কারণ যা-ই হোক না কেন, জানালা খোলা পেয়ে নিজের কপালকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল সে।

আলতো করে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ও।

এবার পরিকল্পনার কঠিন অংশ।

তিন অস্ত্রধারীর হাত থেকে নিয়তিকে বাঁচানো।

নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, জানে যে এখনই ছুটে গেলে না হলেও তিন জনের অন্তত দুইজনকে ধরাশায়ী করতে পারবে। কিন্তু তৃতীয় জন যে রয়েই গেল, তার কী হবে? আর তাছাড়া, কয়েক বছর আগে এক বদ্ধ ঘরের বন্দুক যুদ্ধে ভ্রাতৃ-প্রতিম আদনানকে হারাবার পর, গোলাগুলির ব্যাপার দ্বিধা কাজ করে ওর ভেতরে।

খোলাই ছিল মাস্টার বেডের দরজা। কিচেনের ওপর নজর পড়তেই, বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল মাথায়।

গলা বাড়িয়ে এক নজর দেখে নিয়েছিল সে। টেনে রাখা হয়েছে বসার ঘরের পর্দা। পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসে প্রবেশ করেছিল রাফসান। তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে খুলে নিয়েছিল সিম। এরপর যন্ত্রটাকে ওভেনে ঢুকিয়ে চালু করে দিয়ে ফিরে এসেছিল মাস্টার বেডে।

আশা ছিল, আর কিছু না হলেও ছোটোখাটো একটা বিস্ফোরণ হবে। এতে যদি কৌতূহলী হয়েও একজন এদিকে আসে, তাহলেও অনেক।

কিন্তু পুরো ব্লকটাই যে শর্ট-সার্কিট হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবে–তা বুঝতে পারেনি।

সেই সঙ্গে আগুন ধরে গিয়েছে ওভেনে।

কী করবে, বুঝতে পারছে না ও। তবে উদ্দেশ্য মনে হয় পূরণ হবে। কেউ না কেউ তো আসবেই।

*

শিকদারের উদ্যত হাত উদ্যতই রইল, নামল না আর।

‘কী? কী হইল?’ প্রশ্ন করে উঠল এক শিষ্য।

‘ওস্তাদ, পোড়া গন্ধ পাই।’ আরেক শিষ্য, রাজিব বলে উঠল। ‘শর্ট-সার্কিট হইছে মনে হয়।’ এই শিষ্যকেই কুরিয়ারের খোঁজে পাঠিয়েছিল শিকদার।

‘যা তো,’ বলল দলনেতা। ‘দেখে আয়। আর সবাই যার যার মোবাইলের টর্চ অন কর।’

নিমিষে পালন হলো আদেশ। শিকদার বাদে অন্য দুই জনই টর্চ চালু করল। এদের মাঝে একটা টর্চের আলো পড়ছে অন্যদিকে। ওটা রাজিবের টর্চ।

অস্ত্র উঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল ছেলেটা। টর্চের আলোতে পথ দেখে নিচ্ছে। কিচেনে ঢুকেই চোখ ছানাবড়া। ওভেনে আগুন

লেগেছে।

'ওস্তাদ, আগুন লাগছে ওভেনে। শর্ট-সার্কিট মনে হয়।' বলল সে। 'কী করুম?'

ছাপার অযোগ্য গাল বকে উঠল শিকদার। তারপর বলল, 'তো আগুন নেভা, গর্দভ।' বলেই মন দিল জিজ্ঞাসাবাদের দিকে।

এদিকে নিয়তি অবাক, ও ভাবছে–ওভেনে তো কিছু ছিলই না। তাহলে আগুন লাগল কীভাবে?

রাজিব কিন্তু বসে নেই, রাগে গজগজ করতে-করতে ওভেনের দিকে এগোল সে। পানির খোঁজে নজর দিল এদিক-ওদিক। একটা পানি ভরতি জগ পেয়ে, ওটাই তুলে নিলো। তবে অস্ত্র নামায়নি হাত থেকে, নামিয়েছে টর্চ। পুরোটা ঢেলে দিল আগুনে। কাজের কাজ তো কিছুই হলো না, বরং জ্বলে উঠল যেন আরও।

আসলেই গর্দভ রাজিব। এক জগে কাজ হলো না বলে, আরেক জগ ঢালার সিদ্ধান্ত নিলো সে। পানি ভরার জন্য চলে গেল সিঙ্কের কাছে। কিন্তু পানি ভরার এই কাজটা এক হাতে হয় না, তাই অন্য হাত মুক্ত করার জন্য নামিয়ে রাখল অস্ত্র।

এতক্ষণ ধরে মাস্টার বেডের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল রাফসান। বিদ্যুৎ চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে কিছুটা হতবাক হয়ে পড়েছিল সে। তবে নিজেকে সামলে নিতে বেশি একটা সময় লাগেনি। সুযোগের অপেক্ষায় তাই আত্মগোপন করে ছিল আঁধারে। বুঝতে পেরেছিল, কাজে লাগাতে পারলে গুলি খরচ না করেই প্রতিপক্ষের সংখ্যা কমাতে পারবে সে।

যে-ই রাজিব নামের ছেলেটা অস্ত্র নামিয়ে রাখল, সাথে-সাথে চিতার ক্ষিপ্রতায় আর বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগোল ও। ছোরা শক্ত করে

ধরে আছে হাতে। চার-পাঁচ পা ফেলেই পৌঁছে গেল ছেলেটার পেছনে। এক হাতে মুখ চেপে ধরে কেটে ফেলল গলা।

টুঁ শব্দ না করে মারা গেল রাজিব।

তবে শব্দ হলো ঠিকই, আত্মরক্ষার্থে জগ ফেলে রাফসানের হাত চেপে ধরতে চেয়েছিল ছেলেটা। বেসিনে আছড়ে পড়ল ওটা।

'কী রে? কী হইল? এই একটা কামও পারিস না?' বিরক্ত কণ্ঠে বসার ঘর থেকে বলে উঠল শিকদার। 'যা তো আক্কাস, যায়া দেখ বলদটা কী করে!'

ভয়ে কেঁপে উঠল রাফসান। পরিকল্পনাটাই মাঠে মারা যেতে বসেছে। জলদি তাকাল রাজিবের দিকে। গলায় মাফলার জড়ানো আছে ছেলেটার। ওটা তুলে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে মুখে প্যাঁচিয়ে ধরল ও। 'লাগব না,' চাপা কণ্ঠে বলল। 'কাম শ্যাষ।'

শ্রাগ করল আক্কাস, শিকদারও আর কিছু বলল না।

এদিকে অস্ত্র উঁচিয়ে কিচেনের দরজার দিকে তাক করে আছে রাফসান। সত্যি সত্যি আক্কাস এলে গুলি ছুড়বে। মিনিট খানেক পরেও যখন কেউ এলো না, তখন স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

চার থেকে গেল দুই, রইল আরও দুই।

ভালোমতো মাফলারটা মুখে প্যাঁচিয়ে নিলো রাফসান। রাজিব ছেলেটা বেশ খাটো, ওর চেয়েও ইঞ্চি পাঁচেক কম হবে। অন্ধকারের ওপর ভরসা রেখে তবুও এগিয়ে গেল রাফসান। তবে কিচেন ছাড়ার আগে ছেলেটার টর্চ নিতে ভুলল না।

এক মিনিটের মাঝেই বসার ঘরে চলে এলো রাফসান। আক্কাসের পূর্ণ নজর সামনের দিকে, নিয়তিকে টর্চার করে কীভাবে ওস্তাদ–তাই দেখছে। পেছনে যে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুদূত, তা টেরও পেল না।

টর্চের আলো আর মুখ ঢেকে নিচু হয়ে হাঁটা রাফসানকে দেখে রাজিব বলেই ধরে নিয়েছে!

চুপচাপ লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল রাফসান। বড়ো করে দম নিলো একটা। দুই হাতে পিস্তল চালাবার ক্ষমতা নেই ওর, আফসোস হচ্ছে এজন্য। একজনকে গুলি করেই আরেকজনের দিকে তাক করতে হবে অস্ত্র। তাই সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়াবার জন্য এক মুহূর্ত ব্যয় করল।

এই একটা মুহূর্তের জন্যই খেসারত দিতে হলো ওকে।

‘আগুন বন্ধ হইছে?’ আচমকা ঘুরতে ঘুরতে প্রশ্ন করল শিকদার।

রাফসান বুঝতে পারল, লোকটা পুরোপুরি ঘোরা মাত্র ধরা পড়ে যাবে ও। রাজিব ছেলেটার বুদ্ধি হাঁটুতে। সচরাচর এই বৈশিষ্ট্যটা লম্বা মানুষদের সাথে মিলিয়ে বলা হলেও–ছেলেটা খুব একটা লম্বা ছিল না। তাই আর সময় নষ্ট না করে আক্কাস নামের লোকটার মাথার পেছনে ঢুকিয়ে দিল গুলি। এরপর দক্ষতার সবটুকু কাজে লাগিয়ে নল ঘোরাল শিকদারের দিকে।

কিন্তু শিকদার নিজেও যেন-তেন মানুষ না। পুরোপুরি ঘোরার আগেই সে সন্দেহ করতে পেরেছে–আক্কাসের পেছনে দাঁড়ানো লোকটা আসলে রাজিব না। দলের সবাইকে খুব ভালো করেই চেনে সে। হাজারো মুখোশ পরা মানুষের ভিড় থেকেও তাদেরকে খুঁজে পাবে সহজেই। তাই দেহের ঘোরা পূর্ণ হবার আগেই বন্দুক তুলতে শুরু করল ও।

তারপরেও রাফসানকে শিকার করতে পারত না হয়তো। কপাল ভালো গুন্ডা-সর্দারের। প্রশিক্ষণ ভুলে যেতে বসেছে, এমন এক পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে নেমেছে সে।

গুলি ছুড়েছে ঠিকই রাফসান, কিন্তু তাড়াহুড়োয় তাক ঠিক করতে পারেনি। শিকদারের বাঁ হাতের বাইসেপ ফুটো করে চলে গেল গুলিটা। অবশ্য সেই ধাক্কায় লোকটা টলে না উঠলে, পরেরটা জায়গামতোই লাগত।

এদিকে টলে উঠলেও, বন্দুক ছাড়েনি শিকদার। ভালো করেই জানে, জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না তাহলে। অন্ধকার ঘরে আলো বলতে ছিল শুধু আক্কাস আর রাজিবের মোবাইলের টর্চ। মাথায় গুলি খাওয়া আক্কাসের পক্ষে তো মোবাইল ধরে রাখা সম্ভব না, এদিকে তাক ঠিক করার জন্য টর্চ ছেড়ে দিয়েছে রাফসানও। সে জন্যই বেচে গেল, ঝুঁকে গিয়ে বন্দুক তুলল রাফসানের উদ্দেশ্যে।

হাঁ হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল চেয়ারে বসা নিয়তি। ওর পায়ের কাছেই পড়েছে শিকদার। লোকটাকে অস্ত্র উঁচু করতে দেখে, খোলা পা দিয়ে সাইডকিক বসিয়ে দিল তার দেহে।

গুলি ছুড়ল শিকদার, তবে নিয়তির আঘাতে লক্ষ্যের ধারে-কাছেও যেতে পারল না গুলি। কপাল ভালো, লাথি খেয়ে প্রায় উড়ে দরজার কাছে গিয়ে পড়েছে ও। প্রাণের মায়ায় সাথে-সাথে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল সে। পালাতে শুরু করল।

লোকটার পেছনে যাবে, নাকি নিয়তিদের দিকে খেয়াল করবে–এই সিদ্ধান্ত নিতেই মুহূর্তখানেক দেরি হয়ে গেল রাফসানের। পলায়নরত লোকটা হাতের অস্ত্র ফেলে গিয়েছে মেঝেতে। তাই তার পরিচয় বের করতে কষ্ট হবে না, তাছাড়া–বাইরে অন্ধকার। তাই লাভও হবে না খুব একটা। এসব ভেবে নিয়তির দিকে এগিয়ে গেল সে।

বাঁধন আলগা হলে, বিড়বিড় করে ওকে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটা। তারপর ছুটে গেল মায়ের দিকে।

পরক্ষণেই নিয়তির আর্ত-চিৎকারে ভরে উঠল চারপাশ।

শিকদারের পথভ্রষ্ট গুলি ওর মায়ের বুকে গিয়ে বিঁধেছে!

শত বর্ষ পর

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অরুণ নাগ।

বিগত কিছুদিন ধরে খুব ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে। পরদাদার আমল থেকে বাস করে আসা বনের দখল নাকি আরেকজনের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এতদিনের ঝামেলার পর, কিছুটা সুরাহা হতে শুরু করেছে সবকিছুর।

ওর দাদার বাবা, অনেক দূরের এক জঙ্গল থেকে এখানে এসে বসতি গেড়েছিলেন। বিশাল এক আদর্শকে সমুন্নত করার জন্য গৃহত্যাগী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এখানে, এই খাণ্ডব বনে এসে হতাশ হয়ে পড়েন। জীবনের অর্থ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন।

কী লাভ নিজের জীবন, নিজের যৌবনকে ছুড়ে ফেলে? কী লাভ বৃথা এক চেষ্টায় নষ্ট করে নিজেকে?

তাই বনেই বিয়ে করেন তিনি। এখানকার গোত্র-প্রধান, অমিয় নাগের মেয়েকে ঘরে তুলে থিতু হোন। তাকে বরণ করে নেওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধারণ করেন 'নাগ' উপাধি। সেই বংশের বর্তমান প্রধান অরুণ নাগ।

এতদিন জমি-জমা ছিল বনের আশপাশে, কিন্তু সেগুলোতে ভাগ বসানোর কেউ ছিল না। এখন নতুন এক জমিদারের উদ্ভব হয়েছে। কৃশাণু তার নাম। লোকটা চরম লোভী। বার-বার এসে দখল করার চেষ্টা করছে বন। অবশ্য বনের অধিবাসীরাও কম যায় না। লোকটা যত বারই চেষ্টা করেছে, ততবারই তাকে বাধা দিয়েছে তারা।

এরকম যে কিছু হতে পারে, তা আগেই ধারণা করেছিল বনবাসী। তাই জমিদার যখনই লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে আসত, তখনই পোষা হাতি আর অন্যান্য ভয়ংকর দর্শন প্রাণী নিয়ে বাধা দেবার জন্য হাজির হয়ে যেত তারা। ফলশ্রুতিতে পালাবার আর পথ খুঁজে পেত না লাঠিয়াল বাহিনী।

গতকালই একটা সমাধান করার উদ্দেশ্যে বনবাসীদের পক্ষ থেকে এক দল গিয়েছিল কৃশাণুর কাছে। সেই দলে ছিল অরুণ আর তার ভাই বরুণ। আসলে সেই পরদাদার আমল থেকেই গোত্রের নেতৃত্বের ভার ওদের বংশের হাতে। ওর পরদাদা এসবে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তার শ্বশুর ভাবতেই পারেননি যে ক্ষমতা তার বংশের বাইরে যাবে। একমাত্র মেয়েকে চাল-চুলোহীন যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেবার পেছনেও সম্ভবত তার সেই উদ্দেশ্যই কাজ করছিল।

যাই হোক, কৃশাণু প্রথমে দারুণ চোটপাট দেখালেও আস্তে-আস্তে নরম হতে শুরু করে। দুই ভাই বুঝতে পারে, এর জন্য দায়ী বনবাসীর প্রতিরোধ। জমিদার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, এভাবে চিড়ে ভিজবে না।

বনের ওপর আক্রমণ হানার চিন্তা বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানাল অরুণ। বিনিময়ে কথা দিল, ওদের আবাস-স্থল থেকে অনেকটা দূরে, কিন্তু জমিদারের জমি লাগোয়া একটা অংশ পরিষ্কার করে দেবে। চাইলে সেটা দখল করে নিতে পারে কৃশাণু।

জমিদার মাথা নাড়িয়েছিল শুধু, মুখ ফুটে কিছু বলেনি প্রথম-প্রথম। অনেকক্ষণ পর জানিয়েছিল, তাতে ওর কোনো আপত্তি নেই। বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিকও দেবে নাহয়। অবাক হয়ে গিয়েছিল অরুণ, যে লোক জমি দখল করার জন্য লাঠিয়াল পর্যন্ত নিয়োগ দিয়েছে, সে এত অল্পে রাজি হয়ে যাবে! তবে বলেনি কিছু। দরকার কী?

আজ সকালে আলোচনা সভা ডেকে স্বেচ্ছা-শ্রমিকদের নাম ঠিক করা হয়েছে। নিজেদের বাসস্থান বাঁচাতে উদগ্রীব সবাই। তাই বলতে গেলে বাদ দিতে হয়েছে অনেককে। এখন বিকালে আবার এই তালিকা দিয়ে আসতে হবে জমিদারকে।

ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করল অরুণ। বাস করে বনে, তাই এই গ্রামের কাছে দক্ষিণ রায় আর দেবী মনসাই সবচেয়ে বড়ো দেব-দেবী। দুজনের মূর্তির সামনে মাথা নত করে প্রার্থনা সেরে নিলো। এরপর হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল কালো চাকতিটাকে।

বাবার এই একটা মাত্র স্মৃতিই অবশিষ্ট আছে। অতীত জীবনকে বলতে গেলে ঘৃণাই করতেন তিনি। কিন্তু এই চাকতিটাকে কখনও দেহ থেকে আলাদা করেননি। সব সময় পরে থাকতেন। তার মৃত্যুর পর চিতায় এটাকেও দিতে চেয়েছিল অরুণ। পরে জানতে পারে, ওর বাবার ইচ্ছা ছিল–এই চাকতিটা যেন বংশানুক্রমিকভাবে ওদের পরিবারের বড়ো ছেলের কাছে থাকে। তাই আর দেয়নি। বরঞ্চ ওটার স্থান হয়েছে দেব-দেবীর পাশে।

আচমকা ঠক ঠক শব্দে সম্বিত ফিরল অরুণের। ঠাকুর ঘরে ও থাকলে সাধারণত আর কেউ প্রবেশ করে না, বা করার সাহস পায় না। সংসারে কেবল স্ত্রী আর এক ছেলে। কর্মচারী নেই। বনের জীবনে কেউ কর্মচারী রাখেও না। তাই হয় স্ত্রী তড়িতা, আর নয়তো পুত্র পবন–দুজনের কেউ একজন কড়া নাড়ছে।

চাকতিটা জায়গামতো রেখে দরজা খোলার জন্য হাত বাড়াল ও, ঠিক তখনই হাট করে খুলে গেল ওটা। হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে প্রবেশ করল তড়িতা। ভ্রু কুঁচকে ফেলল অরুণ। এমন তো হবার কথা নয়। সেই সাথে অশুভ আশঙ্কায় ভরে উঠল বুক। পুত্র পবনের বয়স এখন দশ, ওর আবার কিছু হলো না তো!

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইল ও।

দম ফিরে পেতে সময় লাগছে মেয়েটির, বোঝাই যাচ্ছে অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে।

‘ব...বনের...ধারে...’ কোনোক্রমে বলল সে।

‘বনের ধারে কী?’

‘জমিদারের লোক...’ কথা শেষ করতে পারছে না তড়িতা।

‘হুম, বলো!’ তাগাদা দিল অরুণ।

‘বনের...ধারে...জমিদারের...লোক আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!’ এক শ্বাসে বলে ফেলল তড়িতা।

‘কী?’ দৌড়ে বেরিয়ে গেল অরুণ।

আসলেই তাই। ওরা যেখানে বাস করে, তার সামনের গাছগুলোয় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী। এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এদিকে লাঠিয়াল বাহিনীর একদম সামনে, রথের ওপর বসে আছে এক তরুণ। তার হাতে উদ্যত ধনুক। পাশেই বসে আছে ঘন কালো বর্ণের আরেক মাঝবয়সি লোক। এতোটাই কালো সে যে দূর থেকে দেখে নীল বর্ণের বলে মনে হয়।

এই দুজনকে আগে দেখেনি কখনও ও। নিশ্চয়ই নতুন ভাড়াটে সৈন্য হবে, ভাবল তাই। এদিকে ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের অন্যতম শক্তিশালী পুরুষ বলে খ্যাত বরুণ। আগের লড়াইগুলোতে একাই দশ লাঠিয়াল ঠেঙিয়ে দিত লোকটা। এই অবস্থা দেখে আর সহ্য করতে পারল না, হাতের লাঠি আঁকড়ে ধরে ছুট লাগাল রথ লক্ষ্য করে।

কমপক্ষে একশো গজ দূরে ছিল রথটা। কিন্তু দশ গজও যেতে পারল না বরুণ। অবিশ্বাস চোখে নিয়ে অরুণ দেখল, রথের ওপরে বসা

লোকটা ছিলা টেনে ধরেছে। এক মুহূর্ত তাক করেই ছুড়ল সে তীর। এমন লক্ষ্যভেদ আগে কখনও দেখেনি খান্ডববাসীরা। সাই করে উড়ে এসে ঠিক বুকের মাঝখানে আশ্রয় নিলো তীরটা। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল গ্রামের সবচেয়ে দশাসই যোদ্ধা।

এদিকে খবর এসেছে, শুধু এখানেই নয়। মোটামুটি সব দিকেই আগুন লাগাতে শুরু করেছে জমিদার বাহিনী। পালাতে হলে তাই এখনই পালাতে হবে। নইলে পুড়ে মরতে হবে সবাইকে।

অরুণ বুঝতে পারল, এই দুর্ধর্ষ তীরন্দাজের সামনে টিকতে পারবে না ওরা। মরতে হবে সবাইকে। এদিক দিয়ে পালাতে চাইলে তীর খেয়ে মরতে হবে, আর না পালালে আগুনে পুড়ে।

নিজ বাড়ির দিকে পা বাড়াল অরুণ।

যেতে যেতে একবার ফিরে চাইল, রথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কৃশাণু। অরুণের জানা নেই, কিংবদন্তির দুই চরিত্রকে অনেক অনুরোধ করে এখানে নিয়ে এসেছে জমিদার। তাদেরকে বুঝিয়েছে, বনের ভেতর বাস করছে একদল তস্কর। তারা প্রায়শই ওর জমিতে এসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বনটাকে সাফ না করে দেওয়া পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই মিলবে না।

জানলে হয়তো একটা সমঝোতায় আসতে পারত অরুণ।

জানলে হয়তো হাজার বছর পরে মরতে হতো না উমা নামের এক বিজ্ঞানীকে...

...হুমকির মুখে পড়ত না সারা বিশ্ব।

পঁচিশ বছর পর

দেবী মূর্তির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অরুণ। গলায় ঝুলছে কালো চাকতি।

খান্ডববনের সেই ভয়াবহ দিনের পর পার হয়েছে আরও পঁচিশ বছর। সেদিনের স্মৃতি আজও নিজ দেহে বহন করে চলছে সে। মুখের এক পাশটা পুড়ে বিকৃত হয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে পালিয়ে অনেকটা পথ এসেছে ও। তবে একা...

...তড়িতা আর পবন, দুজনকেই গ্রাস করে নিয়েছে অগ্নি...গ্রাস করেছে কৃশাণুর লোভ...

সেদিনের অরুণের সঙ্গে আজকের অরুণের অনেক পার্থক্য। বৃদ্ধ হয়েছে, চুলে ধরেছে পাক। কিন্তু আসল পরিবর্তন সেখানে না। আসল পরিবর্তন তার চোখে, চোখের দৃষ্টিতে...যেখানে আগে খেলা করত শুধুই দয়া ও ভালোবাসা, সেখানে এখন হাজারো খুঁজেও ওসবের দেখা মিলবে না।

খাবার ঘরে বসে আছে ও। এখানে এসে নতুন করে সংসার পাততে হয়েছে। খান্ডববনেরই আরেক মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মেয়েটা আগুনে তার বাবা-ভাই-স্বামী সবাইকে হারিয়েছে। অনেকটা অবলম্বন দেবার জন্যই মেয়েটাকে বিয়ে করেছে অরুণ। তারপর আস্তে-আস্তে বেড়েছে স্ত্রীর ওপর ওর নির্ভরশীলতা। চারটি ছেলে উপহার দিয়েছে ওকে সুবলা।

সবচেয়ে বড়োটার নাম অনিল, যৌবনে পা দিয়েছে। ছোটোটার বয়স মাত্র দশ হলো।

পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসেছে অরুণ। এরা বড়োই হয়েছে ওদের ওপরে হওয়া অত্যাচারের গল্প শুনে। নাগ উপাধি ছেড়ে এই পরিবার এখন ধারণ করেছে বাসুকি উপাধি, মহানাগ বাসুকির সম্মানে। এখন অরুণের শয়নে-স্বপনে একটাই চিন্তা। সারা বিশ্বে কীভাবে মহানাগ আর নাগমাতা মনসার জয়জয়কার পৌঁছে দেওয়া যায়। ভালোবাসার যে আদর্শ অনেক আগে ওয়াজেথ প্রচার করতে চেয়েছিল–তা এখন বিকৃত হয়ে ধারণ করেছে উগ্র রূপ। সত্যিই, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আর উন্মাদনার মাঝে পার্থক্য একেবারেই ঝাপসা! এখন আর ভালোবাসা নয়, শক্তহাতের শাসন চায় অরুণ। হ্যাঁ, হয়তো এক জনমে হবে না। হয়তো সময় লাগবে হাজারও বছর...হয়তো পৃথিবী টিকে থাকতে পূরণ হবে না সেই স্বপ্ন...

...কিন্তু হাল ছাড়বে না অরুণ।

পুত্রদেরকে ওর এই সর্বগ্রাসী আদর্শে দীক্ষিত করে ছড়িয়ে দেবে চারপাশে।

‘অহিংশের জয় হোক,’ বলে নির্দেশনা দিতে শুরু করল সে।

এগারো

শিকদারের হাতে নিয়তির মা খুন হবার পরের দিন রাতের ঘটনা।

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে রাফসান, নিয়তিদের বসার ঘরেই। লাশটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে। ময়নাতদন্ত শেষে আজরাতেই ফিরিয়ে দেবার ওয়াদা করেছেন সৈয়দ মারুফ। তিনিও বসে আছেন এখানে। সেই সাথে আছেন প্রীতম চক্রবর্তীও। খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন সঙ্গে-সঙ্গে। নিয়তিও আছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে মেয়েটা, তবে এখন অনেকটাই শান্ত।

নিয়তির মার মৃত্যুর জন্য বারবার নিজেকেই দুষছে রাফসান। আগের রাতে ঘুমাতে পারেনি উত্তেজনায়, এ রাত অপরাধবোধের কারণে। দুইবার এরকম অভিযানে অংশ নিলো সে। দুইবারই হারাতে হলো কাউকে না কাউকে। নিজের ওপর থেকে ভরসা তাই পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে।

‘আ-আমি দুঃখিত।’ অবশেষে বলল ও। ‘আমার জন্যই তোমার–’

‘তোমার দুঃখ পাবার কারণ নেই।’ ওকে থামিয়ে দিল নিয়তি। কাল রাতের পর থেকে দুজনই দুইজনকে তুমি বলে ডাকছে।

‘কিন্তু আমিই তো দায়ী। আমি না থাকলে–’

‘আমি আর মা, দুইজনেই মারা যেতাম।’ আবারও ওকে থামিয়ে দিল মেয়েটা। ‘আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। কপাল মন্দ না হলে, মা-ও বেঁচে থাকত। দায়ী যদি কেউ হয় তো সে ওই শিকদার।’

বিশেষ কেস বলে, সব কাজই দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। বিকালের আগেই জানা গিয়েছে–ওই অস্ত্রে আঙুলের ছাপ যেটা আছে, সেটার মালিক আর কেউ নয়, বাংলাদেশের বর্তমান ত্রাস–শিকদার!

'আমি যেটা বুঝতে পারছি না, ওরা তোমার ওপর আক্রমণ করবে কেন? আর করলেও, শিকদার লোকটা নিজে আসবে কেন?' নিরীহ প্রশ্ন প্রীতম চক্রবর্তীর।

চোখাচোখি হলো রাফসান আর নিয়তির। ওরা আগেই আলোচনা করে নিয়েছে, কুরিয়ারে ডায়েরি আসার কথা বাইরের কাউকে বলবে না। ওটায় কী লেখা আছে, তা জেনে নাহয় উত্তর দেওয়া যাবে এসব প্রশ্নের। মারুফ স্যারের সাথে এ নিয়ে কথাও বলেছে রাফসান। তিনিও একমত হয়েছেন। কেননা কুরিয়ারের কথা জানতেন কেবলমাত্র তারা তিনজন আর শিহান। শিহান মারা গিয়েছে, তাই খোদ পুলিশের অফিস থেকে তথ্য লিক হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'বারবার সুন্দরবনের কথা জানতে চাচ্ছিল ওরা,' উত্তর দিল নিয়তি। রাফসান চমকে উঠে ওর দিকে তাকালেও, ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলল মেয়েটা। 'উমা ওখানে কেন গিয়েছিল, কী পেয়েছিল–এসব।'

'হুম, অদ্ভুত!' বললেন প্রীতম চক্রবর্তী। 'যাক গে, এখন কী করবে মা?' জানতে চাইলেন তিনি। 'একা-একা থাকবে এখানে? তারচেয়ে নাহয় আমার বাড়িতে চলো। উমার ঘরটা তো ফাঁকাই আছে,' বলতে-বলতে গলা ধরে এলো তার। 'আমি তো তোমাকে সবসময় মেয়ে বলেই ভেবেছি। কয়েকটা দিন নাহয় আমার ওখানেই কাটালে।'

'অনেক ধন্যবাদ আংকেল।' জবাব দিল নিয়তি। 'আপাতত মার দাফন-কাফন হয়ে যাক। তারপর নাহয়।'

‘জানিয়ো তাহলে আমাকে।’ বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সাহেব। ‘মেহেদিকে পাঠাব? ও থাকলে তোমার অনেক উপকার হবে।’

এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলে উঠলেন সৈয়দ মারুফ। ‘তার আর দরকার হবে না। সরকারিভাবে করা হচ্ছে সব।’ দরজার কাছে চলে গেলেন তিনি। ‘চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।’ বলে বৃদ্ধ প্রফেসরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

‘সুন্দরবনের ব্যাপারটা কী?’ জানতে চাইল রাফসান। ‘তুমি না বললে ওরা কুরিয়ারে পাঠানো ডায়েরির খোঁজ জানতে চাইছিল?’

‘হ্যাঁ।’ বলল নিয়তি। ‘কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্গে সুন্দরবনে আমাদের ট্যুরটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।’ ক্লান্তি আর কিছুটা লজ্জা খেলে গেল মেয়েটার কণ্ঠে। ‘আমি আসলে সবকিছু তোমাদেরকে বলিনি। উমা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল, যেন প্রাণ গেলেও সেই ট্যুরের কিছু কথা কাউকে না বলি। আমার সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙার ইচ্ছা হয়নি। যাই হোক,’ শ্রাগ করল সে। ‘এখন তো আর এসব বলে লাভ নেই। এক কাজ করো, আমার সঙ্গে এসো।’ বলে প্রায় টেনে রাফসানকে মাঝখানের রুমে নিয়ে এলো নিয়তি। এখানেই চালের বস্তা রাখে ওরা, ডায়েরিটাও সেখানেই আছে।

খানিকক্ষণ হাতিয়ে, ওটা বের করে আনল মেয়েটা। তারপর রাফসানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘মাঝখানে কিছু সাদা পাতা আছে। এছাড়া শুরুর দিকে কিছু পাতা আর শেষের দিকে কিছু পাতা ভরতি লেখা। পড় একবার, তাহলেই জানতে পারবে–কী হয়েছিল সুন্দরবনের সেই ট্যুরে।’

পর্ব ২: সংশ্লেষ

-৬ মাস

আজকে বিকালে হঠাৎ করেই পাপা আমাকে একটা ডায়েরি এনে দিলেন!

ডায়েরি লেখার শখ আমার বহুদিনের। সেই যখন ছোটো ছিলাম, ফ্রক পরে ঘুরতাম এদিক-ওদিক, মাথায় থাকত বেণি করে বাঁধা ঝুঁটি, সেই তখন থেকেই। প্রথম যে ডায়েরিটা হাতে পেয়েছিলাম, সেটার কথা আজও ভুলিনি। ছোটো, সুন্দর একটা গোলাপি রঙের ডায়েরি ছিল ওটা। তখন কেবল গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে শিখেছি, চক-স্লেট ছেড়ে প্রমোশন পেয়ে হাতে নিয়েছিলাম পেন্সিল। লেখালেখি করার ভূত তখনই চেপে বসেছিল মাথায়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম কাগজের দিকে। ভাবতাম, এই অক্ষরগুলো আমি লিখেছি! কী সুন্দর লাগছে দেখতে। কখনও কখনও শুধু শুধুই নিজের নাম লিখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, কাগজের ওপর নিজের নাম দেখতে খুব ভালো লাগত। চুপচাপ, শান্ত বাচ্চা ছিলাম আমি। পেন্সিল আর কাগজ ধরিয়ে দিলেই চুপ, আর কিছু লাগত না আমার।

পাপা ঘরেই অফিস বানিয়ে নিয়েছিলেন। কড়া বারণ ছিল তার, ওই ঘরে কারও ঢোকা যাবে না। তখন কী আর কাজের ঘর-টর বুঝতাম? শুধু জানতাম, ওটা একটা অন্ধকার জায়গা। যেখানে পাপারা একবার ঢুকলে হারিয়ে যান, অনেকক্ষণ আর তাদের পাওয়া যায় না।

এমনিতে পাপা কখনও অবহেলা করেননি আমাকে। সময় পেলেই আমার সাথে খেলতেন, গল্প করতেন। খুব যে ভালোবাসতেন, তা

ছোটোবেলাতেই বুঝতাম। এই রে, ভালোবাসতেন বলছি কেন! এখনও বাসেন নিশ্চয়। না বাসলে কি আর এত ব্যস্ততার মাঝেও আবদারের কথা মনে থাকে?

যা বলছিলাম, কালো ঘরটাকে মনে-মনে ঘৃণা করতাম খুব। ওটা যে আমার পাপাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়! চুপি চুপি দুয়েকদিন সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, দুরু দুরু করে তখন কাঁপত বুক। যদি পাপা দেখে রাগ করেন? যদি আর আমার উমা মামণি কই বলে কোলে না তুলে নেন? ছোটোবেলার সেসব কথা, সেসব ভয় এখন স্মৃতিতে এসে হাসিয়ে তোলে।

একদিন ধরা পড়ে যাই। পাপা তখন কেবলমাত্র ঘরটা থেকে বের হয়েছেন। বাইরে বেরিয়ে দেখেন আমাকে। ওনাকে দেখেই জায়গায় জমে যাই আমি, ভয়ে আর পা সরে না। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছিল মনে হয় তখন। আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন পাপা। কোলে করে নিয়ে যান ঘরটার ভেতরে।

বাড়িতে মনসা পূজার চল ছিল সেই আগে থেকেই। দেব-দেবীদের তখনও তেমন একটা চেনা হয়নি। ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী চিনবেই বা কি! তার কাছে ওটা আর দশটা পুতুলের মতোই একটা খেলনা। পার্থক্য কেবল ওটা নিয়ে বড়োরা খেলা করে।

বড়ো হয়ে বুঝতে শিখেছি, আমার বাবা বেশ ধার্মিক। আস্তে-আস্তে আমিও ধার্মিক হয়ে উঠি তার মতো। এমনকী এখনও, এই পরিস্থিতিতে পরেও আমি বা পাপা, কেউ ঈশ্বরকে ভুলে যাইনি। মা'র কথা বলছি না কেন ভাবছেন? বলব কী করে, তাকে তো কখনও দেখিইনি। আমাকে জন্মের কিছুদিন পরেই মারা যান তিনি। আমার অযত্ন হবে ভেবে, অথবা প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অসম্মান জানানো হবে ভেবে, আর বিয়ে করেননি বাবা। হয়তো আমার প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার জন্যও দায়ী ।

যেটা বলছিলাম, বাবার কাজের ঘরে ঢুকে দেখি, এক কোনায় মা মনসার একটা মূর্তি। এখন অবশ্য আলাদা পূজার ঘর হয়েছে। অফিসে ঢুকেই প্রথমে ওটাকে প্রণাম করলেন বাবা। আমাকেও করতে বললেন। বাবার আদরের কন্যা আমি, কোনোদিন অমান্য করিনি তার আদেশ। সেই ছোটোবেলাতেও না, তাই করলাম প্রণাম। এখন বুঝতে পারি, বাবার এটা ছিল রিচুয়াল। ঘরে ঢুকেই দেবীকে সম্মান জানিয়ে কাজ শুরু করতেন তিনি, নইলে শান্তি পেতেন না।

পরেও অনেকদিন দেখেছি, ছোটো একটা ডায়েরি সব সময় হাতের কাছে রাখেন পাপা। হঠাৎ হঠাৎ যা মনে আসে, ওতে টুকে নেন। পরবর্তীতে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। বেশ কয়েকটি আবিষ্কারও করেছেন সেভাবে।

ডায়েরি জীবনে সেদিনই প্রথম দেখি। প্রথম দেখাতেই কেমন যেন প্রেমে পড়ে যাই জিনিসটার। এর আগে বই বলতে ছিল বড়োসড়ো কিন্তু চিকন কিছু বস্তু। সত্যি বলতে কী, সাদা কাগজের ওপর ছাপার অক্ষরে লেখা আর ছবি আমাকে বিরক্ত করত। মনে হতো, শুভ্র আর পবিত্র কোন জিনিসকে যেন নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ওখানে তো কেবল আমি লিখব, আমার আগেই যদি আরেকজন ওতে কিছু লিখে রাখে তো আর বাকি রইল কী? তাই বুঝতেই পারছেন, শ’খানেক সাদা পাতার চমৎকার বাঁধাইয়ের জিনিসটা আমাকে কতটা আকৃষ্ট করেছিল।

‘ওটা কী পাপা?’ ছোট্ট এই আমার প্রশ্ন শুনে হেসেছিলেন পাপা।

‘ডায়েরি , মামণি।’

‘কী করে ওটা দিয়ে?’

‘লেখে।’

‘আমার লাগবে।’ গম্ভীরভাবে বেণি দুলিয়ে যেন আদেশই করেছিলাম।

হেসে ফেলেছিলেন পাপা। গাল দুটো ধরে আদর করতে-করতে বলেছিলেন, ‘আচ্ছা, এনে দিব।’

কথা রেখেছিলেন তিনি; পরেরদিনই স্কুল থেকে ফিরে দেখি, আমার টেবিলের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপি রঙের এক সুন্দর ডায়েরি। সেটার সঙ্গে কলমও গোলাপি রিবন দিয়ে বাঁধা! আর সেই কলমের রঙটাও গোলাপি! এককথায়, গোলাপি রঙে আমার উপহারটাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন পাপা। খুব যে খুশি হয়েছিলাম, তা কি আর বলে দিতে হবে?

আজ, এই ...এতগুলো বছর পরেও সেদিনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে প্রথম লেখা শব্দগুলো:

আজ আমার অনেক আনন্দ।

ইস, এই নতুন ডায়েরিতেও যদি সেই কথাগুলো লিখতে পারতাম! চিৎকার করে বলতে পারতাম, আজ আমার অনেক আনন্দ! কিন্তু যা হবার নয়, তা কি আর হবার?

কেন আনন্দ নেই আমার মনে? বলব? উম...বলেই দিই। বলার জন্যই তো কলম ধরেছি, কিনিয়েছি এই নতুন ডায়েরিটা। তবে তার আগে পরীক্ষা নিব একটা। আচ্ছা বলুন তো, এতক্ষণের লেখায় অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়েছেন? সেটা কী?

পারলেন না? বোকা মানুষ! মানুষই বলি, কেননা মাস সাতেক পর এই ডায়েরি কার হাতে পড়বে তা কে জানে? হয়তো কোনো পুরুষের হাতে, অথবা মহিলার। তখন যদি সম্বোধন ভুল হয়? তারচাইতে নিরাপদে থাকাই ভালো।

ধাঁধাঁর উত্তর বলে দেব? আচ্ছা দিচ্ছি।

একদম ওপরে দেখুন তো কী লিখেছি...

৬ মাস। কিন্তু তার আগে একটা দাগ আছে। মাইনাস ছয় মাস।

অদ্ভুত না? কারণটা শুনবেন?

কারণ আর ছয় মাস পর মারা যাব আমি!

-৫ মাস ২৭ দিন

নিশ্চয়ই ভাবছেন, পাগল এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছেন?

অসুস্থ বটে আমি, তবে পাগল নই। এই রে, পুরানো কথার জের টানার আগে এই তিন দিনের কথা বলে নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ডাক্তার দেখাবার কাজে বড়ো ব্যস্ত ছিলাম এই কদিন। তাই লিখব লিখব করেও, ডায়েরি নিয়ে বসা হয়নি। আগে গত পাতায় লেখা কথাটা বিশ্লেষণ করে নেই। ডাক্তার আংকেলের মতে, আমি আর ছয় মাস থেকে দুই বছর বাঁচব। কথাটা অবশ্য তিনি আমাকে বলেননি, বলেছেন পাপাকে। কিন্তু আমি শুনে ফেলেছি। তাই ছয় মাস ধরে নিয়েই লিখছি। বেশি সময় পেলে, সেটা বোনাস!

আমার মা যে আমার জন্মের কিছুদিন পরেই মারা যান, সে কথা নিশ্চয় বলেছি? দাঁড়ান...হুম, ওপরে দেখে আসলাম। বলেছি কথাটা। তবে কেন মারা গিয়েছেন বা কীভাবে মারা গিয়েছেন তা বলা হয়নি। এখন বলি, স্তনের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন তিনি।

অদ্ভুত এক রোগ এই স্তন ক্যান্সার। বিশ্বের প্রতি বিশজনের মাঝে একজন মহিলা এর শিকার হোন। প্রতি বছর সংখ্যাটা বাড়ে, আর প্রতি বছরই কমপক্ষে এক লাখ মহিলা এতে মারা যান। অন্তত আমি তেমনটাই জানি। ভয়ংকর এক রোগ এটা। নারীত্বের প্রতীক, যদিও এভাবে দেখাটা আমার কাছে খেলো বলে মনে হয়, স্তন কেটে ফেলেও অনেকে এর হাত থেকে বাঁচতে পারেন না। লসিকায় গিয়ে যদি একবার বাসা বাঁধে তো শেষ, ছড়িয়ে পড়ে দেহ জুরে আস্তে-আস্তে। মস্তিষ্কও রেহাই পায় না।

বিশেষ এক জিন এই রোগের জন্য দায়ী–BRCA. দুই ধরনের জিনগত সমস্যার কারণে সৃষ্টি হয় এই রোগ। এর মাঝে BRCA-1 বেশি ক্ষতিকর। যাই হোক, মা'র স্তন ক্যান্সার যখন ধরা পড়ে, তখন সেটা অনেকদূর ছড়িয়ে গিয়েছে। সেই বছর বিশেক আগের কথা। পাপা নামকরা ফার্মাকোলজিস্ট বলে, দেশের বাইরে নিয়ে কিছুটা চিকিৎসা করাতে পেরেছিলেন। তখন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এতোটা উন্নত ছিল না...বাইরের ব্যবস্থাও না। তাই ডাক্তাররা অল্প কিছুদিন বেশি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন মাকে। সময়টা হয়তো খুব বেশি ছিল না, কিন্তু চরম তৃষ্ণার্তের কাছে একঘটি জলও অনেক বড়ো ব্যাপার। পাপা সেই ঘটি, মানে সময়টুকুকে চোখের মণি করে বাকি জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

মারা যাচ্ছি, এজন্য দুঃখ হচ্ছে না। দুঃখ হচ্ছে কারণ, পাপাকে একা রেখে যেতে হচ্ছে। অবশ্য মেহেদি কাকা থাকছেন, কিন্তু তিনি তো আর পাপার রক্তের সম্পর্কের কেউ নন।

কাকার ব্যাপারে পরে কথা বলা যাবে, আগে আমার রোগের কথাটা জানিয়ে নেই। কিছু মনে করবেন না, মৃত্যু পথযাত্রী এক মেয়ের ডায়েরি পড়ছেন তো। তাই অনেক কিছুই হয়তো অগোছালো মনে হবে। মনে হবে মেয়েটা বেহুদা বকবক করছে। আসলে...আসলে

আমার যে খুব ইচ্ছা করছে মনের কথাগুলো সবাইকে জানিয়ে যাবার। তাই যখন যেটা মনে আসছে, তখন তা-ই লিখে ফেলছি। কষ্ট করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন প্লিজ।

যা বলছিলাম, মা মারা যান স্তন ক্যান্সারে। তার স্তন পার হয়ে কিডনিতে বাসা বেঁধেছিল এই মরণব্যাধি। সমস্যা হলো, আমাকেও তিনি দিয়ে যান সেই ভয়ংকর জিনটি।

আসলে জিনটি ভয়ংকর নয়, ভয়ংকর হলো তার বিকৃত রূপ। কেন জানি আমার দেহে সেটা আরও বিকৃত হয়ে ওঠে। তাই আমার মা পঁচিশটা বসন্ত দেখতে পেলেও, আমার কপালে জুটেছে কেবল উনিশটা।

মা'র মতোই, আমার ক্ষেত্রেও রোগটা ধরা পড়েছে একদম শেষ দিকে এসে। যখন কারও কিছু করার ছিল না। তবে পার্থক্য একটাই, মা'রটা স্তন ছাড়িয়ে কিডনিকে আক্রান্ত করেছিল, আমার ক্ষেত্রে সেটা করেছে মস্তিষ্ককে।

এই মাত্র এম.আর.আই. করিয়ে এলাম। মাসে-দুইমাসে একবার করে করাতে হয়। আকালের এই যুগে শুধু-শুধু এতোগুলো টাকা খরচ হয়। অবশ্য পাপার টাকার অভাব নেই, কিন্তু অপচয় করার কী দরকার বলুন? আমি তো জানিই মারা যাব! তাহলে এই টাকা পরীক্ষা আর ডাক্তারের পেছনে খরচ না করে, ভিখারিদের দিলে ভালো হতো না?

মাঝে-মাঝে মনে হয়, পাপাকে কথাটা বলি। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে যাই। স্ত্রীকে হারাবার পর এখন যে লোক একমাত্র সন্তানকেও হারাতে চলেছে, তার মরিয়া প্রচেষ্টাকে অসম্মান করি কী করে? জলের মতো টাকা খরচ করছেন তিনি, যেখানেই আশার আলো দেখছেন, সেখানেই ছুটছেন। তবে লাভ যে নেই, সেটা বুঝতে পারছেন নিজেও।

নিজে বিজ্ঞানী হয়েও, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর ভরসা হারিয়ে এখন ঝুঁকেছেন অতিপ্রাকৃতের প্রতি। নিয়ম করে এক সাধু বাবার কাছে যেতে হচ্ছে আমাকে। ইনি আবার নাকি জাগ্রত পীর! যদিও শব্দটার অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। মুসলমান কারও স্পর্শ পেলে নাকি আমার দিদা গোসল না সেরে ভাত ছুঁতেন না। শুনেছি, আমার পরিবারের আদি পুরুষেরা নাকি মুসলমান যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, সে রাস্তায় পা রাখতেন না। আর আমার পাপা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন এক মুসলমান পীরের কাছে! অবশ্য এই পীরের কাছে ধর্ম নাকি কোনো ব্যাপার না। যে ধর্মের মানুষই হোক না কেন, তার কাছে গিয়ে পড়লে মুশকিল আসান।

এসব দেখে অবশ্য ইকবাল আংকেল খুব হাসেন। ইকবাল আংকেল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিয়তির আব্বা। ভদ্রলোক নিজেও খুব ধার্মিক। তবে পাপার মতো এর মাঝেও ধর্মান্ধতা নেই। নিয়তির দাদি অবশ্য আমাকে দেখতে পারেন না। তার ফুলের মতো নাতনীটা নাকি আমার মতো মালাউনের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে অসভ্য আর নষ্ট হচ্ছে। তবে আংকেল-আন্টি আমাকে খুব পছন্দ করেন, তা বোঝাই যায়। প্রতিদিন একবার করে এসে আন্টি আমার মাথায় কী কী যেন দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিয়ে যান। আর আংকেল তো কদিন আগে ওমরা থেকে এক বোতল জমজমের পানি এনে দিলেন! এটা খেলে নাকি আরোগ্য হয়। আমার অবশ্য এসব কিছুতেই খুব একটা বিশ্বাস নেই। তবে এমন আদর করেন যিনি, তার মনে তো আর কষ্ট দেওয়া যায় না! এমনিতেই বিদেশ-বিভুঁই-এ গিয়েছিলেন, আমার কথা মনে রেখে টেনে এনেছেন এক বোতল পানি। খেলামই নাহয়, লাভ না হোক, ক্ষতি তো আর নেই!

নিয়তির কথা যখন উঠলই, তখন বলে নেই এই ফাঁকে। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ও। আমাদের বাড়িটা রামপুরায়, বনশ্রী প্রজেক্টে। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি পাশাপাশি। আমরা অবশ্য আগে

টাঙ্গাইল থাকতাম। সেখান থেকে পাপার কাজের সুবিধা হবে বলে ঢাকায় চলে এসেছি। তবে আমার ধারণা, ওখানে মা'র স্মৃতি এতো বেশি ছড়িয়ে ছিল যে পাপা সহ্য করতে পারেননি। আমার ভালো লেখাপড়া হবে, এই উছিলায় চলে এসেছিলেন ঢাকায়। বনশ্রীর এই বাড়িটা তখন কেনেন তিনি। আমাকে ভর্তি করা হয় আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখায়। অবশ্য মতিঝিল শাখাতেও চান্স পেয়েছিলাম। বাড়ি থেকে দূরে হবে আর লেখাপড়া নিজের কাছে, এই দুই যুক্তিতে পাপা ভর্তি করাননি। কলেজে উঠে অবশ্য আর আপত্তি করেননি। ভর্তি করে দিয়েছিলেন ওখানে।

বনশ্রীর এই দোতালা বাড়িটাতেই আমার বড়ো হয়ে ওঠা। যখন থেকে চারপাশের পরিবেশ চিনতে পেরেছি, তখন থেকেই এখানে। গত কয়েকটা বছরে অবশ্য অনেক কিছুতে পরিবর্তন এসেছে। বাসার সামনে মাঠ ছিল, সেটায় এখন কনক্রিটের কংক্রিটের রাজত্ব। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আর হাউজিং বানানো হয়েছে চারপাশে। কিন্তু মাঠ আর প্রকৃতির সাথে মিলে যাবার যে সুযোগটা ছেলেবেলায় ছিল, সেটা হারাতে হয়েছে আমাদের।

আমাদের বললাম, কারণ নিয়তিকে আমি আমার আপন বোনের মতোই ভালোবাসি। বি-ব্লকে আমাদের বাসা। পাশেই ছিল পুলিশ ফাঁড়ি। সেখান থেকে দুজনে সকালবেলা হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতাম। সেই ভোর ছয়টায় শুরু হতো ক্লাস। একমাত্র ধর্ম শিক্ষা ক্লাস বাদে সব ক্লাসে একসঙ্গে থাকতাম আমরা। একসঙ্গে বলতে, যখন সুযোগ হতো আরকী। সীট প্ল্যান করা ছিল বলে প্রথম একটা-দুইটা ক্লাস কখনই একসাথে বসা হতো না। ভয় পেতাম, যদি মোজাম্মেল স্যার ধরে সাইজ করে দেন। সাইজ শব্দটার অর্থ অবশ্য জানতাম না প্রথমে। কিন্তু জিনিসটা যে শরীরের জন্য আরামদায়ক হবে না, তা পরিষ্কার বুঝতে পারতাম।

আমাদের দোতলা বাড়িটার পাশেই ছিল নিয়তিদের বাড়ি। প্রথম দিনেই ওর আম্মু, জলি আন্টি দেখা করতে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে। ইকবাল আংকেল এসেছিলেন বিকালে। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার। বাবা-মার অনেক দিনের সাধনার একমাত্র ফসল নিয়তি। তাই জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তারা মেয়েকে (দেখেছেন, এবার আর ভুল হয়নি?)। নিয়তি আমার বয়সি, পড়তো আইডিয়াল স্কুলেই। টিনশেডের ওই স্কুলটাতেই প্রগাঢ় হয় আমাদের বন্ধুত্ব।

আহ, এক সাথে বেণি দুলাতে দুলাতে স্কুলে যাবার সেই দিনগুলো যদি আবার ফিরে পেতাম! ফিরে পেতাম স্কুল দেখতে পাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিয়তির মাথা ঢাকার সেই প্রাণান্তকর চেষ্টার দৃশ্য!

কলেজে উঠেও একইসাথে যাওয়া-আসা হতো। ক্লাস টেস্টে পাশাপাশি বসতাম। দুই মাথা মাঝে-মাঝেই এক হয়ে স্যার-ম্যাডামদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এগিয়ে এসে বড়ো বড়ো দুটো গোল্লা বসিয়ে দিতেন ডায়েরিতে। আমাদের অবশ্য খুব একটা ভ্রুক্ষেপ হতো না। দিক না, গোল্লা তো দুজন একসঙ্গেই খেয়েছি। ক্ষতি কী তাতে?

আমার যেদিন ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হলো সেদিন যদি নিয়তির কান্না দেখতে পেতেন, তাহলে বলতেন, এরা নিশ্চয় এক মায়ের পেটের বোন!

নাই বা হলাম...এক মায়ের পেটের।

এক আত্মার দুই অংশ তো!

মেহেদি কাকার প্রসঙ্গ এসেছিল, ভেবেছিলাম আজকেই তার সম্পর্কে কিছু লিখে রাখব। কিন্তু কেন জানি আর ইচ্ছা করছে না। নিয়তির কান্না ভেজা মুখটার কথা মনে পড়ছে কেবল। আজ এটুকুই থাক।

কাল-পরশু আবার লিখব নাহয়।

-৫ মাস ১৫ দিন

অ্যানি ফ্রাঙ্কের ডায়েরি পড়েছেন?

আমি পড়েছি। কী ছোট্ট একটা মেয়ে, আর কী বিশাল তার অভিজ্ঞতা! ছোটো একটা খুপরিতে দিনের পর দিন কাটানো, সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকা, নাৎসি বাহিনীর আক্রমণের ভয়, সব মিলিয়ে পাগল হয়ে যাবার কথা তার। তবে বয়স কম ছিল তো, সেজন্যই বোধহয় চাপটা নিতে পেরেছিল সে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও প্রেমে পড়েছিল এক ছেলের।

কমবয়সিদের এই একটা সুবিধা আছে কিন্তু। তারা অনেকটা কচু পাতার মতো, জল হয়তো আছড়ে পড়ে ওদের ওপর, কিন্তু লেগে থাকে না। তেমনি করে সমাজ...জীবন ওদের দিকে ছুড়ে দেয় অনেক সমস্যা, অনেক জটিলতা। সেই জটিলতার সমাধান করা হয়তো যৌবনের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তাকে ভুলে থাকার ক্ষমতা এনে দেয় সে।

আমার ব্যাপারটাও অনেকটা তেমন বলতে পারেন। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ লিখছি ডায়েরিতে মনের কথা! কে জানে, হয়তো একদিন আমিও অ্যানি ফ্রাঙ্কের মতো নামকরা একজন হয়ে যাব।

সম্ভব তো, তাই না?

ডায়েরি লিখে নামকরা হতে চায়, এমন একজনের আসলে প্রত্যহ সেটা লেখা উচিত। কিন্তু কেন যেন আমার দ্বারা ওসব হয়ে ওঠে না। আসলে প্রায় সময়ই আমি ভুলে থাকতে চাই মৃত্যুর কথা। ডায়েরিটা দেখলেই সে কথা মনে পড়ে যায় বলে লেখা হয় না। যেদিন ডাক্তারের কাছে যাই বা কোনো পরীক্ষা করিয়ে আসি, সেদিনই কেবল এটার কথা মনে পড়ে।

যাই হোক, আগের দিন বলেছিলাম, মেহেদি কাকুর ব্যাপারে কিছু বলব। তবে তার আগে আমার পাপার ব্যাপারে আরও কিছু বলা যায়।

আমি উমা চক্রবর্তী, আর আমার পাপা প্রীতম চক্রবর্তী। বাপে-ঝিয়ে আর মেহেদি কাকুতে মিলে আমাদের সংসার। আমি আর নিয়তি যেমন একসাথে বড়ো হয়েছি, তেমনি পাপা আর কাকু একসঙ্গে বড়ো হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, পার্থক্য আছে কিছু। নিয়তি আর আমি সমবয়সি, আর পাপা কাকুর চেয়ে কয়েক বছর বড়ো। আবার নিয়তি আমাদের আশ্রিত নয়, কাকু আশ্রিত।

তাজ্জব হচ্ছেন? ভাবছেন হিন্দু ঘরে এক মুসলমানের ছেলে আশ্রিত হলো কী করে? সে এক বিশাল কাহিনি। যথা সময়ে বলা হবে।

পাপার গল্পে ফিরে আসি। বনেদী বংশ আমাদের। দেশের বাড়ি টাঙ্গাইলে। সেখানকার এলেঙ্গাতে বিশাল এক এলাকা জুড়ে ছিল আমার দাদুর সম্পত্তি। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে দারুণ চালাক ছিলেন দাদু। তার বাবা ছিলেন জমিদার, যখন বুঝতে পারছিলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশ দুই ভাগ হবে, তখন তড়িৎ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সব কিছু স্থানীয় বেনিয়ার কাছে বেঁচে দিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন ইন্ডিয়ায়। আমার পর দাদা, মানে বিনয় চক্রবর্তীর আমলে জাত-পাতের খুব চল ছিল। সারা বাংলাদেশ খুঁজে নাকি তার জন্য উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া যায়নি। সেই কলকাতায় গিয়ে অবশেষে পাওয়া যায়। বাংলাদেশি পরদাদা আর কলকাতার পর-দিদা, এই

দুইয়ে মিলেছিল ভালো। বিয়ের পর স্ত্রীর পরামর্শে টাঙ্গাইলের পাশাপাশি কলকাতাতেও জমি কিনতে শুরু করেন তিনি। কিছুদিনের মাঝেই দেখা গেল, টাঙ্গাইল পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হলেও, কোনো অসুবিধা হবে না তার।

তাই যখন বুঝতে পারলেন যে পাকিস্তানের সাথে ঝামেলা হবে, সব কিছু বেঁচে-বুচে পাড়ি জমালেন কলকাতায়। ওখানে করলেন আরও সম্পদ, কিনলেন আরও জমি। মারাও গিয়েছিলেন ওখানেই।

আমার দাদা অনল চক্রবর্তী আবার আলাদা ধরনের মানুষ। জমিদারীত্বের ব্যাপারে লোকে বেশ মজার কথা বলে। বলে, দাদায় সম্পদ বানায়, বাবায় খরচ করে, পোলায় থালা নিয়ে বসে। মজার না? তবে এই ক্ষেত্রে কথাটা একদম খাটেনি। বাবার যোগ্য উত্তসূরি হিসেবে অনল চক্রবর্তী গড়ে তোলেন আরও বিশাল এক সাম্রাজ্য।

এমন সময় নতুন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। ব্যবসার এক নতুন দ্বার যেন উন্মোচিত হয়ে গেল দাদুর সামনে। টাকাপয়সা কিছু নিয়ে আবার ফিরে এলেন আদি নিবাস টাঙ্গাইলে। যা-যা তার বাবা বেচে দিয়েছিলেন, কিনলেন তারচেয়েও বেশি। তখন সালটা ১৯৭৪-১৯৭৫। মানুষের খুব খারাপ অবস্থা। লোক ঠকিয়ে অল্প দামে সব কিনে নিতে বিন্দুমাত্র বেগ পেয়ে হয়নি দাদুকে।

শুনতে বা বলতে খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু সত্য এটাই। সত্যকে অস্বীকার করার তো উপায় নেই।

আমার বাবা, প্রীতম চক্রবর্তী তার শেষ বয়সের সন্তান। আমার দিদা আসলে তিনজন। প্রথম জন অল্প বয়সেই মারা যান। পরের জনকে আমি দেখেছি, তবে তার স্মৃতি বিশেষ মনে নেই। দুই বউ-এর কারও কাছ থেকে সন্তান না পেয়ে দাদা বিয়ে করেন আমার দিদাকে। তার ঘরে একটাই ছেলে হয়, আমার পাপা, প্রীতম চক্রবর্তী।

ছোটোবেলা থেকেই দাদুর স্বপ্ন ছিল, ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত বানাবেন। সেজন্য খরচ করতেও তার কার্পণ্য ছিল না। কলকাতা থেকে ফার্মাকোলজি পড়িয়ে তাকে আর দেশে আসতে দেননি, পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেত। সেখান থেকে পি.এইচ.ডি. নিয়ে তারপর ফিরলেন পাপা। এসেই যোগ দেন নাম করা এক বিদেশি গবেষণা সংক্রান্ত এন.জি.ও.তে। পাপা খুব পড়ুয়া আর পরিশ্রমী ছিলেন বলেই জানি। তাই অল্প দিনের মাঝেই বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। দেশে আসলে নাম ছড়ায় কুখ্যাত লোকের। ভালো কাজ করে নাম কামানো এদেশে অসম্ভব। তবে এদেশের লোকই যখন বাইরে গিয়ে অসাধারণ কিছু করে আসে, শুরু হয়ে যায় তাকে নিয়ে মিডিয়া আর দেশের মানুষের লাফালাফি।

মেহেদি কাকু আমার দাদার ডান হাত, মোস্তাক মিয়ার ছেলে।

মোস্তাক মিয়া ছিলেন সব কাজের কাজী, কথায় বলে না, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব কাজেই ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। তার ছেলেও তেমনি। যাই হোক, মোস্তাক মিয়ার দুই সন্তান, বড়ো জন মেয়ে আর তারপর ছেলে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন আগেই, একদম কাঁচা বয়সে। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় সেই মেয়ে। মেহেদি কাকু হয়ে ওঠেন বাবার চোখের মণি।

পাপার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোটোই হবেন তিনি। যাইহোক, মোস্তাক মিয়ার কাজ ছিল, দাদার সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। এজন্য যা-যা করার দরকার হতো করতেন। এদিকে আগেই বলেছি, আমার দাদা মানুষ হিসেবে খুব একটা সুবিধার ছিলেন না। তিনি অনেক মানুষকেই রুষ্ট করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের অভাব ছিল অনেক, চালান ছিল স্বল্প। তাই প্রশাসন থেকে শুরু করে এলাকার গুন্ডা-পান্ডা, সবাইকে হাতে রাখতে পেরেছিলেন খুব সহজে। জমিদারী প্রথা অনেক আগে উঠে গেলেও, সবার

অগোচরে নতুন এক জমিদারীর পত্তন করেছিলেন তিনি। মোস্তাক মিয়া ছিলেন সেই জমিদারীর নায়েব।

অনেক ব্যবসার মাঝে, চড়া সুদে ধার দেওয়ার ব্যবসাও ছিল দাদার। সেটার টাকা উসুল করতে হাজির হয়ে যেতেন মোস্তাক মিয়া তার পোষা গুন্ডা নিয়ে। সুদের হার এতোটাই চড়া ছিল যে সেটা শোধ করতেই ঋণকারীর জান বেড়িয়ে যেত, আসলের কথা শিকেয় তোলা থাক।

এমনি এক ঋণকারী, মোসলেমের ঘরে একদিন গুন্ডা-পান্ডা নিয়ে হাজির হোন মোস্তাক চাচা। বেচারা স্ত্রীর অসুস্থতার চিকিৎসা করার জন্য ঋণ নিয়েছিল। অনেক দিনের বাকি পড়ে যাওয়ায়, দাদা টাকা উসুল করতে পাঠান। এদিকে মোসলেম মিয়ার তখন মাথা খারাপ অবস্থা। প্রায় সব সম্পদ বন্দক রাখা শেষ। পরিচিত যত সুদখোর মহাজন আছে, তাদের সবার কাছেও হাত পাতা শেষ। সবেধন নীলমণি বলতে মৃতা মায়ের একটা নাকফুল। ওটাকেও বন্দক রাখার উদ্দেশ্য তখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল সে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। দরজার সামনে এসে মোসলেম দেখে, মোস্তাক মিয়া তার গুন্ডাদল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরেরও হয়তো মন গলে কাকুতি-মিনতিতে, কিন্তু সুদখোর মহাজন আর তার সাঙ্গপাঙ্গের গলে না। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, মোসলেমের মা'র দেওয়া নাকফুল মোস্তাকের হাতে! আর বেচারা মোসলেমকে উঠানের মাটির সঙ্গে চেপে ধরে বসে আছে গুন্ডাদল।

একবারের জন্যও পেছনে না তাকিয়ে চলে আসেন সেদিন মোস্তাক মিয়া।

মোসলেমের স্ত্রী এর এক সপ্তাহের মাঝেই মারা যান।

তার দুই দিনের মাথায় খুন হোন মোস্তাক।

এরপর আর মোসলেমকেও দেখা যায়নি কখনও।

মেহেদি কাকুর বয়েস তখন সতেরো কি আঠারো। সবার সন্দেহ ছিল, তিনিই পিতার হত্যাকারীর কিছু একটা করেছেন। অন্তত পুলিশ সেভাবেই এগোতে চাইছিল। কে জানে, এটা দাদার পকেট থেকে আরও কিছু খসাবার ফন্দিও হতে পারে। যাই হোক, আর দেরি করেননি দাদা। পাপা তখন কোলকাতায় লেখাপড়া করত। তার কাছেই পাঠিয়ে দেন কাকুকে। সেই থেকে তিনি আমার বাবার ছায়াসঙ্গী। এক মুহূর্তের জন্যও পাশ ছেড়ে যান না।

পাপা তো ব্যস্ত সায়েন্টিস্ট। তাই কাকুই অধিকাংশ কাজে সঙ্গ দিতেন। স্কুলে ভর্তি করানো, আনা নেওয়া করা, বেতন দেওয়া, কলেজে আনা নেওয়া করা, কোনো কিছু লাগলে সেটার ব্যবস্থা করা– এসব তিনিই করতেন। প্রতিদিন কেবল খাবার টেবিলে দেখা হতো পাপার সাথে। সারাদিনের ফিরিস্তি শুনতেন তখন। সম্ভবত আগেই কাকু তাকে সব জানিয়ে রাখতেন, সেটাই মিলিয়ে নিতেন পাপা।

এই হলো আমার পাপা আর তার ছায়াসঙ্গী, মেহেদি কাকুর আখ্যান।

-৫ মাস

এবার থেকে ভাবছি একটু ডায়েরি লেখায় মনোযোগী হব।

না হয়ে উপায়ই বা কী? ডাক্তার সাহেব বলে দিয়েছেন, যতটা সম্ভব কম বাড়ির বাইরে যেতে। ভার্সিটিতে পড়া একটা মেয়ে, বাড়ির বাইরে যাবে না। বিশ্বাস হয়? মাত্র কয়েকদিন আগেই তো মাইক্রোবায়োলজিতে ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কপাল ভালো,

নিয়তিও চান্স পেয়েছে এই একই সাবজেক্টে। দুই বান্ধবীর মেলবন্ধনে তাই ছেদ পড়েনি।

ডাক্তার আংকেল পাপার পরিচিত। দেশের সেরা নিউরোলজিস্টদের একজন। ক্যান্সারের এক বিশেষজ্ঞ আমাকে দেখে তার কাছেই রেফার করেন। বয়স্ক আংকেল নাকি এই বিশেষজ্ঞের শিক্ষক ছিলেন। আমাকে সাবধান করে দিয়ে আংকেল বললেন, 'ইয়াং লেডি, বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করা যাবে না।'

কারণটাও ফেলে দেওয়ার মতো না, আরও নাকি বিস্তার হয়েছে ক্যান্সার সেলের। মস্তিষ্কের নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে এখন। রাস্তাঘাটে খিঁচুনিও উঠতে পারে। এটা একটা সমস্যাই। তবে নিয়তি যেদিন যেদিন ভার্সিটি যাবে, সেদিন সেদিন ভার্সিটি যাবার অনুমতি পেয়েছি আপি আমি।

বাঁচবই আর কয়দিন, তার মাঝেও এতো নিষেধাজ্ঞা ভালো লাগে?

ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে। পাপা তো সঙ্গে যেতে পারেন না, তাই প্রায় প্রতি বছর কাকু, আমি, নিয়তি আর ওর আব্বু-আম্মু বেড়াতে চাই। একবার কক্সবাজার গিয়েছিলাম, আরেকবার বান্দরবানে। সিলেট, জাফলং, রাঙামাটিও বাদ পড়েনি। এবার ইচ্ছা ছিল সুন্দরবন যাব, কিন্তু...

-৪ মাস ১০ দিন

রেগুলার ডায়েরি লিখতে চেয়েও, কোনোভাবেই পারছি না।

গত বিশটা দিন গিয়েছে খুব দৌড়াদৌড়িতে। না, না। আমি দৌড়াইনি। দৌড়াইছে দৌড়িয়েছে আমার পাপা আর কাকু। কারণটা যে আমি, তা নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না?

আঠারো দিন আগের কথা। নিয়তিকে সাথে নিয়ে ভার্সিটি থেকে ফিরছিলাম। নতুন ক্লাস শুরু হয়েছে, জানি কোর্স শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব না। কিন্তু গল্প-কবিতা-উপন্যাসে যে ভার্সিটি লাইফের এতো গল্প শুনেছি, সেটা উপভোগ না করে মারা গেলে, ভূত হতে হবে নির্ঘাত। দেখা যাবে, নিয়তির ওপর ভর করে ক্লাস করে বেড়াচ্ছি। অবশ্য তাতেও মজা কম হবে না।

যাই হোক, ভার্সিটি-এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার জন্যই ক্লাসে যাচ্ছিলাম। বাসায় সব সময় থাকতেও তো ভালো লাগে না। কেমন একটা গুমোট পরিস্থিতি। মনে হয় যেন আরও চার মাস না, চার ঘণ্টা পরেই মারা যাব। পাপার চেহারার দিকে তাকাতে মায়া লাগে। নাওয়া-খাওয়া-গবেষণা, সব ছেড়ে দিয়েছেন। আগে কয়েক মাস পরপরই হিল্লি-দিল্লি-আমেরিকা করে বেড়াতেন। এখন ওসবেও তার মন নেই। এই অবস্থা দেখতে কার ভালো লাগে? ফ্রয়েড না কে যেন বলেছিলেন, প্রতিটা মেয়ের কাছেই তার বাবা হচ্ছেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তার হিরো। আমার আদর্শও আমার পাপা। তাই তার এমন ভেঙে পড়া অবস্থা দেখতে আর ভালো লাগে না।

আসল কথায় আসি, ভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। ক্লাস করে দুই বান্ধবী রিকশা নিয়ে ফিরছি। এই রিকশা জিনিসটাও খুব অদ্ভুত, তাই না? চারপাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। যখন গাড়িতে চড়ি, তখন মনে হয় এই জঞ্জালগুলো না থাকলে কত ভালো হতো। জ্যাম-ট্যাম কিছু থাকত না রাস্তায়। আর যখন রিকশায় চড়ি, তখন গাড়ির

আরোহীদের দেখে মায়া হয়। মনে-মনে বলি, কী যে মিস করছ, তা নিজেরাও জানো না।

রিকশা নিয়ে যখন বনশ্রী মেইনরোডে আসলাম, তখন কেমন যেন এক অস্থিরতা ভর করল মনে। অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠছিল বুক। মনে হচ্ছিল যেন বিপজ্জনক কিছু একটা হবে। প্রথম কিছুক্ষণ পাত্তা দেইনি। কী আর হবে? নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। পরক্ষণেই মনে পড়ল আংকেলের সাবধানবাণীর কথা, মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ক্যান্সার। যেকোনো মুহূর্তে খিঁচুনি শুরু হয়ে যেতে পারে। আর হলে বিপদ হতে পারে।

নিয়তির দিকে ঘুরে বলতে যাব যে আমার খারাপ লাগছে, ঠিক সেই সময় অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। আমার আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলে দেখি আমি হাসপাতালে। বড়ো বড়ো হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে, পাপা আমাকে নিয়ে এসেছেন নিউরোলজিস্ট আংকেলের হাসপাতালটায়। জ্ঞান ফিরেই দেখি, পাপা আর কাকু উদ্বিগ্ন চেহারায় আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফোঁপানির শব্দ কানে এলে, তাকালাম একবার চারপাশে। ওই যে নিয়তি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জলি আন্টি আপ্রাণ চেষ্টা করেও ওকে শান্ত করতে পারছেন না। আমাকে চোখ খুলতে দেখে, সাদা পোশাক পরা নার্স কোথায় যেন চলে গেল। কিছুক্ষণের মাঝেই বদরাগী চেহারার ডাক্তার আংকেল এসে উপস্থিত।

‘তোমার কি কোনোদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না, প্রীতম?’ এসেই পাপাকে ঝাড়তে শুরু করলেন তিনি। চেহারা রাগে লাল হয়ে আছে। পাপাকে এমনভাবে ঝাড়ি খেতে দেখাটা আমার জন্য নতুন এক অভিজ্ঞতা। তাই অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ‘অসুস্থ মেয়েটাকে এভাবে একা ছাড়লে। বারবার বলেছি, সময় এখন ক্রিটিক্যাল। ব্রেইন ম্যাটার টাচ করতে শুরু করেছে ক্যান্সার। এখন সিজার থেকে শুরু করে আরও অনেক ধরনের অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে,

বেহুদা কথা খরচ করেছি। যদি মারাত্মক কিছু হয়ে যেত তো?' এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলেন তিনি।

'আসলে হয়েছে কী...' দুর্বল কণ্ঠে বলতে শুরু করলাম আমি। প্রথম-প্রথম একটু মজা লাগলেও, এখন পাপার চেহারা দেখে মায়া লাগছে। কিন্তু আমাকেও ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন আংকেল।

'তুমি রেস্ট নাও, ইয়াং লেডি।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'তোমার সঙ্গে কথা পরে হবে। আগে তোমার এই বিশ্ববিখ্যাত বাপটাকে একটু সামলে নেই।'

আরও কিছুক্ষণ চলল তার বকাবকি। এরপর সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন।

'কেন শুধু-শুধু সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলছ, মা?' আশ্চর্যরকম কোমল শোনাল তার গলা। এই লোকটাই যে একটু আগে ঘর শুদ্ধ সবাইকে বকাঝকা দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিল, তা আর কে বলবে?

'আংকেল, আমার বয়স কত, বলুন তো?'

একটু থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। 'বিশ।'

'ঠিক বলেছেন, আপনার বয়স কত?'

আরও অবাক হয়ে গেলেন তিনি। 'ষাট।'

'আমি কি ষাট বছর বাঁচব?'

চুপ করে বসে রইলেন আংকেল, বুঝতে পারছি অক্ষমতাটুকু তাকে বড়ো পীড়া দিচ্ছে। রোগীর মুখে এমন কথা কোন ডাক্তার শুনতে চায়?

'আংকেল, হাতে আর অল্প কদিন সময় আছে। এই সময়টাও ঘরে বসে নষ্ট করব? কেন আংকেল? আপনি ষাট বছর বেঁচেছেন। কত

জায়গা ঘুরেছেন, কত কী দেখেছেন? আমি অসুস্থ মানি। কিন্তু আপনার এই ষাট বছরের অভিজ্ঞতার সমান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমার হাতে যে আর মাত্র চার মাস আছে। এই চার মাস ঘরে বসে বসে সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেব? বলুন?'

উত্তর নেই।

'আংকেল, দেশের ভেতরে কোথায় কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন, বলুন তো আমাকে?'

'অনেক জায়গায় গিয়েছি। বান্দরবান, ছেঁড়া দ্বীপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মংলা, বাগেরহাট, মহাস্থানগড়, শালবন, সুন্দরবন।' একটু থেমে থেমে জবাব দিলেন তিনি।

'আহ, অনেক জায়গায় গিয়েছেন তো। সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে কোন জায়গা?'

'সুন্দরবন!' হাসি ফুটে উঠল আংকেলের চেহারায়।

'আন্টিকে নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি?' দুষ্টামি করলাম।

হেসে ফেললেন তিনি। 'চালু মেয়ে। হ্যাঁ, তোমার আন্টিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আসলে হানিমুনেই গিয়েছিলাম সুন্দরবন। দারুণ জায়গা, বুঝলে।' বলেই শুরু করে দিলেন সুন্দরবনের বর্ণনা। উচ্ছ্বাসটুকু দেখতে খুব ভালো লাগছিল। তারচেয়ে ভালো লাগছিল সুন্দরবনের বর্ণনা শুনতে। 'তোমার আন্টি তো ট্যুর শেষে বলছিলেন, সুন্দরবনে না এলে জীবনটাই বৃথা যেত।' বলে শেষ করলেন তিনি। সাথে-সাথেই চেহারা কালো হয়ে গেল। এক মৃত্যু পথযাত্রীর সামনে যে কথাটা বলা উচিত হয়নি, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন।

তবে আমি ছাড় দিলাম না। 'আচ্ছা আংকেল, আমি সুন্দরবনে যাইনি। আমার জীবনটা কি তাহলে বৃথাই থেকে যাবে?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, উঠে গেলেন তিনি।

তারপর থেকে আর আমার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দেননি।

বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে কাটিয়ে, এক সপ্তাহ আগে ফিরে এসেছি বাসায়। দুর্বল দুর্বল লাগছিল খুব শরীর, তাই এই কয়দিন আর বসিনি।

-৩ মাস ১০ দিন

ডাক্তার আংকেলের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই, মাথার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল সুন্দরবনের কথা। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় বেড়াতে যাবার কথা পাপাকে বলি কী করে?

সুযোগের অভাবে তাই চুপ করে বসে থাকতে হচ্ছিল, আচমকা পাপাই সুযোগটা করে দিলেন। কীভাবে? বলছি। তবে শোনার পর আমাকে হৃদয়হীন বলতে পারবেন না কিন্তু!

যতই দিন যাচ্ছে...যতই আমার শেষ দিন এগিয়ে আসছে, ততই পাগলাটে হয়ে উঠছেন পাপা। পীর-ফকির, হিন্দু বাবা, দরবেশ-সন্ন্যাসী, যেখানেই একটু আশার আলো দেখছেন, সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন পঙ্গপালের মতো! আমাকেও যেতে হচ্ছে সাথে। সত্যি বলতে কী, এখন বিরক্তই লাগে পুরো ব্যাপারটায়। তবে পাপার শুকিয়ে আসা মুখটা দেখে না-ও করতে পারি না।

আজরাতেও তেমন এক বাবা, বাবা পরমেশ্বরের আসার কথা বাসায়।

বাবা নাকি শাক্ত সম্প্রদায়ের অনেক বড়ো মাপের সিদ্ধি-প্রাপ্ত সাধক। শাক্ত সম্প্রদায় মানে বোঝেন তো? সহজ কথায় বুঝিয়ে দেই, যারা শিবের ভক্ত, তাদেরকেই শাক্ত বলে। ব্যাস, আর কিছু জানার দরকার নেই।

পাপা নিজেও শাক্ত। মনসা দেবী তো শিবেরই কন্যা, তাই না? তাই এক হিসেবে পাপা শিবেরই প্রার্থনা করছেন। মনসা দেবী কিন্তু খুব জাগ্রত। ভক্তদের যেমন ভালোবাসেন, তেমনি খুব কঠোর আচরণ করেন অবাধ্যদের প্রতি।

যাই হোক, এক শাক্ত আরেক শাক্তকে খুঁজে পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

আজরাতে তাই পাপার অনুরোধে এক যজ্ঞে বসতে হবে আমাকে। মাঝখানে থাকবে শিব আর পাপার সেই মনসা মূর্তি। তার একপাশে আমি আর অন্য পাশে সাধু বাবা। মনসা দেবীকে অনেকেই গুটি বসন্ত টাইপ রোগের আরোগ্যদাত্রী বলে মনে করেন। আর সাপের বিষের যে ওষধি গুণ আছে, তা কে না জানে? তাই শিবের পাশে পাপার আরাধনার প্রতিমাও রাখা হবে। সারারাত ধরে মন্ত্র-টন্ত্র পড়া হবে, আমার মাথায়-গায়ে ছিটান হবে মন্ত্রপূত গঙ্গার জল। রাতভর চলবে এই যজ্ঞ। এর জন্য সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে আমাকে, এমনকী পানিও জলও স্পর্শ করা নিষেধ।

নিজে এত বড়ো বৈজ্ঞানিক হয়েও, পাপা কীভাবে যে এই বাবার পাল্লায় পড়লেন, তা বুঝতে পারছি না। আমি নিজেও যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্রী, তাই এসবে বিশ্বাস নেই খুব একটা। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু এসব মন্ত্র-টন্ত্রে? অসম্ভব। অবশ্য যে পিতার একমাত্র কন্যা কদিন পর মারা যেতে চলেছে, সে যদি কিছুটা অযৌক্তিক আচরণ করেই ফেলে, মাফ মনে হয় করে দেওয়া যায়।

যাই হোক, আজ রাতে বসতে হবে সাধুর সঙ্গে। প্রথম যখন পরশুদিন পাপা প্রস্তাবটা দেন, সরাসরি না করে দেই আমি। কিন্তু পাপা যখন ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আরেকবার অনুরোধ করেন, তখন আর না করতে পারিনি। রাজি হয়ে যাই, তবে একটা শর্তে।

আমাকে আর নিয়তিকে সুন্দরবন বেড়াতে যাবার অনুমতি দিতে হবে।

আঁতকে ওঠেন পাপা। বলেন, 'এই অসুস্থ শরীরে বাইরে যাবে মানে? তা-ও সুন্দরবনের মতো জায়গায়?'

'একা তো আর যাচ্ছি না, সঙ্গে নিয়তিকেও নিয়ে যাব।'

'তোমাকে চোখের আড়াল হতে দিলে, আমি একদম শান্তি পাব না যে।'

'কিন্তু, পাপা,' কিছুটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করলাম বলা চলে। 'আমি যে মরার আগে একবার সুন্দরবন দেখে যেতে চাই! জায়গাটা আমাকে খুব টানছে।'

আমার ছল-ছল করতে থাকা চোখের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা যে পাপার নেই, তা ভালো করেই জানি। আগেও অনেক অসম্ভব দাবি মানিয়েছি তাকে, এটাও মানাতে পারব। আর তাছাড়া, যে মেয়ে মারা যাচ্ছে, তার কথা ফেলার মতো পাষণ্ড কে হতে পারে?

তবে হ্যাঁ, আমাকেও কিছু ছাড় দিতে হবে। পাপা বলবে, মেহেদি কাকুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। সেটা মেনে নিতে হবে আমাকে। অবশ্য জাতে মাতাল হলেও, আমি তালে ঠিক। রাস্তায় আমার সমস্যা হলে সেটা নিয়তি সামলাতে পারবে না কোনোমতেই। তাই মেহেদি কাকু গেলে ভালোই হবে।

হলোও তাই, পাপা বললেন, 'ঠিক আছে, যাও। তবে মেহেদিকে সঙ্গে নিতে হবে।'

প্রতিবাদ করার ভান করলাম আমি। কেননা কিছুই না বলে চুপচাপ মেনে নিলে, সন্দেহ হতে পারে পাপার। ‘কিন্তু পাপা–’

‘কোনো কিন্তু না।’ হাত উঁচিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন তিনি। ‘হয় মেহেদি তোমার সঙ্গে যাবে, নইলে তোমাদের যাবারই দরকার নেই।’

এমনভাব করলাম, যেন নিমরাজি হচ্ছি। অথচ ভেতরে ভেতরে টগবগ করছি উত্তেজনায়। ‘ঠিক আছে, পাপা।’

নিজের ঘরে এসেই ফোন দিলাম নিয়তিকে। ‘সুখবর আছে, পাপা রাজি!’

-২ মাস ২৫ দিন

তীব্র উত্তেজনায় কেটে গেল এই পনেরোটা দিন। আজ রাতেই রওনা হচ্ছি আমরা। গোছগাছ করতেই কেটে গেল সময়টা, যেন চোখের পলকে। খুশির খবর হচ্ছে–আজ রাতে রওনা দিচ্ছি আমরা। প্রথমে ট্রেনে করে খুলনা, সেখান থেকে ভাড়া করা লঞ্চ নিয়ে সোজা সুন্দরবন। সব অনুমতি নেওয়া শেষ। আগে-ভাগে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসেছেন কাকু। তাই আমাদের একদম সমস্যা হবে না। এখন শুধু রওনা দেবার অপেক্ষা।

ওই যে, বেল বাজছে বাসার। নিশ্চয়ই এসে গিয়েছে নিয়তি। পাপা অবশ্য বলছিলেন গাড়ি নিয়ে খুলনা যেতে। কিন্তু ট্রেন জার্নি করার লোভ আমরা দুই বান্ধবী ছাড়তে পারিনি। তাই ট্রেনেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সাথে করে নিয়ে যাব এই ডায়েরিটা। সম্ভবত এই জীবনের শেষ অভিযান হতে যাচ্ছে এই ট্যুর। তাই তার উল্লেখযোগ্য অংশটুকু লিখে

রাখতে চাই। আজ এটুকুই।

- ২ মাস

বিশ দিনের লম্বা ট্যুর শেষে আজ ফিরলাম বাসায়। অদ্ভুত সব জিনিস দেখেছি এই কয়দিনে। ইচ্ছা ছিল, দিনপঞ্জি লিখে রাখব। কিন্তু তা আর হলো কই! যে অভিজ্ঞতা হলো, তা ভাবতে গিয়ে এখনও মাথা চক্কর খাচ্ছে। তাই ভাবলাম, মাথাটা একটু ঠান্ডা করে তবে লিখতে বসব! এই কথাগুলোকে মৃত্যুপথযাত্রী এক মেয়ের কল্পনা হিসেবে যদি ধরে নেন, তাহলে আপনাকে দোষ দিতে পারব না। নিয়তির সাথে কথা বলে ঠিক করেছি, কখনও এসব নিয়ে কথা বলব না আমরা। কখনওই না! মেহেদি কাকুকে বলব না, বলব না পাপাকেও!

বললেও তারা কেউ বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না। আমার নিজেরই হতে চায় না মাঝে-মাঝে।

আসল ঘটনায় যাবার আগে, অল্প কথায় প্রথম সাত-আট দিনের খতিয়ান দিয়ে নেই। খুলনা পর্যন্ত ট্রেনে যেতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি আমাদের। সেখানে গিয়ে দেখি, স্টেশনের কাছেই স্টেশন ঘাট, মানে লঞ্চ ছাড়ার জায়গা। আগে থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা লঞ্চ। নানা সরঞ্জাম দিয়ে ভরতি করে রাখা। খাবার-দাবার নেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সেই সঙ্গে একটা তাঁবুও। লঞ্চের ক্রু চারজন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, মাঝে-সাঝে নাকি বাবুরা, মানে বিদেশিরা আসে। তারা বনের ভেতর রাত কাটাতে চায়। তাই অনুমতি না থাকলেও, সেই ব্যবস্থা করে দেয় মাঝিরা। যদি বাঘ

ধরে? এই প্রশ্নটা করতেই হেসে ফেলল ওরা। জানাল–কোথায় বাঘ নেই, তা ওদের ভালো করেই জানা আছে। তাই এমনই কোনো জায়গায় নিয়ে তাঁবু ফেলে দেয়।

খাবার-দাবার আর সরঞ্জামাদি ঠিক আছে কিনা, তা একবার দেখে নিলেন মেহেদি কাকু। তবে রওনা দেবার আগে একদিন থাকতে বাধ্য করলেন পর্যটন মোটেলে। সকালের ট্রেনে রওনা দিয়েছি আমরা। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকাল। তাই সেদিন আর রওনা দিলেন না।

রাতের বর্ণনা আর দিলাম না। শুধু বলি, সময়টাকে কাজে লাগালাম আমি আর নিয়তি। খুলনা শহরটা ঘুরে দেখলাম এক ফাঁকে।

পরের দিন সকাল সকাল কাকু ডেকে তুললেন আমাদের। এখুনি রওনা হতে চান তিনি। আমাদের আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। এজন্যই তো এসেছি। আধ-ঘণ্টার মাঝে নাস্তা সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। কে যেন বলেছে–মেয়েরা তৈরি হতে দিন লাগিয়ে দেয়! আমাদের স্পিড দেখলে নিঃসন্দেহে বেআক্কেল বনে যেত!

প্রথম দিন গেলাম করমজলে। দারুণ একটা জায়গা। যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না। কাকু আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, এখানে বেশি সময় কাটানো যাবে না। কিন্তু দুই বান্ধবী যেন জায়গাটার সৌন্দর্যে হারিয়ে গেলাম। বেশি বর্ণনা দেওয়ার মাঝে যাব না। শুধু বলব, নিজে ওখানে যাওয়া উচিত সবার। জীবনে অন্তত একবার হলেও। হরিণের পাল, বানর, বিশাল কুমির...নাহ থাক, নিজ চোখেই দেখে নেবেন নাহয়।

সমস্যা হলো, এসব দেখতে গিয়ে অনেক বেশি সময় নষ্ট করে ফেলি আমরা। তাই লঞ্চের কাছে ফিরে এলে মাঝিরা বলল, এখন রওনা দিলে, ভাটার সময় কোনো-না-কোনো চ্যানেলে আটকা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ফিরে গিয়ে সেদিন রাতে রওনা দেওয়াই ভালো। ওরা

নাকি গত রাতেই রওনা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের বিশ্রামের কথা ভেবে রাজি হননি মেহেদি কাকু।

আরেকটা দিন নষ্ট করার ইচ্ছা ছিল না আমাদের, বিশেষ করে করমজলের অভয়ারণ্য দেখার পর তো নয়ই। কিন্তু স্থানীয় মাল্লাদের পরামর্শ তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না! তাই ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। নিয়তি বলল, আজ যেহেতু যাওয়া হচ্ছে না। তাই নাহয় করমজলেই আরও কিছুটা সময় কাটানো যাক। তাই করলাম।

সেদিন রাতেই খুলনা থেকে ছাড়ল আমাদের লঞ্চ...আরেকবার। এবার আর সুন্দরবন না দেখে ফিরছি না।

পরেরদিন ভোরে চোখ খুলে দেখি, লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এসে কাকুকে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম, আমরা নাকি কটকায় এসে উপস্থিত হয়েছি। হরিণ দেখার জন্য জায়গাটা খুব বিখ্যাত। বিধাতা সম্ভবত আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন, এক ঘণ্টার মাঝে হরিণের দেখা পেলাম আমি!

একে-একে জামতলা সী-বিচ, পন্টুন, হাড়বাড়িয়া, কচিখালি দেখা হয়ে গেল। সাধারণত সবাই কিছুক্ষণ করে থাকে এসব জায়গায়। রাত কাটাবার দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। আমরা বের হয়েছি শেষ যাত্রায়। তাই প্রত্যেক জায়গায় একদিন করে থাকলাম। ওই জায়গার বিখ্যাত সব কিছু দেখে, আর সব কিছু খেয়ে তবেই রওনা দিলাম পরের জায়গার উদ্দেশ্যে।

কোনোটারই বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। সম্ভব হলে পরে কখনও লিখব। সপ্তম দিনের মাথায় আমরা এসে উপস্থিত হলাম টিয়ার চরে। মেহেদি কাকু খুব করে আপত্তি করেছিলেন। এদিকটায় আসা নাকি নিরাপদ না। কিন্তু মাল্লারা জানাল, এখন আগের মতো ঝামেলা হয়

না। সহজেই সামাল দেওয়া যাবে সব সমস্যা। তাই আমরাও পেয়ে বসলাম। চেপে ধরতেই রাজি হয়ে গেলেন মেহেদি কাকু।

এখানেই ঘটা ঘটনাগুলো বলার জন্য ক্লান্ত শরীরে ডায়েরি নিয়ে বসেছি।

সকাল সকালই পৌঁছে গেলাম জায়গাটায়। শ্যালা নদী ধরে যেতে হয়, নদীটা খুব একটা চওড়া না যদিও, তবুও আমাদের লঞ্চের অসুবিধা হলো না। সুন্দর একটা জায়গায়। প্রথম দেখাতেই জেনে প্রেমে পড়ে গেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, নির্জন এই জায়গায় অন্তত দুটো দিন কাটিয়ে দিব।

ভাগ্যিস নিয়েছিলাম সিদ্ধান্তটা। নইলে সালেহার সাথে দেখা হতো না। হতো না চরম এই অভিজ্ঞতাও!

প্রথম থেকেই বলি। টিয়ার চরে নামার দিনের কথা। মাল্লারা জানাল, এখানেই, একটু ভেতরের দিকে বাস করে অদ্ভুত এক সম্প্রদায়। আকারে-চলনে-বলনে অন্যান্যদের সঙ্গে খুব একটা মিল নেই। বাংলাদেশিই সবাই, তবে প্রথম দেখায় বিদেশি বলেই মনে হয়। মাছ ধরে আর গাছের পাতা বিক্রি করে কাটে এদের জীবন। অদ্ভুত রকমের বনচারী এরা, নিজেরা দেখা না দিলে কেউ দেখতে পায় না!

অদ্ভুত গোত্রটার ব্যাপারে কৌতূহল জন্মালো। খুব করে ইচ্ছা হলো দেখার।

ভাগ্য খুব দ্রুতই এনে দিল সেই সুযোগ।

বিকালের দিকে আচমকা হৈ-চৈ শুনতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল বলে দুপুরের দিকে শুয়েছিলাম একটু। বের হতেই দেখি, এক প্রায়-বৃদ্ধ মহিলা বসে আছে ডেকের ওপরে।

চেয়ারে বসা কাকুর কাছে কাকুতি-মিনতি করছে। কিন্তু কাকুর চেহারা শক্ত, একটা বাক্যও সরছে না তার মুখ দিয়ে।

লঞ্চের প্রধান মাঝিকে ডাকলাম কাছে। লোকটা মাঝবয়সি। আমাকে কেন যেন খুব পছন্দ করে ফেলেছে, মা ছাড়া কথাই বলে না। মাঝি কাছে আসতেই ফিসফিস করে জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছে?'

'এই চরে একটা গোত্র বাস করে, উরগ গোত্র।' বললেন তিনি। 'এই মহিলা সেই গোত্রের প্রধান। ওর ছেলে একটাই, যুবক বয়সি। গাছ থেকে পাতা পাড়তে গিয়ে তাল সামলাতে পারেনি। আছড়ে পড়েছে মাটিতে। কয়েকবার বমি করে সেই যে অজ্ঞান হয়েছে, আর কোনো খবর নেই! মহিলা তাই অনুরোধ করছে মেহেদি সাহেবকে; ছেলেটার জান বাঁচাবার জন্য এখুনি লঞ্চ নিয়ে খুলনার দিকে রওনা হওয়া দরকার।'

মা তো মা-ই। আমার মা নেই, তবে নিয়তির আছে। তাই জানি, সন্তানের কষ্ট দেখলে কেমন আইঢাই করে তাদের মন। এগিয়ে গেলাম কাকুর দিকে। বললাম, 'কাকু, একটু ভেতরে চলুন তো!'

আশার আলো খেলে গেল মহিলার চোখে। এদিকে বিরস বদনে আমার সাথে চললেন মেহেদি কাকু, ইশারায় প্রধান মাঝিকেও আসতে বললাম।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে প্রশ্ন করলাম মাঝিকে, 'খুলনা গিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে?'

কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলেন মাঝি। 'তিন দিন তো লাগবই, চাইর দিনও লাগবার পারে।'

মেহেদি কাকুর চেহারায় বিরক্তি খেলে গেল আবারো। 'দেখ, উমা, তোমার বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন–'

'আমাকে দেখে রাখার জন্য,' কাকুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম আমি। 'তাই বলে, আপনি চাইলেই একজনের জীবন বাঁচাতে পারবেন, অথচ আমার উছিলা দিয়ে বাঁচাবেন না–তা আমি মেনে নিব না।' সরাসরি কাকুর চোখের দিকে তাকালাম। 'জীবনের মূল্য কতটুকু, তা আমি আপনার চাইতে বেশি বই কম জানি না।'

আমার চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না কাকু। নজর সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তাহলে তোমাদেরকেও আমার সঙ্গে ফিরতে হবে। আমি এখানে তোমাদেরকে রেখে যেতে পারব না।'

আবার প্রধান মাঝির দিকে ফিরলাম আমি। 'এখানে বাঘ আছে?'

'না তো, মা।' অবাক দেখাল লোকটাকে। 'নেই।'

'জলদস্যু আছে?'

'তা-ও নেই।'

'এই গোত্র...মানে উরগ, এরা কী হিংস্র?'

'একদম না।'

এবার কাকুর দিকে ফিরলাম। 'আমার শরীরটা এমনিতেও ভালো লাগছে না,' তাকে ব্যতিব্যস্ত হতে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে যোগ করলাম। 'না, না। ভয়ের কিছু নেই। ক্লান্ত লাগছে খুব। আবার কয়েকদিন ভ্রমণের দখল না সয়ে, এখানে থেকে গেলে অসুবিধা কী?'

'থাকবে কোথায়?' জানতে চাইলেন কাকু। 'খাবে কী? এসব কী অবাস্তব সব কথা বলছ?'

আমিও কম যাই না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রীতম চক্রবর্তীর মেয়ে আমি। গলায় কাঠিন্য ঢেলে বললাম। 'ওই গোত্র-প্রধানের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য লঞ্চ দিচ্ছি। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করবে না ওরা? খেতে

দেবে না কিছু? আর যদি থাকার ব্যবস্থা না-ও করে, তাহলেও তো তাঁবু আছে সঙ্গে, নাকি?’

কিছু বললেন না কাকু, চুপ করে রইলেন। তারপর যোগ করলেন, ‘ঠিক আছে। তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকছি।’ ঘুরে তাকালেন মাঝির দিকে। ‘এই রিয়াজ, তুই নিয়ে যেতে পারবি না?’

লোকটার হয়ে আমি উত্তর দিলাম। ‘আপনাকেই যেতে হবে কাকু। যদি মাঝিরা আমাদের কথা ভুলে যায়?’ বলে হাসলাম মিষ্টি করে। ‘আর ভুলে না গেলেও, শুধু-শুধু দেরি করতে পারে। নাহ, যেতে হবে আপনাকেই!’

অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কাকু। এটা তার অভ্যাস। দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেন না তিনি। ‘নাহ, এই কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব না। হয় তোমাদেরকেও সঙ্গে যেতে হবে, নয়তো আমি যাব না।’

কীভাবে মানাব লোকটাকে, বুঝে পেলাম না। আসলে নিয়তির সঙ্গে কয়েকটা দিন একা-একা অ্যাডভেঞ্চার করে কাটাতে চাই। মেহেদি কাকু থাকলে সেটা সম্ভব না। এই কটা দিন এমনভাবে আমাকে নজরে রেখেছেন, যেমনভাবে মুরগি তার বাচ্চাদের দেখে রাখে। করমজলে দেরি করার পর, এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দেননি।

‘তাই?’ অবশেষে মুখ খুললাম। ‘তাহলে শুনে রাখুন, এখন থেকে আর একটা ওষুধও আমি মুখে তুলব না।’ বলেই ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেলাম বাইরে। নিজের কেবিনে ঢুকে বের করে আনলাম ওষুধের শিশি। আমার উদ্দেশ্য তো আর ওষুধ ফেলা না, জীবনের এই শেষ কয়েকটা দিন আরও কমাতে চাই না। তাই মিনিট তিনেক বসে

রইলাম কেবিনেই, খুব করে চাইছি যেন মেহেদি কাকু এসে বাধা দেন। তা হলো না দেখে বাধ্য হয়েই বাইরে চলে এলাম।

কাকু আমার কেবিনের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ইচ্ছা করেই ঢোকেননি ভেতরে। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তার নজর। হাতে ওষুধের শিশি দেখা মাত্র বুঝতে পারলেন যে কী করতে চাইছি। এক লাফে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। হাত থেকে কেড়ে নিলেন ওষুধের শিশি। 'তুমি যেভাবে চাইছ, সেভাবেই হবে সব।' পরাজয় মেনে নিলেন তিনি।

সন্ধ্যার দিকে নিয়তিকে সাথে নিয়ে চরের ভেতর দিকে পা রাখলাম। তাঁবু খাটিয়ে সামনের কয়েকটা রাত কাটিয়ে দিতে হবে।

আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন মেহেদি কাকু। পুরো জাহাজে একমাত্র প্রধান মাল্লা, মানে রিয়াজই তার পরিচিত। কীভাবে, তা আমি জানি না। যাই হোক, আমাদের ভার লোকটার হাতে দিয়ে লঞ্চ নিয়ে রওনা দিয়েছেন তিনি।

অনুমতি পাওয়া মাত্র ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন গোত্রপ্রধান। বাংলাদেশে গোত্রের প্রধান নারী, এমনটা কেবল আদিবাসীদের মাঝেই দেখা যায়। তবে সুন্দরবনে এসেও দেখতে পাব এমনটা–তা ভাবিনি।

মহিলার নাম সালেহা। নিজে যাননি লঞ্চের সাথে, শক্তপোক্ত এক যুবককে পাঠিয়েছেন। কে যেন তাকে জানিয়েছে, আমি জোর না দিলে লঞ্চে ওঠানো হতো না তার সন্তানকে। তাই ঘুরঘুর করছেন আশপাশে। একবার এসে তার কুটিরে থাকার অনুরোধও করলেন। আমরা রাজি হলাম না। শুধু-শুধু আরেকজন মানুষকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তবে তিনিও শক্ত, আমাদেরকে তাঁবু নিয়ে তাদের গ্রামে যেতে বাধ্য করলেন। জানালেন, নিরাপত্তার জন্য হলেও তাদের আশপাশে থাকতে হবে আমাদের। না করার কোনো কারণ দেখলাম না, নদীর

ধারেই তাঁবু খাঁটিয়ে দুইজন মেয়ে মানুষ রাত কাটাব, এতটা বোকা নই আমরা। রিয়াজও সঙ্গী হলেন আমাদের।

ক্লান্তিটা যায়নি শরীর থেকে। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। একঘুমে কাটিয়ে দিলাম পুরো রাত।

পরেরদিন সকালে উঠেই তোড়জোড় শুরু হলো। দিন দুয়েকের স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছে। এটা হেলায় হারাবার কোনো অর্থ হয় না।

তবে তার আগে নাস্তা করা দরকার। কী করা যায় ভাবতে না ভাবতেই, তিনটা পাত্র নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন সালেহা। জানালেন, আমাদের সাথে নাস্তা করার জন্যই এসেছেন তিনি। কথা না বাড়িয়ে নিয়ে নিলাম পাত্র দুটো। সকালে ভাত খাবার অভ্যাস না আমার আছে, আর না নিয়তির। তারপরও, মাছ দিয়ে ভাত খেলাম পেট পুরো। অদ্ভুত নাম মাছটার–গনগইন্যা!

খাওয়া শেষে জানতে চাইলাম, আশপাশে দেখার মতো জায়গা আছে কিনা?

জবাব দিলেন সালেহা, 'তা কয়েকটা তো আছে। কিন্তু শুনলাম, তুমি অসুস্থ! যাইতে পারবে?'

'আমি ঠিকই আছি।' বিরক্তির সাথে বললাম। 'অসুস্থ হবার কথা কে বলল?'

'তোমাগো মাঝি,' জবাব দিলেন তিনি।

রাগে জ্বলে উঠল গা, কিন্তু কিছু বললাম না চুপ করে রইলাম। আমার চেহারা দেখে সম্ভবত বুঝে গিয়েছেন সালেহা, যে আমি অসুস্থতার কথা ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা পছন্দ করিনি। তাই বললেন, 'বলবার চায় নাই। আমিই জিগাইলাম। তোমারে ওষুধের শিশা হাতে দেখলাম তো, তাই।'

মহিলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

'মা,' যোগ করলেন তিনি। 'তোমারে একটা জায়গায় নিবার চাই। কাছেই। কিন্তু নৌকায় যাইতে হইব, যাইবা?'

'অবশ্যই।' বিনা দ্বিধায় বলে বসলাম।

পাশ থেকে আমার জামার হাতা টানল নিয়তি। ইংরেজিতে জানতে চাইল, 'চিনিস না, জানিস না। কার সঙ্গে কোথায় যাবি? মুক্তিপণের জন্য বন্দিও তো করে রাখতে পারে?'

বান্ধবী আমার চালাক মেয়ে, কিন্তু একটু বেশিই সাবধানী। 'মাঝির কাছে শুনিস নাই? এরা নিরীহ?' আমিও ইংরেজিতেই জবাব দিলাম।

'হুম, শুনছি।' জবাব দিল ও। 'তাই বলে শুধু-শুধু ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?'

হাসলাম এবার। 'ঝুঁকি কোথায়? কিডন্যাপ করার ইচ্ছা থাকলে তো রিয়াজ সাহেবকে বেঁধে এখনই করতে পারে। এরজন্য আরেক জায়গায় নেওয়ার দরকার কী?'

অকাট্য যুক্তিতে হার মানল নিয়তি। কথা বাড়াল না। আমি যোগ করলাম, 'ভয় পেলে তুই থাক। আমি একাই যাচ্ছি।'

মুখ ঝামটে উঠল মেয়েটা। 'নাহ, তুই যেখানে যাবি, আমিও যাব।'

সত্যি বলতে কী, এইজন্যই মেয়েটাকে এত পছন্দ করি আমি। ঘুরে তাকালাম সালেহার দিকে। জানালাম, 'চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন!'

সন্ধ্যার দিকে যাত্রা করলাম আমরা। যেখানে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে নাকি রাত কাটাতে হবে। রিয়াজ সাহেব আপত্তি করলেন খুব। কিন্তু মেহেদি কাকুই যেখানে আমার যাত্রা থামাতে পারেননি, সেখানে এই ভদ্রলোক তো কোন ছাড়।

তবে নিয়তিকে মানানো এত সহজ হলো না। কোথায় থাকব, কী খাব? এসব প্রশ্ন করল সে। নিরাপত্তার প্রশ্ন যে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটাও বুঝতে পারলাম। মুচকি হাসলেন সালেহা। জানালেন, ছই দেওয়া নৌকা নিয়ে যাব আমরা। তাই রাতে থাকতে অসুবিধা হবে না। শুকনো খাবারও আছে যথেষ্ট। আর নিরাপত্তার প্রশ্নটা যে নিয়তির মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তা পরিষ্কার টের পেলেন। তাই নিজে থেকেই জানালেন। একটা শাখা নদী ধরে যেতে হয় ওই পথে। তার গোত্রের লোকরা ছাড়া কেউ চেনেই না সেই শাখা। নিরাপত্তা নিয়ে ভাববারও দরকার নেই।

সন্তুষ্ট হয়ে নৌকায় উঠে বসল নিয়তি। আমিও বসলাম। নৌকা ছাড়লেন সালেহা। মহিলাকে দেখে বোঝা যায়নি যে তিনি কতটা শক্তপোক্ত। একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন নৌকাটাকে। কিছুদূর এগোতেই বললেন, 'আমরা অন্য কাউকে এমনিতে ওইখানে লয়া যাই না। গেলেও চোখ বাইন্ধা লই। আম্মারা, তোমরা ছইয়ের ভিতরে যাও। বাইরে দেইখ না।'

মহিলার অনুরোধ পালন করলাম আমরা। আমি খুশি মনে, নিয়তি বেজার হয়ে।

ঘণ্টা দুয়েক চলল নৌকা, আচমকা থমকে দাঁড়াল। বুঝতে পারলাম যে পৌঁছে গিয়েছি। আসলেই তাই। নোঙর ফেলে আমাদেরকে বাইরে বেরোতে বললেন সালেহা। আমাদেরকে জানালেন, পৌঁছে গিয়েছি। এবার হেঁটে যেতে হবে।

মশাল জ্বালিয়ে আমাদের সামনে সামনে চলতে লাগলেন সালেহা। আমরা পেছন পেছন।

আগে থেকে জানা ছিল না যে আজ পূর্ণিমা। চাঁদের রূপালি আলোয় অদ্ভুত লাগছে চারপাশ। সামনে কী আছে জানি না; কিন্তু তেমন

চমকপ্রদ কিছু না থাকলেও, পূর্ণিমা রাতে এই পথচলাই এত ঝুঁকি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হলো। হুমায়ূন আহমেদের বই পড়েছি অনেক, জোছনার আলোর প্রতি তার প্রচণ্ড টানের কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এমন রাতে চন্দ্রাহত হলে, কাউকেই দোষ দেওয়া চলে না।

চাঁদের আলোয় চন্দ্রাহত এই আমি রয়েছি দাঁড়িয়ে
নিজেকে যেন পেয়েছি খুঁজে অসংখ্যবার হারিয়ে!

সত্যি বলছি, নিজেকে তখন কবি মনে হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, খাতা নিয়ে বসে পাতার পর পাতা কবিতা লিখে ফেলি! ভাগ্য ভালো হাতের কাছে তখন এই ডায়েরি ছিল না। নইলে এই গল্প লেখার মতো সাদা পাতা অবশিষ্ট থাকত না!

যাই হোক, গল্পে ফিরে আসি। আধ-ঘণ্টার মতো হাঁটতে হলো আমাদের। আচমকা থমকে দাঁড়ালেন সালেহা, তার দেখাদেখি আমরাও। হাত তুলে দেখালেন সামনের দিকে।

প্রথম-প্রথম কিছুই দেখতে পেলাম না। বেশ কিছুক্ষণ পর, অন্ধকার চোখে সয়ে এলে ফুটে উঠল একটা অবয়ব। চমকে উঠলাম আমি, দূর থেকে ওটা দেখতে কেমন যেন মন্দিরের মতো লাগছে। একতলা একটা পাথরের দালান।

কাছে গেলাম আমরা। গিয়ে দেখি, ওটাকে দালান বলাটা ঠিক হবে না। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে বানানো হয়েছে একটা ঘর। ঘরটার কাছাকাছি আসতেই, কেমন একটা গন্ধ এসে ধাক্কা দিল নাকে।

নিয়তির দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর চেহারাও বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তবে সালেহার ভ্রুক্ষেপ নেই। সোজা এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কিছুক্ষণের মাঝেই নাকে সয়ে এলো গন্ধটা। মন দিয়ে চারপাশে তাকালাম একবার। নিজেকে আমি বৃক্ষবিদ দাবি করি না। তবে এই কয়দিনে আগ্রহের বসেই সুন্দরবনের বেশ কিছু গাছ চিনে নিয়েছি। সেরকম অনেকগুলো গাছ ঘিরে রেখেছে মন্দিরটাকে। তবে কোনোটাকেই ঠিক সজীব বলে মনে হচ্ছে না। কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণটাও খুব একটা বড়ো না। মাত্র দশ কি বিশ পা হবে। ছোটো একটা ঘর, এজন্যই দূর থেকে ঠিক দেখতে পাইনি। আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড়োঘরটার সমান।

ভেতরে ঢুকব কিনা, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কিন্তু সালেহার মাঝে দ্বিধা নেই। সরাসরি ঢুকে পড়লেন তিনি। একটু ইতস্তত করে তার সঙ্গী হলাম আমি আর নিয়তি।

ঘরে পা রাখা মাত্র ছোটোখাটো ধাক্কা খেলাম একটা! ঘরের একটা দেওয়ালের সাথে লাগোয়া অবস্থায় রয়েছে একটা বেদি। মেঝেটা মাটির, এখানে পাথর ব্যবহার করা হয়নি। তবে বেদিটা পাথরের। এতক্ষণ আন্দাজে মন্দির-মন্দির বলছিলাম। এবার নিশ্চিত হয়ে গেলাম। ওটা আসলেই মন্দির। কেননা বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা দেবী-মূর্তি। বেদির কয়েক হাত দূরে একটা গাছ। দেখে আপেল গাছ বলে মনে হয়। ফলও ধরে আছে কয়েকটা। কিন্তু কেন জানি আপেলের সঙ্গে বেমিলও আছে বেশ। বাইরের গাছগুলোকে অসুস্থ মনে হলেও, এই গাছটাকে ঠিক সুস্থ দেখাচ্ছে!

তবে ধাক্কাটা সেজন্য খাইনি। খেয়েছি মন্দিরের পূজারীদের দেখে!

বেদির সামনে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে একটা হরিণ আর একটা বানর। আমাদের প্রবেশ করতে দেখেও তাদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য

দেখা গেল না। প্রচণ্ড কাজে ব্যস্ত থাকার সময় ঘরে মানুষ ঢুকলে আমরা যেমন একবার তাকিয়েই আবার নজর ফিরিয়ে নেই, তেমনি একবার আমাদেরকে দেখে আবার মূর্তির দিকে ফিরল।

পুরো দৃশ্যটাই অপার্থিব মনে হলো আমার কাছে। এদিকে ভেতরে প্রবেশ করে চুপ হয়ে গিয়েছেন সালেহাও। চুপচাপ তাকিয়ে আছেন মূর্তির দিকে। নিয়তি বোধহয় এগোতে চেয়েছিল, হাত দিয়ে টেনে থামালেন ওকে।

মূর্তিটার দিকে ভালোভাবে তাকালাম আমি। আবারও চমকে উঠলাম। মা মনসার মূর্তি এখানে? সুন্দরবনের এত গভীরে যে তার পূজা হয়, তা আমার জানা ছিল না। আড়চোখে সালেহার দিকে তাকালাম। নাম শুনে তো মুসলমানই মনে হয়, তাহলে এখানে তিনি কী করছেন?

প্রশ্নগুলো পরবর্তী সময়ের জন্য তুলে রেখে, আবার চাইলাম মূর্তিটার দিকে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখার পর বুঝতে পারলাম–ওটা আসলে মনসা মূর্তি না। মূর্তিটার দেহ নারীর আদলে গড়া হলেও, চেহারাটা সাপের। মনসা পূজায় মূর্তি ব্যবহারই হয় কম। হলেও সেই মূর্তির এক চোখ সাধারণত নষ্ট থাকে, শিবের স্ত্রীর আঘাতে নষ্ট হয়েছিল সেই চোখ। এটাকেও তার গৌরব বলেই ধরে নেওয়া হয়। তাই সাপের মাথার মূর্তি অন্তত তার হবার কথা নয়! চমকে উঠলাম পরক্ষণেই। জলজ্যান্ত কয়েকটা সাপ কিল-বিল করছে মূর্তিটার গায়ে। ঘিন ঘিন করে উঠল গা, সাপ প্রাণীটাকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না। তার ওপর, ওগুলো যথেষ্ট বিপজ্জনক। নিয়তি দেখতে পেয়েছে কিনা জানি না। সম্ভবত পায়নি, পেলে চিৎকার করে মাথায় তুলত মন্দির।

একবার ভাবলাম, আস্তে-আস্তে সরে যাই জায়গাটা ছেড়ে। কিন্তু প্রাণী দুটোর ওপরে চোখ পড়া মাত্রই থমকে দাঁড়ালাম। সাপের প্রতি হরিণ বা বানরের কোনো আলাদা ভালোবাসা নেই বলেই জানি। অথচ শান্ত

হয়ে বসে আছে তারা। বুঝতে পারলাম, আজ রাতে স্বাভাবিক কিছু দেখতে পাব না। তাই চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানেই।

প্রায় আধ-ঘণ্টা ওভাবেই কেটে গেল। কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করব সালেহাকে, এমন সময় দেখতে পেলাম–গাছটা থেকে একটা পাতা ঝরে পড়ছে। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল হরিণটা, খুব কষ্টে হেঁটে গেল পাতাটার কাছে। প্রাণীটার একটা পা ফুলে আছে, আঘাত পেয়েছে সম্ভবত। হেঁটে-হেঁটে কোনোক্রমে পাতাটার কাছে গেল সে। তারপর ওটা খেয়ে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে এমনভাবে হেঁটে বেরিয়ে গেল যেন আমরা নেই-ই ওখানে! সাপগুলোর দিকেও ভ্রুক্ষেপ করেনি সে পাতা খাবার সময়!

আবারও অপেক্ষার পালা। এবার আর দেরি করতে হলো না। মিনিট পনেরো পরেই ঝড়ে পড়ল আরেকটা পাতা। সেটাকে তুলে নিলো বানরটা। তারপর বিদায় নিলো সে-ও। এই প্রাণীটাও আহত, হাতের একপাশ ফুলে আছে।

মন্দিরে এখন কেবল আমি, সালেহা আর নিয়তি।

আচমকা এগিয়ে গেলেন গোত্র-প্রধান। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে আনলেন একটা আপেল, মানে আপেলের মতো দেখতে ফলটা। এরপর সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন।

চুপচাপ নির্দেশ পালন করলাম আমি। কিন্তু নিয়তিকে দেখে বোঝা গেল, প্রশ্ন কিলবিল করছে ওর মাথায়। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থাকার ইশারা করলেন সালেহা। তারপর অনেকটা টেনেই বের করে আনলেন আমাদের।

‘এসব কী?’ বাইরে বের হওয়া মাত্র প্রশ্নবাণ শুরু করল নিয়তি।

আস্তে করে জবাব দিলেন সালেহা। ‘আম্মারা, নৌকায় চলো। তারপর সব বলি।’

নৌকায় ফিরে আসা মাত্র আবার মহিলাকে চেপে ধরল নিয়তি। অদ্ভুত এক গল্প শোনালেন তিনি।

‘আমার নাম সালেহা। সেইটা তোমরা জানো। আমি এই গোত্রের প্রধান। সেইটাও আম্মারা জানো। আমাদের এই গোত্র এইখানে কত দিন ধইরা আছে, কবে আইছে–সেগুলা আমরা জানি না। শুধু জানি, অনেক বছর ধইরাই আছি আমরা। আসলে আমাদের আগের জন্মের মানুষগুলো থাকত এই চরে। জেলে আছিলাম আমরা সবসময়ই। যহন মাছ কম পাইতে লাগল তারা, তখন সইরা গেল টিয়ার চরে।

‘আমি যে মুসলমান, হেইডা বুঝবার পারছ। কিন্তু আগের জন্মের হেরা আছিল হিন্দু। তারা এই দেবীর পূজা করত। এইখানে মন্দিরও হেরাই বানাইছে। আমাগোর পরিবার গোত্র চালায়া আসছে সবসময়। সেই সাথে এই মন্দিরের রক্ষকও। আমাগো দাদির মুখে হুনছি, হ্যায় আবার হ্যার দাদির মুখে হুনছে–এই দেবী নাকি খুব শক্তিশালী। যেকোনো রোগ অইলে হেইডার সমাধান পাওয়া যায় দেবীর কাছে। তবে শর্ত একটাই, মন্দিরে রাইখা আইতে হইব তারে। আমার পোলাটারেও রাখছিলাম একদিন। সুস্থও হইতেছিল। ক্যান যে বমি কইরা অজ্ঞান হইয়া গেল, বুঝতে পারলাম না। যাউগ গা, আমাগো গোত্রে কেউ অসুস্থ হইলেই তারে এখানে নিয়া আসা হয়। বানর-হরিণ দেখলা না? ওইগুলানও আসে। হ্যারা খায় ঘাস-পাতা। মানুষ খায় ফল।’ আমার হাতে ধরা ফলটার দিকে ইঙ্গিত করলেন সালেহা। ‘তুমিও খায়া নাও আম্মা। থাকবার পারলে ভালা হইত। অন্তত, ফলডা তো খাও।’

অশিক্ষিত মহিলা, ভাবলাম মনে-মনে। অদ্ভুত কিছু একটা আছে ওই মন্দিরে। কিন্তু সেটা এই মহিলা বুঝতে পারছে না। পরক্ষণেই মনে

পড়ল বিখ্যাত সেই লাইন: স্বর্গে-মর্ত্যে এমন অনেক জিনিসই আছে, প্রিয় হোরাশিও, যেগুলো তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!

কথা না বাড়িয়ে খেয়ে নিলাম তাই।

হাসি ফুটে উঠল মহিলার চেহারায়। যোগ করল, 'খোদা তোমার ভালা করুক। একখান অনুরোধ, এই জায়গায় যা দেখলা তার কথা কাউরে কইবা না।'

নিয়তি আমার দিকে, আর আমি নিয়তির দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'কথা দিলাম।'

সকালের আগেই ফিরে এলাম টিয়ার চরে। দেবীর ফলের আশীর্বাদেই কিনা জানি না, সুস্থ লাগছে কিছুটা নিজেকে। দিনটা আমাদেরকে নিয়ে ঘুরেই কাটালেন সালেহা। দ্বীপের নানা জিনিস দেখালেন। রাতে বসল গানের আসর। আধা-সভ্য মানুষদের মাঝেও যে গানের এত সমঝদার আছে, তা না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। গোত্রের অনুরোধে নিজের দক্ষতা দেখাতে শুরু করলেন সালেহা। তিনি যে এত দক্ষ হরবোলা তা বুঝতেই পারিনি। তার কণ্ঠে বাঘের ডাক শুনে বাচ্চারা ভয়ে কেঁপে উঠল।

তিন দিন পর আসার কথা ছিল মেহেদি কাকুর। ফিরে এলেন আড়াই দিনের মাথাতেই। সালেহার ছেলে, বেলালকে ঠিকমতোই হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন। ওষুধ-পত্রও কিনে দিয়েছেন বেশ কিছু। ডাক্তাররা বলেছেন, মাথায় চোট পেয়েছিল ছেলেটা। অবস্থা গুরুতর দেখে সঙ্গে-সঙ্গে অস্ত্রোপোচার করা হয়েছে। বাঁচবে ছেলেটা।

খবর শুনে আনন্দের হল্লা বয়ে গেল গোত্রে। আমিও খুশি হলাম। সেদিনই রওনা দিতে চেয়েছিলেন মেহেদি কাকু। কিন্তু সালেহা বেগমের আকুল অনুরোধে যাওয়া হলো না।

রাতের খাবারের সময় চলে গেলাম গ্রামে। তবে খুঁজে পেলাম না মহিলাকে। কোথায় যেন গিয়েছেন তিনি। মন খারাপ হয়ে গেল আমার। মহিলার মাঝে কেমন যেন একটা আকর্ষণ আছে। সেটা কাছে টানে বারবার।

পরদিন খুব ভোরে উঠলাম ঘুম থেকে। যাবার আগে একবার সালেহা বেগমের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই। নিয়তি তখনও ঘুমাচ্ছে দেখে, ওকে আর জাগালাম জাগালাম না।

একা-একাই চলে গেলাম গ্রামে। শহর হলে এখনও সবাই ঘুমিয়ে থাকত। কিন্তু এরা সম্ভবত আঁধার থাকতেই বিছানা ছাড়ে। আমাকে দেখে খুশি হলো সবাই।

কিন্তু আমি হতে পারলাম না। সালেহা বেগমের সাথে দেখা করতে এসেছি। অথচ তিনিই নেই!

ফিরে যাব, এমন সময় ছুটে এলো গ্রামের একমাত্র কুমার। আমি যে সনাতন ধর্মের অনুসারী তা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে সবাই। আমার হাতে তুলে দিল কালো মাটির তৈরি একটা দেবী-মূর্তি। প্রথমে মনে হয়েছিল, মা মনসার মূর্তি বানিয়েছে বোধহয়। পরে বুঝতে পারলাম, আসলে দুই রাত আগে দেখা দেবী মূর্তির আদলেই বানানো হয়েছে এটাকে। স্বাভাবিক; যা দেখে এসেছে আজীবন, সেটাই তো বানাবে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, ফিরে এলাম লঞ্চে। এসে দেখি, নাস্তা প্রস্তুত। আমার খাওয়া হয়ে গেলেই রওনা দিবে সবাই। এদিকে আমার খেতে ইচ্ছা করছে না। তাই বললাম, পরে খাব। রওনা দিয়ে দেওয়া যাক।

কিছুক্ষণের মাঝেই পায়ের নিচটা কেঁপে উঠল। ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে, বুঝতে পারলাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি ডেকেই, শেষ বারের

মতো দেখে নিচ্ছি টিয়ার চর। ফিরে যেতে হবে আমাকে শহরে। আবার সেই কড়া নজরবন্দি, সেই ছকে বাঁধা জীবনে। ডাক্তার-বাসা করেই কেটে যাবে বাকি কয়টা দিন। তাই যতটুকু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়, নিয়ে নিচ্ছি!

আচমকা একটা অবয়ব দেখতে পেলাম। দূর থেকে ছুটে আসছে। মনে হচ্ছে যেন ওই মানুষটার জীবন-মরণ নির্ভর করছে এর ওপরে। চিৎকার করে ইঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলাম। বুঝতে পারছি, ওটা নিশ্চিত সালেহা বেগম।

বিরক্তি খেলে গেল মেহেদি কাকুর চেহারায়। প্রায় অসভ্য এক মহিলাকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি তা বুঝতে পারছেন না। তবে কথা শুনলেন তিনি।

হাঁপাতে হাঁপাতে ডেকে উঠে এলেন সালেহা। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। নিজের গলা থেকে একটা লকেট খুলে পরিয়ে দিলেন আমার গলায়। হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম লকেটটাকে। একটা কালো, ধাতব চাকতি। বিশেষত্ব নেই কিছুই। তবে উপহারের দাম না, উপহারের পেছনের অনুভূতিটা ছুঁয়ে গেল আমাকে।

'এইটা সঙ্গে রাইখ!' হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন তিনি। পরক্ষণেই খাদে চলে গেল তার কণ্ঠে। 'তোমার জন্যই আমার পোলাটা বাঁচব। তুমি আসলে মানুষ না, ফেরেস্তা। এই লকেট ছিল আমার বংশের প্রতীক। মন্দিরে রাইখা আসছিলাম। আমি চাই, এইডা তুমি নাও। সব সময় পিন্দবা। ঠিক আছে?'

পারিবারিক স্মৃতি চিহ্ন শুনে, লকেটটা রাখতে চাচ্ছিলাম না আমি। কিন্তু আমাকে জিনিসটা ফিরিয়ে দেবার সুযোগ না দিয়েই নেমে গেলেন সালেহা বেগম। আমি বুঝতে পারলাম, না করলে বড়ো কষ্ট পাবেন মহিলা। তাই আর মানা করলাম না।

যাত্রা পথে নতুন কিছু হয়নি। নিয়তিকে দেখালাম দেবী-মূর্তি আর লকেটটা। আবারও প্রতিজ্ঞা করলাম আমরা, সেই রাতের অভিযানের কথা কাউকে বলব না।

তাই, এই ডায়েরিটাকেও শেষ পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলতে হবে, আর নয়তো নিয়তিকে দিয়ে যেতে হবে।

-১ মাস

ডাক্তার আংকেলের বেঁধে দেওয়া সময়ের আর এক মাস হাতে আছে। ভেবেছিলাম, সুন্দরবন থেকে ফিরে আসার পর, কমপক্ষে দুটো সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। কিন্তু না, কেন যেন নিজেকে তরতাজা মনে হচ্ছে। অবশ্য পড়েছিলাম, প্রদীপ নেভার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে। কে জানে, এই ভালোলাগাটা দপ করে জ্বলে ওঠা কিনা।

আজকে আমার শেষ বারের মতো হাসপাতালে যাবার দিন। আর কখনও ফেরা হবে না সম্ভবত। শেষ একবারের মতো এম.আর.আই. করিয়ে, ওখানেই একটা কেবিনে ভর্তি হয়ে থাকতে হবে। নার্সিং কেয়ার নাকি এখন আমার খুব দরকার। তাই ডাক্তার আংকেলের এই সিদ্ধান্ত। আমি আর মানা করিনি। যদি এভাবে আরও কয়েকটা দিন বাঁচা যায়, ক্ষতি কী?

কষ্ট লাগে পাপার মুখ আর নিয়তির কান্না দেখলে। নিয়তি নাহয় চোখের পানি ঝরাতে পারে, পাপা তো তা-ও পারেন না!

যাক সে কথা, ডায়েরিটা সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছি। একেবারে শেষ মুহূর্তে তুলে দিব নিয়তির হাতে। এর আগ পর্যন্ত পাতাগুলো ভরে যাব আমি।

কী লিখব? ছেলেবেলার কথা? মনেও নেই সব। নাকি বড়ো হবার সময়ের গল্প? ওগুলো লিখেই বা কী হবে? নাকি প্রাণের বান্ধবীর সাথে শেষ ট্যুরের কথা লিখব? হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে।

এতদিন কাউন্ট ডাউন লিখে এসেছি। আজ আর লেখার সাহস হচ্ছে না।

হাসপাতালে এসেছি মাত্র একদিন আগেই। এম.আর.আই. করানো হয়েছে আসার সঙ্গে-সঙ্গে। সুসংবাদ দিয়েছেন ডাক্তার আংকেল। আমার ক্যান্সার নাকি থমকে গিয়েছে। এমনটা আগে কখনও দেখেননি তিনি। একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে থেমে গিয়েছে ক্যান্সারের গ্রোথ।

প্রচণ্ড আশাবাদী মনে হলো তাকে। আরেকটা স্ক্যান করাতে চান এক সপ্তাহ পর। হয়তো...হয়তো...

হে ঈশ্বর, কেন আশা দিচ্ছ তুমি? হে মা মনসা, মৃত্যুপথযাত্রীর মন নিয়ে খেল না দয়া করে। হয় সুস্থ করে দাও, আর নয়তো মেরে ফেল আমাকে। এভাবে ঝুলিয়ে রেখো না।

আজ বাড়ি ফিরে এসেছি। সাত দিন পর এম.আর.আই. করাবার কথা ছিল। আশায় আশায় ঢুকে পড়েছিলাম ধাতব ওই বৃত্তাকার ঘরে।

রিপোর্ট পাবার পর, আংকেলের চেহারা আর তার চেম্বার থেকে বেরোবার পর পাপার মুখের অবস্থা দেখেই বুঝে নিয়েছি যা বোঝার। আমি ক্যান্সার থেকে মুক্ত! মানে পুরোপুরি না, তবে ক্যান্সার কোষ আস্তে-আস্তে কমতে শুরু করেছে আমার দেহ থেকে!

কীভাবে সম্ভব হলো এই অসম্ভবের? জানি না আমি। পাপার ধারণা, বাবা পরমেশ্বর কামালের এই কাজ! আমারও থেকে থেকে তাই মনে হয়। যাই হোক, আজকে ছাড়া পেলাম। সোজা চলে এলাম বাসায়।

গোপন কয়েকটা কথা বলি এবার। কদিন ধরেই নিজের মাঝে অদ্ভুত এক পরিবর্তন খেয়াল করছি! অধিকাংশ মানুষ কাছে আসা মাত্র, কেমন যেন এক বোটকা গন্ধ পাচ্ছি নাকে। অথচ আজ শুনতে পেলাম, তারাও নাকি তেমন একটা গন্ধ পাচ্ছে আমার কাছে আসতেই।

অদ্ভুত ব্যাপার-সবচেয়ে বেশি গন্ধটা আসছে নিয়তির গা থেকে। কেন যেন মেয়েটা আমার ঘরে ঢোকা মাত্র চড়ে যাচ্ছে আমার মেজাজ। কয়েকবার তো ওর সাথে খারাপ ব্যবহারই করে বসলাম।

ডাক্তার আংকেল বলে দিয়েছেন, বেশি করে স্যুপ আর মুরগি খেতে। অথচ ওগুলো আজকাল আমার গলা দিয়ে নামতেই চায় না! কেমন যেন গা গুলিয়ে আসে। বমি হয়ে যেতে চায়।

সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনাও করতে পারছি না কারও সাথে। যার সঙ্গে করা যেত, সেই নিয়তিকে-ই আর সহ্য হতে চাইছে না। এদিকে পাপাকে বলব, সেই ইচ্ছাও হচ্ছে না। বেচারার হাসিমুখে কালিমা দেখতে চাই না বলে।

দেখি আরও সপ্তাহ দুয়েক। তারপরও যদি পরিবর্তন না দেখি নিজের মাঝে, তাহলে বলতেই হবে!

বাড়ি ফেরার পর, তিন সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত আমি আমার পরিবর্তনের কারণগুলো ধরতে পেরেছি।

প্রথম সূত্র ছিল মুরগির মাংস খেতে না পারাটা। আস্তে-আস্তে দেখলাম, প্রাণীজ কোনো আমিষই আমি সহ্য করতে পারছি না। এমনকী ডিম পর্যন্ত না। কচ্ছপের মাংস, হাসের মাংস, পাঠার মাংস...এমনকী চুপি চুপি একবার গরুর মাংসও খাবার চেষ্টা করে দেখেছি। ঠোঁটের কাছে আনার সাথে-সাথে কেমন যেন গা গুলিয়ে আসে আমার। অথচ শাক-সব্জী খেলে আর কোনো সমস্যা হয় না।

পরবর্তী সমস্যাটাও বুঝতে পারলাম, মানে গন্ধের সমস্যার কথা বলছি। নিয়তিরা মুসলমান, ওদের ঘরে প্রায় প্রতিবেলায় মাছ-মাংস করা হয়েই থাকে। সম্ভবত সেই কারণেই ওর গা থেকে এমন তীব্র একটা গন্ধ পাই। পাপার দেহ থেকেও পেতাম। কিন্তু এই কয়েকদিন আমার সঙ্গে তিনিও শাকাহার করায় সেটার পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে।

আমি যেমন গন্ধ পাই মাংস খায় এমন লোকদের দেহ থেকে, তারাও তেমনি আমার দেহ থেকে পায় বোটকা একটা গন্ধ! অথচ এই একই গন্ধটা কেন যেন অন্য কারও দেহ থেকে পায় না। এর প্রমাণ হিসেবে দেখানো যায় পাপাকে। প্রথম-প্রথম, গন্ধটা এমন তীব্র ভাবে পেতাম যে ঘর থেকে বের হতাম না বললেই চলে। পাপা প্রতিদিন দেখতে এসে নাক কুঁচকাতেন, বুঝতাম যে ঘরের ভেতর বাজে একটা গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। অথচ আমি পরিষ্কারই থাকতাম যথা-সম্ভব। আস্তে-আস্তে তিনি সহজ হতে শুরু করলেন। অবশ্য এর সঙ্গে আমার ক্যান্সারের তীব্রতারও একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। যতই সেটার ছড়িয়ে থাকা জায়গার পরিমাণ কমছে, ততই কমছে তার বিরক্তি। ডাক্তার আংকেলের মতে, আর এক সপ্তাহ পর সম্ভবত আমার দেহ পুরোপুরি ক্যান্সার মুক্ত হবে। নিশ্চিত হবার জন্য পেট স্ক্যান করাবেন বলেছেন। আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে, তখন আর পাপা গন্ধ পাবেন না।

সমস্যা হচ্ছে নিয়তিকে নিয়ে। কেন যেন ও কাছে আসা মাত্র তীব্র গন্ধে ভরে যায় চারপাশ, আমি নিতে পারি না। ওকে সরিয়ে দেই বা নিজে সরে যাই। না জানি কী ভাবছে ও। আমিও কিছু বলতে পারছি না। যে জিনিসের শক্ত ভিত্তি নেই, তা ওকে বলি কীভাবে?

আশা করি, ক্যান্সার পুরোপুরি সেরে গেলে, আমাকেও আর গন্ধটা পেতে হবে না!

আরেকটা সন্দেহের কথা বলে শেষ করি, সালেহা বেগমের খাওয়ানো সেই ফলের জন্যই আমার মাঝে আসেনি তো এই পরিবর্তন? এখন পর্যন্ত গলা থেকে তার দেওয়া লকেটটা খুলিনি আমি। সামনেও খোলার ইচ্ছা নেই। তবে সুযোগ পেলেই আবার যাব ওখানে। আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দরকার আমার।

কেমন আছিস রে নিয়তি? আমাকে ভুলে গেছিস?

অনেকদিন ধরে কলম ছোঁয়ানো হয় না এই ডায়েরির পাতাটায়। তাই বলে অবহেলায় ফেলে রাখিনি, সযত্নে তুলে রেখেছিলাম আলাদা করে। আজকেই কিছু কথা লিখব। তারপর কুরিয়ার করে দেব তোর কাছে। জানি, আমার ওপর রেগে আছিস তুই। রাগারই কথা। কিন্তু... কী করব বল? আমি...থাক, ছেঁদো কথা বলব না তোকে। তারচেয়ে বরং মনের কিছু কথা শুনাই তোকে। শুনবি তো সব? কথা দে, শেষ করার আগে নামিয়ে রাখবি না!

হঠাৎ করেই তোর থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম আমি। উলটো-পাল্টা কী সব কারণ দেখিয়েছিলাম তা নিজেরও মনে নেই। আশা করি আগের পাতাগুলো পড়েছিস। তাই নতুন করে আর সেসব বললাম

না। শুধু একটা কথা বলি শোন, তোকে আজও আমি নিজের বোনের মতো করে ভালোবাসি...

এই দেখ, ইনিয়ে-বিনিয়ে শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। অবশ্য আমি তো এমনই ছিলাম সবসময়, তোর কাছ থেকে নিয়েই গিয়েছি শুধু। আর তুই দিয়ে গিয়েছিস।

আমাকে মাফ করে দিস দোস্ত।

এই ডায়েরি যখন তোর হাতে পড়বে, তখন হয় আমি মারা গিয়েছি...আর নয়তো বিশাল এক বিজ্ঞানী হিসেবে দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে পড়েছে আমার নাম। বিশ্বাস কর, পরেরটা হলেই খুব খুশি হব আমি। তাহলে অন্তত তোর সামনে দাঁড়াতে পারব, বলতে পারব এতদিন ধরে যা-যা বলার ছিল। কে জানে, হয়তো আবার আগের মতো হয়ে যেতে পারব আমরা।

অদ্ভুত এক আবিষ্কার করেছি আমি। যা মানুষ কাজে লাগাতে পারলে যেমন সমাজ পাল্টে যাবে...তেমনি ভুল হাতে পড়লে ধ্বংস হতেও সময় লাগবে না।

যদি মারা যাই তো জানবি, এই ভুল হাতের অধিকারীর হাতেই মৃত্যু হয়েছে আমার। ইস, যদি তোকে তার নাম বলে যেতে পারতাম! কিন্তু না, তাতে করে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেওয়া হবে তোকে। তাই বলছি না।

তোর মনে আছে, ছোটোবেলায় আমরা কত মজা করতাম। একসাথে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে কিনতাম কত গল্পের বই। টারজান, কিশোর ক্লাসিক, তিন বন্ধু? আমি কিশোর হতে চাইতাম সবসময়, তুই জিনা? মনে আছে, একে-অন্যকে কত্ত চিঠি লিখতাম আমরা? গোপন ট্রেইলারের আশায় কতবার পাপার কাছে গিয়ে বকা খেয়েছি?

কয়েকটা পাতা ফাঁকা রেখেছি আগে, তোর জন্য। ইচ্ছে হলে লিখিস। আর যদি বেঁচে ফিরে আসি, তাহলে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিস আমার আচরণকে।

যদিও সেটা সম্ভব হবে না বলেই মনে হচ্ছে। এমন সব উৎস থেকে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাকে, যা আমারই কখনও কল্পনায় আসেনি। তোরও আসবে না।

যাই হোক, ভালো থাকিস। সুস্থ থাকিস। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমার কাজটা তুই-ই শেষ করে দিস।

ইতি,

তোর বান্ধবী, উমা

পর্ব ৩: উদ্ভাস

এক

সেদিন রাতের ট্রেনেই চড়ে বসল রাফসান এবং নিয়তি। এক মুহূর্তও নষ্ট করতে চায় না ওরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই রহস্যটার একটা সমাধান করতে চায়।

এদিকে এত বড়ো একটা কাজে কিছুটা হলেও সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কার কাছে চাইবে এই সাহায্য? সন্দেহ জেঁকে বসেছে নিয়তির মনে। রাফসান ওকে শিকদারের হাত থেকে না বাঁচালে, সম্ভবত ওকেও সঙ্গে নিত না। অবশ্য ওর প্রশ্নটাকে হেসে উড়িয়েও দিতে পারছে না রাফসান, পারছে না ভালো একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতেও।

আমি যে ডায়েরি পেয়েছি, তা ওই শিকদার লোকটা জানল কী করে?

প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারেনি রাফসান। আসলেই তো তাই, এই কথা জানত শুধু ও আর নিয়তি, অন্তত মেয়েটা তাই বলেছে। নিজে থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, মারুফ স্যারকে জানিয়েছে সে। শিহান কেবল জানত, নিয়তিকে সুরক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কেন–তা জানত না। এসব থেকে উপনীত হওয়া যায় কেবল একটা সিদ্ধান্তেই।

মারুফ স্যারের কাছের কাউকে পকেটে পুরে রেখেছে শিকদার।

সকালটা শুয়ে-বসে কাটায়নি ও। শিকদার নামক লোকটার হাতের ছাপ পাওয়া মাত্র তার ব্যাপারে যা-যা জানার, জেনে নিয়েছে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে, মাত্র কয়েক বছরে নতুন করে ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ড আরেক প্রভুর জন্ম দিয়েছে! ওয়াসি আনোয়ারের পর, নতুন মালিক হিসেবে নতি স্বীকার করেছে শিকদারের সামনে।

সামান্য এক গলির গুন্ডা থেকে, নতুন ডন হিসেবে শিকদারের আত্মপ্রকাশ অভাবনীয়ই বলা চলে।

এমন একজন মানুষের পকেটে যে সবগুলো আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কেউ থাকবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছে না রাফসান, সুন্দরবন যাওয়াটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে কেন। বোকা নয় ও, ডায়েরির ফাঁকা পাতায় যে গোপনে কিছু না কিছু লিখে গিয়েছে উমা, তা সে নিজেও ধরতে পারছে। সেটা নিয়ে এখন ওদের মাথা ঘামানো দরকার। প্রয়োজন অ্যানালাইসিস করা, ক্রিপ্টোগ্রাফারদের কাজে লাগানো। সেসব আর যেখানেই পাওয়া যাক, সুন্দরবনে যে পাওয়া যাবে না–সেটা নিশ্চিত।

কিন্তু নিয়তির একরোখা জবাব–সবকিছুর উত্তর মিলবে ওখানে। ওখানে বলতে টিয়ার চর, আরও ঠিক করে বললে ওই মন্দিরে। কেন? সেই প্রশ্নের জবাব এখনও দেয়নি মেয়েটা। খুব দ্রুত দেবে বলে মনেও হয় না।

'টাকাপয়সা বেশি নেই আমার কাছে,' ট্রেন ছেড়ে দেবার পর, সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি। 'কীভাবে সামলাব, তা বুঝতে পারছি না। তুমি নাহয় কিছু দাও, ধার হিসেবে। পরে চুকিয়ে দেব।' লজ্জায় শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে গেল নিয়তির কণ্ঠ।

'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না,' জবাব দিল রাফসান। 'কাজ হলে সবগুলোর বিল মারুফ স্যারের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু,' একটু বিরতি নিয়ে প্রশ্নটা করেই বসল সে। 'আমরা ওখানে যাচ্ছি কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না!'

চট করে উঠে বসল নিয়তি। রাফসানের উলটো দিকের সিটে বসে আছে সে। বগির মুখোমুখি চারটা সিট কিনে নিয়েছে ওরা। দুজনেই বসে আছে জানালার পাশে। খালি সিটে লাগেজ। রাফসান বার্থ নিতে

চেয়েছিল, কিন্তু নিয়তির জন্য পারেনি। মেয়েটার যুক্তিও অবশ্য ফেলনা না, জনসম্মুখে থাকলে কিছুটা হলেও বাড়তি নিরাপত্তা পাওয়া যায়। শিকদার ডনই হোক আর যা-ই হোক, এতগুলো সাক্ষীর সামনে কিছু করার সাহস পাবে না।

রাফসানের প্রশ্নে যে চমকে গিয়েছে নিয়তি, তা ওর হাবে-ভাবে স্পষ্ট। সাথে-সাথে চারপাশে একবার দেখে নিলো ও। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'ওসব প্রশ্ন নাহয় পরে কোরো। লঞ্চে উঠে। এখন না। আশপাশে কে আছে, তা জানা নেই।'

মেনে নিলো প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা। চোখের ওপর টুপি টেনে নিয়ে গা এলিয়ে দিল সিটে, ওকে ঘুমাতে দেখে সতর্ক হয়ে গেল নিয়তি। আগেই ঠিক করে রেখেছে, দুইজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে না। দুই ঘণ্টার শিফটে ভাগ করে নিয়েছে দিনটাকে।

ঘণ্টা চারেক পরের কথা, ঘুমিয়ে আছে নিয়তি। রাফসানের এখন ওকে জাগিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কথা হলো, ঘুম আসছে না ওর। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছে বলে, দরকারও নেই খুব একটা। এদিকে ঘুমন্ত মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, অনেকদিন পর নিদ্রাদেবীর কোলে মাথা রেখেছে সে। সুন্দর চেহারাটা নিষ্পাপ দেখাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই একবার হেসে উঠল মেয়েটা, হাসলে গালে টোল পড়ে ওর। রাফসানের ইচ্ছা হচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেয়!

হয়তো তাই দিত, কিন্তু তার আগেই নিয়তির প্রশ্নে চমকে উঠল ও। 'কী দেখছ?'

হতচকিত রাফসান কী বলবে, তা বুঝে পেল না। তাই ধুপ করে বলে উঠল, 'ভাবছিলাম যে লঞ্চ ভাড়া নেব কীভাবে? মাঝিরা তো সন্দেহ করবে। ওরা যদি জানতে চায় যে আমাদের সম্পর্ক কী, তাহলে?'

লাল হয়ে গেল নিয়তির চেহারা। আসলে ঘুম ভেঙেছে ওর আরও আগেই। ঘুমের ঘোরে হাসেনি সে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে, পুরুষের দৃষ্টি নিজের ওপর পড়লেই কোনো এক ইন্দ্রিয় ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় তাকে। কোন দৃষ্টি স্তাবকের আর কোনটা লালসার–পার্থক্য করতে পারে সেটাও। চুপিচুপি তাই রাফসানের মুগ্ধ দৃষ্টি উপভোগ করছিল মেয়েটা, হেসেছেও সেজন্যই। মনে-মনে ভাবছে–নাহ, দেখতে-শুনতে মন্দ নয় ছেলেটা।

‘কিছু তো আর করার নেই,’ অবশেষে বলল সে। জানে না, গালের লালিমা আরও কতটা সুন্দর করে তুলেছে ওকে। ‘স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে হবে আমাদের। তোমার ওপর আস্থা আছে আমার, অসুবিধা নেই। এখন বিশ্রাম নাও।’

এমনিতেই ঘুমের দরকার ছিল না রাফসানের। বুকের ভেতরে ঘোড়ার গতিতে ছুটতে থাকা হৃৎপিণ্ডটাকে অনুভব করতে পেরে বুঝল, আজ রাতে আর ঘুম ধরবেও না। কিন্তু কী বলতে কী বলে ফেলে, এই কথা চিন্তা করে চোখ মুদল আবার।

ওর ঠোঁটের কোণেও খেলে যাচ্ছে সুন্দর এক টুকরো হাসি।

*

খুলনায় নেমে লঞ্চ পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি ওদের। যেভাবে ঠিক করেছিল, সেভাবেই এগিয়েছে। তবে একদম সন্দেহের উদ্রেক না করে কাজ সারতে পারেনি ওরা। সরাসরি টিয়ার চরে যাবার কথা শুনে একটু অবাকই হয়েছে মাল্লারা।

চুপচাপ জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে লঞ্চ। ডেকে বসে চারপাশের পরিবেশ উপভোগ করছে রাফসানরা। আসলেই, আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি এই সুন্দরবন। শান্ত-সমাহিত প্রকৃতির কোলে এসে যেন বিগত কয়েকদিনের সব ক্লান্তি ভুলে গিয়েছে ওরা। এমনকী মায়ের মৃত্যুর কষ্ট এক বিন্দু ফিকে হয়ে এসেছে নিয়তির মাঝে। অনেকক্ষণ পরপর হলেও, হাসি খেলে যাচ্ছে ওর মুখে।

সন্ধ্যার দিকে কেবিনে ফিরে এলো ওরা। আবার চেপে বসল রাফসান, জানতে চাইল, 'এবার বলো। সুন্দরবন-সুন্দরবন করে কেন এমন পাগল হচ্ছ?' শব্দে তিরস্কার থাকলেও, মুখে ওর হাসির আভা।

'আগে বলো, উমার ডায়েরিতে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকত্ব দেখেছ?' প্রশ্নের জবাব প্রশ্নের মাধ্যমে দিল নিয়তি।

শ্রাগ করল রাফসান। শিক্ষকদের এই পাল্টা প্রশ্ন করার স্বভাবটার সাথে ভালোভাবেই পরিচিত সে। 'হুম। মাঝখানে সাদা পাতার উপস্থিতি।'

'ভেরি গুড,' যেন বাচ্চা পড়াচ্ছে, এমনভাবে বলল নিয়তি। 'এবার বলো, ওটা কী হতে পারে?'

'আমার সন্দেহ, ওই পাতাগুলোয় কারসাজি করা হয়েছে।' সাফ উত্তর রাফসানের। 'এজন্যই তো চাচ্ছিলাম ডায়েরিটাকে অ্যানালাইসিসের জন্য নিয়ে যেতে। তা তো পারলাম না,' নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'তার বদলে এখন জঙ্গলে বসে মশার কামড় খাচ্ছি।' বলেই ঠাশ করে হাতের ওপর চাপড় বসাল ছেলেটা।

রাফসানের ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলল নিয়তি। পরক্ষণেই শক্ত হয়ে বসে বলল, 'তোমার কী মনে হয়, যদি ওই পাতাগুলোতে কিছু থাকেও, তাহলে তোমার অ্যানালিস্টরা বের করতে পারবে?'

‘ওদেরকে রাখা হয়েছে অ্যানালাইসিস করার জন্য,’ এবার শিক্ষকের ভূমিকা নিলো রাফসান। ‘তুমি বোঝাতে চাইছ ক্রিপ্টোগ্রাফারদেরকে।’

‘যেটাই হোক, পারত?’ হার মানবে না মেয়েটা।

‘পারত কিনা জানি না, অন্তত চেষ্টা তো করে দেখত।’

‘কোড ভাঙার জন্য কী দরকার হয়, বলো তো?’ আবারও প্রশ্ন করল নিয়তি।

‘সাইফার কী।’ শব্দটা মেয়েটার অপরিচিত বুঝতে পেরে ভেঙে বলল রাফসান। ‘এমন এক সূত্র, যেটার সাহায্যে কোড ব্রেক করা যায়।’

‘যদি বলি, সেই সাইফার কী আমার জানা আছে, তাহলে?’ বোমা ফাটাল যেন শিক্ষিকা!

‘কী বলো!’ হাঁ হয়ে গিয়েছে রাফসানের মুখ।

পিঠের সঙ্গে ঝুলতে থাকা ঝোলা থেকে ডায়েরিটা বের করল নিয়তি। ওটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জানতে চাইল, ‘গল্পের বই পড়?’

‘অবশ্যই।’

‘সেবার?’

‘সেবার, সেই সঙ্গে আরও অনেকের।’

‘আচ্ছা, সেবা প্রকাশনীর কয়েকটা জনপ্রিয় সিরিজের নাম বলো তো।’

‘মাসুদ রানা, কুয়াশা, তিন গোয়েন্দা, কিশোর ক্লাসিক, অয়ন-জিমি, গোয়েন্দা রাজু, ওসমান সিরিজ, সাবাডিয়া।’ এক নিশ্বাসে বলে ফেলল রাফসান।

এখনও পাতা ওল্টাচ্ছে নিয়তি। ‘বলতে থাকো।’

আবার শুরু করল রাফসান। 'হরর ক্লাব, রোমহর্ষক, সেবা রোমান্টিক, ক্যালকিন, বেনন, এরফান, কিশোর চিলার।' আর মনে পড়ছে না ওর।

আচমকা পাতা ওল্টানো থামিয়ে দিল নিয়তি। ডায়েরিটা তুলে দেখাল সাদা পাতাগুলো। 'খুব জনপ্রিয় আরেকটা সিরিজের নাম বাদ দিয়েছ। যে সিরিজটার কথা বলেছে উমা নিজেও।'

'তিন বন্ধু।' রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল রাফসান। আসলে তিন গোয়েন্দার ছায়ায় পড়ে তাদেরই বাচ্চা দিনগুলোর অভিযানের গল্পগুলোর নাম আলাদা ভাবে নেওয়া হয় না। 'তিন বন্ধু সিরিজ।'

'ঠিক।' মাথা দোলাল নিয়তি। রাফসানকে হতবাক করে দিয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেলল পাতাগুলো। 'তিন বন্ধু সিরিজ। তিন গোয়েন্দার ছোটোবেলার গল্প। তোমার মতো আমরাও সেবার ভক্ত। পাগলের মতো পড়তাম বইগুলো। আসলেই নিজেকে জিনা বলে কল্পনা করতাম আমি, আর কিশোর হতো উমা। তাহলে তিন গোয়েন্দার কথা না বলে, তিন বন্ধুর কথা বলল কেন?'

বেশ কিছুক্ষণ ভাবল রাফসান। ব্যাপারটা ধরতে পারছে না দেখে একটু সূত্র দিল নিয়তি। 'পরের কথাগুলো ভেবে দেখ, আমরা একে-অন্যকে চিঠি লিখতাম...'

'অদৃশ্য কালি।' উত্তেজিত হয়ে গেল রাফসান। তিন গোয়েন্দাতেও অদৃশ্য কালি ব্যবহারের কথা আছে বটে, কিন্তু তিন বন্ধুই বেশি ব্যবহার করত এই পদ্ধতি। সাদা কাগজে লেখার জন্য লেবু বা কমলার রস ব্যবহার করত ওরা। ফলে কিছুই দেখা যেত না। কিন্তু আগুন বা তাপের কাছে আনলেই ফুটে উঠত অক্ষরগুলো। 'ওই সাদা কাগজগুলোতে তাহলে অদৃশ্য কালি দিয়ে উমা কিছু একটা লিখে রেখেছে!'

মুচকি হাসল নিয়তি, মনে হচ্ছে যেন দারুণ মজা পাচ্ছে এক কালের পুলিশকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে। ‘পরখ করেই দেখ।’

আগ্রহ নিয়ে কাগজটা হাতে নিলো রাফসান। কেবিনের ভেতর মোম জ্বলছে। ওটার অগ্নি-শিখার কাছে কাগজটাকে নিয়ে গেল সে। খুবই সাবধানে, যেন আগুন না ধরে যায়–এমনভাবে রাখল কাগজটাকে। আশা করছে, যেকোনো মুহূর্তে ওখানে ফুটে উঠবে লেখা!

মিনিটখানেক পরেও যখন কিছু হলো না, তখন অগ্নি-শিখার আরও কাছে ধরল কাগজটাকে। এক মিনিট পর আরও কাছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বিরক্তি পেয়ে বসল ওকে। শিখার একেবারে কাছে নিয়ে গেল কাগজটা। যা হবার, তাই হলো। ধপ করে জ্বলে উঠল আগুন। সঙ্গে-সঙ্গে মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে চাপা দিল রাফসান। কিন্তু আগুন যতক্ষণে নিভল, ততক্ষণে কাগজটার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পুড়ে গিয়েছে!

হায়-হায় করে উঠল ও। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র! হয়তো ওখানেই লেখা ছিল নতুন এক যুগান্তকারী থেরাপির নীল নকশা! গেল, সব গেল! ভাবতেই নিজের ওপরে মন বিষিয়ে উঠল ওর।

আচমকা নারী কণ্ঠের খিল খিল হাসিতে ভরে উঠল ঘর।

চমকে উঠে কণ্ঠের উৎসের দিকে তাকাল রাফসান, অবাক হয়ে দেখল: নিয়তি হাসছে।

‘দুশ্চিন্তা কোরো না, ওখানে কিছুই নেই!’ এখনও হাসছে মেয়েটা। ‘উমা এত বোকা না। আরেকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে ডায়েরিতে, তুমি লক্ষ্য করোনি। সাদা কাগজের পরের পাতাগুলোতে লেখা বেশ দূরে দূরে আছে। দুটো লাইনের মাঝে চাইলেই আরেকটা লাইন

ঢোকানো যাবে।' বলে মোমটাকে নিজের কাছে টেনে নিলো সে। 'এজন্যই সম্ভবত আমার পেছনে লেগেছিল শিকদার। শুধু ডায়েরিটার জন্য না, সেই সঙ্গে এই কোড জানার জন্যও...এই দেখ।' বলে ডায়েরিটাকে এগিয়ে দিল ও রাফসানের দিকে।

এক নজর দেখেই বুঝে ফেলল রাফসান, ঠিক বলেছে নিয়তি। গোটা গোটা অক্ষরে কিছু লাইন ফুটে উঠেছে কাগজে। শুধু অদৃশ্য কালিতে লেখা লাইনগুলো একমনে পড়তে শুরু করল ও।

দুই

আমি জানতাম নিয়তি, আর কেউ না পারলেও, তুই অন্তত আমার ইঙ্গিত টের পাবি। কাজের কথায় চলে আসি সরাসরি। অদ্ভুত এই আখ্যান তোর বিশ্বাস হবে কিনা, জানি না। তবে এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলব না–এ কথা দিতে পারি।

তোর সঙ্গে আমার দূরত্ব তৈরি হবার কারণ তো আগেই বুঝেছিস। ওসবে তাই যাচ্ছি না। জানিস, সালেহা বেগম আমাকে যে ফলটা খেতে দিয়েছিল–ওটার মাঝে ছিল একটা প্রো-ভাইরাস? এই ভাইরাসটাই পরবর্তী সব কিছুর জন্য দায়ী। আমার ক্যান্সার, গন্ধ পাওয়া, আমার শরীর থেকে তোর গন্ধ পাওয়া–সব। সেই সাথে দায়ী লকেটটাও।

পাপার গুরু, বাবা পরমেশ্বরের ক্ষমতা আমি বিশ্বাস করিনি কখনওই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমার আরোগ্যের রহস্যভেদ করব। পাশ করার পর তাই প্রথমেই যে কাজটা করি তা হলো আমার লসিকা গ্রন্থি থেকে বায়োপ্সি নেওয়া। ব্রেস্ট ক্যান্সারগুলো এভাবেই ছড়ায়, লসিকা গ্রন্থি থেকে দেহের নানা অংশে। তাই বায়োপ্সি প্রথমে ওখান থেকেই নেই। কালচার করে দেখতে পাই অদ্ভুত এই ভাইরাসকে।

বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না, ওসব তুই নিজেও দেখতে পারবি। আমি শুধু কিছু কথা খোলসা করব তোর সামনে।

অদ্ভুত ক্ষমতা এই ভাইরাসের। অনেকটা মিথোজীবী বলতে পারিস। যে দেহে যায়, সে দেহের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়।

সেদিন মন্দির থেকে আনা আপেলের মতো ওই ফলটা খাওয়ার সাথে-সাথে আমি নিজের দেহে স্থান করে দিয়েছি এই মিথোজীবী ভাইরাসকে। আমার দেহের প্রতিটা ক্যান্সার কোষকে খুঁজে বের করেছে সে। অটো-ইমিউন ডিজিসের বিরুদ্ধে কী দারুণ কাজ করবে এই জিনিস, ভাবতে পারিস? শুধু যে ব্রেস্টের ক্যান্সার-কোষগুলোকে ধ্বংস করেছে, তাই না। ব্রেইন স্টেমে ছড়িয়ে পড়া কোষগুলোকেও মেরে ফেলেছে। বিশ্বাস করবি, সেদিনের পর আর কোনো ধরনের অসুখ হয়নি আমার!

শুধু দেহের ভেতরের রোগ থেকেই ভাইরাসটা আমাকে রক্ষা করেনি, রক্ষা করেছে বাইরের অনেককিছু থেকেও। মনে আছে তোর? আমরা মন্দিরে ঢুকে দেখেছিলাম একটা বানর আর একটা হরিণকে? আসলে এই ভাইরাসটা ছড়ায় ফিকো-ওরাল রুটে। আর সেজন্য চাই ফল বা ওই গাছের পাতা মুখে নেওয়া। অন্য ভাবে বলি, কেবল মাত্র তৃণভোজী প্রাণীদের দেহেই পৌঁছাতে পারে এই ভাইরাস, বাঁচতে ও বংশ-বৃদ্ধি করতে পারে কেবল রক্তে। আর তাই তৃণভোজী প্রাণীদেরকেই রক্ষা করে ওরা।

বুঝতে পারছিস, কেন আমি তোর দেহে গন্ধ পেতাম? আর তুই পেতি আমার দেহে?

ভাইরাসটা এমন এক ফেরোমোন তৈরি করে, যা কেবল মাত্র কোনো মাংসভোজী প্রাণীই টের পাবে। তেমনি যে পোষক দেহে আছে, তার দেহের এমন অবস্থা করে যে অন্য কোনো মাংসাশী কাছে এলেই তীব্র একটা গন্ধ পায় সে নাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দেহের অন্যতম শক্তিশালী একটা ইন্দ্রিয়। পচা গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য মস্তিষ্ক হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। আর প্রথম দিকে আমার দেহে ছড়িয়ে থাকা ক্যান্সারকে দূর করার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে হচ্ছিল এই

ভাইরাসটাকে। তাই সংখ্যাতেও অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল তারা। বেড়ে গিয়েছিল গন্ধ পাওয়া এবং ছড়াবার তীব্রতাও।

এবার আসি লকেট প্রসঙ্গে। এতক্ষণ ভাইরাসের ক্ষমতা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছিলি? আসলে ভাইরাসটা এই লকেট ছাড়া একেবারেই অকেজো। বুঝতেই পারছিস, অনেকটা স্টেম সেলের মতো কাজ করে এটা। যেখানে যে কোষের দরকার হয়, সেখানে সেই কোষের রূপ নেয়। কিন্তু এর জন্য চাই মিউটেশনের, যে মিউটেশন ঘটায় এই লকেট। সত্যি বলতে কী, এই লকেট যে ধাতুর তৈরি, তার অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই।

পর্যায় সারণী অনুসারে, পরবর্তী যে স্থিতিশীল মৌলিক পদার্থটা আবিষ্কার হবে, তার নাম আম্বাইহেক্সিয়াম। গুগল ঘাঁটলেই আরও তথ্য পেয়ে যাবি। এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী এই পদার্থ আবিষ্কার করতে পারেননি, অথচ আমি সেই কয়েক বছর আগে থেকেই গলায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি একে!

যাই হোক, এই আম্বাইহেক্সিয়াম থেকে নির্গত হয় এক ধরনের কসমিক রে। বিজ্ঞানীরা স্থিতিশীল মনে করলেও, আসলে এটা স্থিতিশীল না। অনেকদিন হলো দেখা হয় না আমাদের, তাই হয়তো জানিস না–সঞ্জয় নামের এক পদার্থবিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। জেনেভা থাকে ও, সার্নে কাজ করে। শীঘ্রই বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা। কথাটা পাপাও জানে না, কারণ...যাই হোক। ও-ই নিশ্চিত করেছে এসব।

যা বলছিলাম, আম্বাইহেক্সিয়াম থেকে নির্গত রশ্মির প্রভাবে পরিবর্তন আসে ভাইরাসে। আর যদি সেই রশ্মি ধারেকাছে না থাকে, তাহলে আর দশটা নিরীহ ভাইরাসের মতোই জীবনকাল কাটিয়ে দেয় প্রো-ভাইরাসটা। ধুর, কী প্রো-ভাইরাস, প্রো-ভাইরাস করছি! একটা নামও

দিয়েছি এর। নিমা-নিয়তির নি আর উমার মা মিলে। সুন্দর হয়েছে না?

অনেকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি নিমাকে; গিনিপিগ, খরগোশ তো আছেই। সেই সাথে পরীক্ষা করেছি সাপ, পাখি আর মাছেও। সবার ক্ষেত্রেই পেয়েছি অদ্ভুত সব রেজাল্ট। সাপের ওপর করলাম কেন? মনে নেই, মন্দিরে কী দেখেছিলাম? দেবীর কালো মূর্তিকে ঘিরে রেখেছে কয়েকটা সাপ? সেই থেকেই মনে হলো...

পরীক্ষাটা করতে গিয়েই শুরু হলো বিপত্তি। দেখতে পেলাম, নিমা এমনিতে খুব উপকারী ভাইরাস হলেও, কেন যেন সাপের ক্ষেত্রে ওটার রূপ পাল্টে যায়। নিউরোটক্সিনের কাজের গতি অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেয় ওটা। এদিকে আবার আম্বাইহেক্সিয়ামের প্রতি ওই গা ঘিনঘিন করা সরীসৃপগুলোর রয়েছে অস্বাভাবিক আকর্ষণ। আমাকে ঢুকতে দেখলেই ছুটে আসত ওগুলো।

এই সুযোগে একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে নেই। আরেকবার গিয়েছিলাম আমি টিয়ার চরে। সালেহা বেগমকে ধরে মন্দিরও দেখে এসেছিলাম। আর...আর...

...একাকী প্রার্থনা করার অজুহাত তুলে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম মন্দির থেকে। বলেছিলাম, জান বাঁচাবার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই দেবীকে। তারপর কুমারের দেওয়া মূর্তিটা ওখানে রেখে, তুলে নিয়ে এসেছিলাম আসল মূর্তিটাকে।

বকাবকি পরে করিস, আগে শুনেনে–ওই মূর্তির পুরোটাই আম্বাইহেক্সিয়ামের তৈরি!

যাই হোক, এই আবিষ্কারের কথা কীভাবে কীভাবে জানি শুনে ফেলে একটা সংগঠন। জানতে পারল, এই ভাইরাসের ভেতরে নিউরোটক্সিন ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে তীব্র মারণাস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব। এমনিতে

ফিকো-ওরাল রুটে ছড়ালেও ওদের বিশ্বাস, নিমাকে বায়ুর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আমার ওপর চাপ দেওয়া শুরু হলো...এমন এক মানুষের মাধ্যমে, যার পরিচয় তোরা কল্পনাও করতে পারবি না।

কিন্তু শুধু নিমার অস্তিত্বের কথাই জানত ওরা। এমন কিছু হতে পারে ভেবে সাপের ওপর পরীক্ষা চালাবার পরপর সব ডকুমেন্ট নষ্ট করে ফেলেছিলাম আমি। ভাগ্যিস, একেবারে শেষ মুহূর্তে চালিয়েছিলাম পরীক্ষাটা। যাই হোক, আমার মাথা ছাড়া আর কোথাও রইল না অন্য কোনো তথ্য। সঞ্জয়ও জানত না কিছু, আর ওর কথাও জানে না কেউ। সার্নের চার-দেওয়ালের মাঝে থাকে সে। একটা বায়ো-ফিজিক্স সেমিনারে দেখা হয় আমাদের। তারপর হাতে-গোনা একবার কি দুইবার দেখা হয়েছে, তা-ও সেই সেমিনারেই। চুপি চুপি ওকে দিয়ে পরীক্ষাগুলো করিয়ে নিয়েছিলাম আমি। আশা করি বেশিদিন আর এই লুকোচুরি করতে হবে না।

যে লোকটা আমার ওপর চাপ দিচ্ছে, তার ওপরে কিছুটা প্রভাব এখনও আছে আমার। সেই প্রভাব খাঁটিয়েই চাচ্ছি জেনেভায় যেতে। একবার ওখানে পা রাখতে পারলে, ফিরে আসব না আর। সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, জানি না সত্যি সত্যি পালাতে পারব কিনা। যদি পারি, তাহলে হয়তো একদিন আবার দেখা হবে তোর সাথে। সামনা-সামনি বসে সেদিন খুব গল্প করব আমরা।

লোকটার ধারণা, ওই দেবী মূর্তিটা আমার গবেষণার জন্য খুব দামি একটা জিনিস। আসলেই তাই। ওটা ছাড়া আম্বাইহেক্সিয়াম পাব কোথায়? সেজন্য আমাকে দুটো শর্তে সে জেনেভা যাবার অনুমতি দিয়েছে–প্রথমত, মূর্তিটা তাকে দিয়ে যেতে হবে। আর দুই, পালাবার চেষ্টা করব না। বুঝতেই পারছিস, সঞ্জয়ের কথাটা কেন গোপন রাখতে হয়েছে? যদি জানে যে আমি পালাতে চাচ্ছি, তাহলে সম্ভবত আমাকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না। ভাবছিস, লকেটটা তো আছে। তাই

না? ওটাকে সেই গাছের ডালে ঝুলিয়ে এসেছি। জানি না, এতে কতটুকু কাজ হবে ওখানকার পশু-পাখিদের। কিন্তু তারপরও, একেবারে খালি রেখে আসতে মন চাইল না।

যদি না পালাতে পারি...যদি আর কোনোদিন আমাদের দেখা না হয়...তাহলে জানিস, তোর এই অভাগা বান্ধবী তোকে প্রাণ থেকে ভালোবাসে...জানিস, আমার কাজ শেষ করার ভার আমি তোকেই দিয়ে গেলাম। বিদায় নিবো না, আশা করি দেখা হবে আমাদের...

...আবারও...

তিন

মেজাজ খিচড়ে আছে শিকদারের। সেই যে একবার ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে, তারপর থেকে খুব সাবধানে কাজ করেছে সে। যে কাজই হাতে নিয়েছে, হাজারো বার ভেবে নিয়েছে। যেগুলোতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সেগুলো ছেড়ে দিয়েছে সংগঠনের উঠতিদের হাতে।

তাই বলে ওকে কাপুরুষ ভাবলে ভুল হবে। বেছে বেছে ঠিক নেতৃত্ব দিয়েছে অনেকগুলো অভিযানে। হিসেবী লোক ও, যৌবনের সেই রক্ত-গরম করা যুবক অনেক আগেই উধাও হয়েছে তার ভেতর থেকে। মাথা ঠান্ডা করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছে। দরকার হলে হাত রঙে রাঙিয়েছে। কখনও কখনও রাঙিয়েছে দরকার ছাড়াই। অধস্তনদের মনে করিয়ে দিয়েছে–শিকদার একজনই। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কল্পনা করাও মারাত্মক অপরাধ।

সিকিউরিটি গার্ডটাকে অত্যাচার করে মারার কাজটা একেবারে যথোপযুক্ত সময়ে এসেছিল। ওর জীবনের একমাত্র কাঁটা এখন এই অহিংশ সমাজ এবং পর্দার আড়ালে থাকা লোকটা। মাঝে-সাঝেই ডেকে পাঠিয়ে নানা কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় শিকদারের কাঁধে। চুপচাপ সেগুলো করে দেয় শিকদার, সেই প্রথম দফা জেল থেকে বের হওয়ার দায়টা তো আছেই। কিন্তু একমাত্র ওটাই কারণ নয়। প্রতিটা কাজের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা পায় সে। আবার অহিংশের নির্দেশ অনুসরণ করে আইনানুগ নানা ব্যবসাও ফেঁদেছে শিকদার। সেসব থেকেও কম আসে না। ওই সিকিউরিটি গার্ডকে যে প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন দালানে খুন করেছিল, সেটাও তেমন একটা প্রতিষ্ঠান। যদিও কাগজে কলমে শিকদারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার। অহিংশই ব্যবস্থা করেছে সব কিছুর।

একেবারে পরিষ্কার ছিল নির্দেশটা। এমনকী ওই সিকিউরিটি গার্ডের পুরো ডোশিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিকদারকে। কোথায় থাকে, কোন পথে যাওয়া-আসা করে, অভ্যাস...এমনকী সিগারেটের ব্রান্ডটা পর্যন্ত বাদ যায়নি! একেবারে সহজ কাজ ছিল–ছোকরাকে তুলে আনতে হবে। ওর কাছে একটা কী-কার্ড পাওয়া যাবে, ওটা আলাদা করে পৌঁছে দিতে হবে অহিংশের কাছে। তারপর এমনভাবে হত্যা করতে হবে গার্ডকে, যেন মনে হয় কাজটা তীব্র আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কেউ করেছে। কোনোভাবেই যেন এসবের সাথে জড়ানো না যায় অহিংশকে। বলির পাঁঠা কে হবে–তাও ঠিক করা হয়েছিল আগেই। ছোকরার প্রেমিকার স্বামী।

কাজটা লুফে নিয়েছিল শিকদার। ঝামেলা কম, পুলিশেরও দৌড়াদৌড়ি থাকবে কম। এদিকে নিজের নৃশংস দিকটা বহুদিন হলো দেখানো হয় না। সেটাও মনে করিয়ে দেওয়া যাবে অধীনস্থদের।

সবচেয়ে বড়ো কথা, মাঝে-মাঝে এমন টর্চার না করলে শরীরে ঠিক জুত হয় না শিকদারের।

সফল ভাবেই সেরে ফেলেছিল সব কাজ। যদিও এতসব ঝামেলার কারণ বুঝতে পারেনি। প্রথম-প্রথম কথা ছিল, ওই উমা নামের বিজ্ঞানীকে রাস্তায় পেরে ফেলবে শিকদারের কোনো এক আততায়ী। কিন্তু কেন যেন সরাসরি না গিয়ে, এমন ঘুরপথে গেল অহিংশ!

মেজাজ খারাপ হবার এটাও একটা কারণ। এত ঝুঁকি নেবার একদম দরকার ছিল না। রাস্তায় মেরে ফেললেই হতো। অন্য কাউকে দিয়ে খুন করিয়ে, নিজেই পুলিশকে খুনির ব্যাপারে তথ্য দিত শিকদার। তার দিন দুয়েক পরে লোকটাকে পাওয়া যেত বুড়িগঙ্গা নদীতে। ব্যস, খেল খতম।

নগণ্য এক মাস্টারনিকে বাগে পাওয়ার জন্য নিজে মাঠে নামতে চায়নি শিকদার। অথচ সেই কাজটাও ওকে করতে বাধ্য করা হয়েছে। লাভটা কী হলো? এখন পুলিশের হাতে ওকে ধরার সরাসরি প্রমাণ চলে গেল। কেসটা অচিরেই জনসম্মুখে চলে আসবে। তখন আর পালাবার পথ পাবে না শিকদার।

তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যকে তাসের ঘর বানিয়ে ছেড়েছে এই অহিংশ।

এখনও রাগে কাঁপছে ওর গা। সামনে একটা পর্দা, ওটার ওপাশেই বসে আছে নাম না জানা, চেহারা না চেনা অহিংশের দালাল। শিকদারের ইচ্ছা হচ্ছে, পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে। একগুলিতে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয় লোকটার। এমন ইচ্ছা এবারই প্রথম না, আগেও হয়েছে। কিন্তু মাসে-দুই মাসে একটা করে মেইল পায় শিকদার। যাতে থাকে ওর নানা অপরাধ-কর্মের বিস্তারিত বিবরণ। যেগুলো পুলিশের হাতে পড়লে, আরও আগেই চৌদ্দো শিকের পেছনে থাকতে হতো ওকে।

সামনেও তো তাই করতে হবে, তিক্ত মনে ভাবল শিকদার। ওর চাইতে মনের সাধটা মিটিয়েই ফেলি।

এগোবে কি এগোবে না, তা ভাবছে লোকটা। এমন সময় পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো একটা হাত। সবুজ একটা পাসপোর্ট ধরে আছে হাতটা।

'নাও।' গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ ভেসে এলো।

আদেশ পালন করল শিকদার। খুলে দেখে, ওটা আসলে বাংলাদেশের পাসপোর্ট। ছবির জায়গায় অন্য একটা মানুষের ছবি। আর নামটাও ভিন্ন–কলিম দফাদার। চোখে প্রশ্ন নিয়ে পর্দার দিকে তাকাল সে।

‘ওটা তোমার পাসপোর্ট। আমাদের ডাক্তাররা তৈরি আছেন। তোমার প্লাস্টিক সার্জারি হবে। চেহারার খুব বেশি পরিবর্তন আনা হবে না, কিন্তু যতটুকু আসবে তা এদেশের পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য যথেষ্ট। সেই সঙ্গে আমেরিকার ভিসা দেওয়া হচ্ছে তোমাকে, ওই পাসপোর্টের বিপরীতে। যথেষ্ট পরিমাণ টাকাও দেওয়া হবে। ওখানে গিয়ে যেন আমাদের কাজে আসতে পারো, সেটাও দেখব আমরা।’

‘কিন্তু...’ কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভাবল শিকদার। ‘এখানকার ব্যবসার কী হবে? আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে সরে যাচ্ছেন?’

‘নাহ,’ উত্তর এলো। ‘বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তুমি ধরা না পড়লে, তোমার সংগঠনের ওপর একদম আঘাত আসবে না। কেবল নেতার জায়গায় বসবে আরেকজন। তবে একটা কাজ বাকি আছে তোমার। সেটা করতে যদি সক্ষম হও, তাহলে বাংলাদেশে থাকার আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না।’

শ্রাগ করল শিকদার। প্রস্তাবটা ওর মনে ধরেছে। ডন ওয়াসির মতো নয় সে, দেশের ভেতরে ও বাঘ। বাইরের কোনোকিছু কোনোদিন সামলাতে হয়নি ওকে। ওসব অহিংশই দেখেছে। এখন যদি বাইরের অপরাধজগতে ভাগ বসানো যায়, ক্ষতি কী? তবে হ্যাঁ, বুঝতে পারছে যে পুরোপুরি সংগঠনটার ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে সে। কিন্তু উপায়ও যে নেই। আপাতত মাথা নিচু করে থাকি, ভাবল ও। পরে নাহয় সুযোগ পেলে কিছু করা যাবে। ‘কী কাজ?’

‘এই মিশনের নেতৃত্বে থাকব আমি নিজে,’ পর্দার ওপাশের মানুষটা উঠে দাঁড়াচ্ছে, পরিষ্কার বুঝতে পারল শিকদার। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, আস্তে-আস্তে সরে যাচ্ছে পর্দাটা। ‘সুন্দরবনে যেতে হবে আমাদের।’

পর্দা সরিয়ে এই প্রথমবারের মতো শিকদারের সামনে এলো অহিংশের মাঝবয়সি, কিন্তু শক্ত-পোক্ত শরীরের অধিকারী এজেন্ট।

‘আজ রাতেই রওনা দেব। তোমার তিন-চারজন বাঘা বাঘা লোককে বেছে নাও। প্লেন নিয়ে যশোরে যাব আমরা। সেখান থেকে গাড়ি করে খুলনা। শক্ত-পোক্ত লোক নেবে। নিয়তিদের আগেই টিয়ার চরে পৌঁছাতে চাই আমি। লঞ্চের দরকার নেই। স্পিড-বোটের ব্যবস্থা করো।’

*

টপ-টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে নিয়তির। এসব কিছু আগে জানত না ও। ডায়েরির পাতায় হাত বুলিয়েই বুঝতে পেরেছিল– ওখানে কিছু না কিছু লিখে গিয়েছে উমা। কিন্তু এত বড়ো একটা ব্যাপার সে কল্পনাও করতে পারেনি।

দিশেহারা বোধ করছে রাফসান, কীভাবে সান্ত্বনা জানাবে মেয়েটাকে তা বুঝে উঠতে পারছে না। এদিকে ওকে কাঁদতে দেখে সামলাতেও পারছে না নিজেকে। মেয়েটাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরল ও, বাধা পেল না কোনো। ওর বুকের ভেতর মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল নিয়তি।

মেয়েটার কান্না দেখে খারাপ লাগছে রাফসানের, আবার ওর বুকের আশ্রয়ে এসে নির্ভার ছোট্ট পাখির মতো সান্ত্বনা খুঁজে নিচ্ছে দেখে ভালোও লাগছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পর, কান্না থামাল নিয়তি। উঠে গিয়ে চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিল। চুপচাপ বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর

আচমকা মুখ খুলল মেয়েটা, ‘কথা দিলাম, উমা। তোর কাজ আমি শেষ করবই।’

চার

পরদিন সকালে যখন ডেকে এসে দাঁড়াল নিয়তি, তখন অনেকটাই কমে গিয়েছে ওর চোখের ফোলা ভাবটা।

স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে এসেছে বলে রাতটা এক কেবিনেই কাটাতে হয়েছে ওদের। মেয়েটাকে ইতস্তত করতে দেখে মুচকি হেসে কেবিনের মাঝেই একটা পর্দা টানিয়ে দেয় রাফসান। নিজে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। যতটুকু সম্ভব, ওভাবেই ঘুমিয়ে নিয়েছে। নিয়তিকে অভয় দেওয়ার জন্য বলেছে, চিন্তা না করতে। রাত-বিরাতে মেয়েদেরকে বিরক্ত করার অভ্যাস নেই ওর।

হেসে ফেলেছিল নিয়তি। জানিয়েছিল, কারাতে ট্রেনিং নেওয়া আছে ওর। তাই প্রাণের মায়া থাকলে, বিরক্ত না করাটাই শ্রেয় হবে!

সকালের নাস্তা সেরে নিয়ে ডেকে বসল দুইজন। চুপচাপ উপভোগ করছে বনের সৌন্দর্য। একে-অন্যের দিকে যে ঝুঁকে পড়ছে আস্তে-আস্তে, তা দুজনের কাউকেই বলে দিতে হলো না।

বেশ কিছুক্ষণ পর, আস্তে করে হাত বাড়িয়ে রাফসানের হাত নিজের হাতে টেনে নিলো নিয়তি। কিছুটা দ্বিধার সাথে চাপ দিল হাতে। প্রত্যুত্তর পেয়ে বুঝল, রং শুধু এক মনেই লাগেনি।

হাতে-হাত রেখে অব্যক্ত ভাষায় কথা বলে চলল দুজনে। যারা পেছনে লেগেছে, তারা যে এত সহজে ছেড়ে দেবে না–তা অজানা নেই।

কে জানে কী পরিণতি হবে এই অভিযানের!

*

সন্ধ্যার দিকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে উপস্থিত হলো ওরা।

অনেক বছর আগে একবার এসেছিল নিয়তি এখানে। কিন্তু সেই স্মৃতি যেন আজও অম্লান হয়ে আছে ওর মনে। চাঁদ উঠতে দেরি নেই বেশি। তারপরও, আধো আলোতে পথ দেখে এগিয়ে যেতে লাগল উরগ গোত্রের গ্রামের দিকে। মনে দুশ্চিন্তা, খুঁজে পাবে তো? এদিকের কতটা পরিবর্তন হয়েছে গত কয়েক বছরে? সালেহা বেগম কি এখনও ওখানকার নেত্রী? আচ্ছা, উমার চুরিটা ধরা পড়ে যায়নি তো?

বার দুয়েক পথ হারালো অন্ধকারে। অবশ্য ঠিক অন্ধকার বলা চলে না, আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, সেদিনও পূর্ণিমা ছিল। আজও পূর্ণিমা!

দূর থেকে লণ্ঠনের আলো দেখতে পেল রাফসান। ভাগ্যিস পেয়েছিল, নইলে আরও কতক্ষণ ঘুরতে হতো, কে জানে! আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল ওরা। অচিরেই এসে পৌঁছাল গ্রামে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, গ্রামের ঠিক মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে একটা। সেটাকে ঘিরে বসে আছে রাফসান-নিয়তি। ওদের ঠিক উলটো দিকে বসে আছেন সালেহা বেগম।

উমার মৃত্যু, ওর আবিষ্কার–সব কথাই সালেহা বেগমকে গোপনে জানিয়েছে নিয়তি। গ্রামের সবার সামনে বলার সাহস হয়নি ওর। তবে মূর্তি চুরি করার অংশটা বাদ দিয়ে। ওটা শুনলে সালেহা বেগম কী করেন, তা ধারণা করতে পারছে না বলেই।

‘ওইহানে ওহন আর কেউ যায় না।’ বললেন সালেহা বেগম। ‘তোমার বান্ধবী আইছিল আরেকবার। ভেতরে ঢুইকা পূজা করল, কী সব কইল। হের কয়েক সপ্তা পর থেইক্যাই দেখি, আর কাম অয় না মন্দিরে। আগে যেইখানে সব্বাই এক-দুই দিনে সুস্থ অয়া যাইত, হেইখানে কয়েকদিন রাইখাও কাম হইতাছে না। এহন আর তাই কেউ যায় না।’

উমার চুরিই যে এর জন্য দায়ী, তা আর বলে দিতে হলো না নিয়তিকে। ‘ওখানে যে গাছটা ছিল, সেটার কী হলো?’

‘ওইডাও মরবার লাগছে।’ জানালেন সালেহা বেগম। ‘এক বছর আগে গেছিলাম। তহন দেইখ্যা মনে হইল, আর বেশিদিন বাঁচপ না ওইটা।’

তাড়া অনুভব করল নিয়তি। ‘আমাদেরকে নিয়ে যাবেন ওখানে?’

‘ক্যান?’ রাফসানের দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন সালেহা বেগম। ‘তোমাগো ওইখানে যায়া কি কাম? তোমার বান্ধবী হিন্দু আছিল, হ্যায় মন্দিরে যাইবার পারে। তুমি ক্যান যাইবা?’

রাফসানের পরিচয় দিল নিয়তি। জানাল, উমার সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করত সে। তারপর বলল, ‘নতুন যে আবিষ্কারের কথা বললাম আপনাকে, সেই ব্যাপারে এর সঙ্গে কাজ করত উমা। গাছটা খুব দরকার আমাদের। একটা ডাল, একটা ফল বা নিদেনপক্ষে একটা পাতার দরকার আমাদের।’

আরও কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন সালেহা বেগম। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আমার পোলার জীবন বাঁচাইছিলা তোমরা। ঠিক আছে। চল তাইলে।’

*

শক্ত সমর্থ দুইজন শিষ্যকে সাথে নিয়ে টিয়ার চরের পাশেই আরেক চরে আস্তানা গেঁড়েছে শিকদার। সাথে আছে রহস্যময় অহিংশ এজেন্ট। নিজের নাম জানায়নি সে। তবে খবরদারী করছে ঠিক।

প্লেন নিয়েই যশোরে এসেছে ওরা। লোকটার ক্ষমতার নিদর্শন দেখে অবাক না হয়ে পারেনি। প্রাইভেট বিমান আছে তার, সবার অলক্ষ্যেই উঠে পড়েছে ওতে। যশোর থেকে দ্রুতগামী গাড়িতে খুলনা। সেখান থেকে স্পিড বোটে এতদূর। বিপজ্জনক ছিল যাত্রাটুকু। কিন্তু এজেন্টের তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই।

সকাল থেকে চোখে বাইনোকুলার নিয়ে বসে আছে সে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ওপাশের আরেক চরে। ওখান থেকে নজর রাখার জন্য।

পেটে দানা-পানি তেমন কিছু পড়েনি। পড়েছে শুধু শুকনা খাবার। আগুন ধরাতে নিষেধ করে দিয়েছে লোকটা, তাই ইচ্ছা হলেও সিগারেট পর্যন্ত টানতে পারছে না।

সন্ধ্যার দিকে আচমকা নড়েচড়ে বসল এজেন্ট লোকটা। কিছু একটা দেখতে পেয়েছে সম্ভবত। নিজের বাইনোকুলারটাও চোখে দিল শিকদার। দূরের দৃশ্য একলাফে চলে এলো চোখের সামনে। ডেকের ওপর বসা নিয়তিকে সঙ্গে-সঙ্গে চিনে ফেলল। ওই হারামজাদী যে লোকটার হাত ধরে বসে আছে, তাকে দেখে মাথায় যেন খুন উঠে গেল।

লোকটার নাম যে রাফসান, তা জানে না শিকদার। তবে জানে যে এই লোকের কারণেই তিন-তিন জন দক্ষ অনুসারীকে হারাতে হয়েছে

ওর। জানে, এর জন্যই হুমকির মুখে পড়েছে ওর সাম্রাজ্য!

তখনই স্পিড বোটের দিকে রওনা দিচ্ছিল লোকটা, কিন্তু এজেন্ট থামাল ওকে। চাপা স্বরে নির্দেশ দিল-ঘুরে গিয়ে অন্য চরে থাকা শিষ্যকে নিয়ে আসতে। এমনিতেই লোক-বল বেশি আনেনি ওরা। আনলে দ্রুত আসতে পারত না, লোকজনের নজরেও পড়তে হতো। যে কয়জন এসেছে, তাদের কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না। নইলে পরিকল্পনা সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

দ্রুতগতির স্পিড বোটে শিষ্যকে ফিরিয়ে আনতে বেশিক্ষণ লাগল না শিকদারের। ঘুরপথে গিয়েছে বলে মিনিট পনেরো লাগল, নইলে পাঁচ-সাত মিনিটের মাঝেই ফিরতে পারত।

আগে থেকে ঠিক করা আছে সবকিছু, চুপি-চুপি টিয়ার চরে গিয়ে উঠবে ওরা, যে পাশে নিয়তিদের লঞ্চ থেমেছে, তার উলটো পাশে। এরপর পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাবে লঞ্চটার দিকে। এজেন্টের নির্দেশ, লঞ্চ থেকে নামতে দিতে হবে ওই মাস্টারনিকে। তারপর তার পিছু অনুসরণ করতে হবে।

কারণটা না বুঝলেও, কথামতো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিকদার।

স্পিড বোটে চড়ল ওরা চারজন। এই তো আর কয়েক ঘণ্টা।

তারপর শেষ হবে এই ইঁদুর-বিড়ালের খেলা।

পাঁচ

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে নিয়তিরা, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ।

পরিবর্তন কম আসেনি এখানে। জঙ্গলটাকে এখন অনেকটাই কম ঘন লাগছে। কে জানে, হয়তো রূপালি আলোর খেলায় ভুল দেখছে চোখে! কিন্তু সত্যি, গাছের ঘনত্ব আর আগের মতো মনে হচ্ছে না। এরমাঝে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সালেহা বেগম। কিন্তু তাকেও কেমন দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। একবার তো পথ ভুল করে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন ওদের। মিনিট পাঁচেক পর আবার নিজেই বললেন, ফিরে যেতে হবে ওদের! অনেকটা পথ পেছনে এসে আবার ধরলেন নতুন পথ। আগেরবার বাঁ দিকে গিয়েছিলেন, এবার গেলেন ডান দিকে।

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা হাঁটার পর, পরিচিত সেই মন্দিরটাকে দেখতে পেল নিয়তি। আগেরবারের সাথে অনেক পার্থক্যও ধরা পড়ল। গতবার মনে হচ্ছিল, উজ্জ্বল এক আভা ঘিরে আছে দালানটাকে। এবার মনে হচ্ছে নিঃস্প্রভ কোনো জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আম্বাইহেক্সিয়ামের কাজ–বুঝতে পারল নিয়তি। গতবার ছিল, এবার নেই।

তাই কেমন যেন পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে দালানটাকে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখল নিয়তিরা। তারপর এক পা-এক পা করে এগিয়ে গেল মন্দিরটার দিকে। কিন্তু এক বিন্দু নড়লেন না সালেহা বেগম। যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

পিছু ফিরে তাকাল নিয়তি, চোখে ওর প্রশ্ন। কিন্তু সেটা মুখে উচ্চারণ করার দরকার পড়ল না। যেন অনুচ্চ প্রশ্নটা টের পেয়েই সালেহা বেগম জানালেন, 'তোমার বান্ধবী তো ফিরায়া দিছিল আমার পোলাডারে। কিন্তু গত বছর, পা কাইট্যা যায় ওর। জ্বর আইছিল। শহরে নিয়া যাইবার পারি নাই, তাই এইহানে আনছিলাম। কিন্তু বাঁচে নাই পোলাডা।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'আমি যামু না ভিতরে। তোমাগো কতক্ষণ লাগব?'

বেশি একটা সময় লাগার কথা না নিয়তিদের, এক ঘণ্টা খুব বেশি হলে। আসলে কী খুঁজে পাবে ভেতরে, তা-ও তো জানে না। তারপরও হাতে আরেক ঘণ্টা রেখে বলল, 'ঘণ্টা দুয়েক।'

'ঠিক আছে। তোমরা তাইলে কী করবা, করো। আমি দুই ঘণ্টা পর আইতাছি।'

এ কথা বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি।

শ্রাগ করে সামনে এগিয়ে গেল রাফসানরা। আসার সময় লণ্ঠন নিয়ে এসেছে গ্রাম থেকে। তাই আর অসুবিধা হলো না। দুরু দুরু বুকে আর কাঁপা কাঁপা পায়ে মন্দিরের ভেতরে পা রাখল তারা।

গতবার যেমন দেখেছিল, তেমনই আছে–সেই মাটির মেঝে, সেই পাথরের দেওয়াল। কিন্তু এবার বেদির সামনে বসে নেই কোনো পশু, এমনকী বেদিতে থাকা মূর্তিটাকে ঘিরে নেই একটাও সাপ। একেবারে নির্জন মনে হচ্ছে জায়গাটাকে, যেন পরিত্যক্ত এক সমাধিতে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা।

আচমকা হিস-হিস শব্দে সম্বিত ফিরল ওদের। মূর্তির গায়ে সাপ নেই বটে। কিন্তু গাছটার কথা ভুলেই গিয়েছিল দুইজন। ওটার একটা ডালে লকেট ঝুলিয়ে দিয়েছিল উমা। লকেটটাও তো সেই একই মহাজাগতিক বস্তু দিয়ে তৈরি। সাপের এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে

ওটার প্রতি! তাই ডালটার সঙ্গে শুধু লকেটই ঝুলে নেই, ঝুলে আছে কয়েকটা সাপও।

অবশ্য এর জন্য প্রস্তুত ছিল রাফসানরা, খুলনা নেমে প্রথমেই কার্বলিক এসিড কিনে এনেছে। পকেট থেকে ওটা বের করল যুবক। অদ্ভুত একটা গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ।

সাপগুলো সেই গন্ধ সহ্য করতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালাল গাছটাকে ছেড়ে। কিন্তু দূরে গেল না, কাছেই শুয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল!

গাছটার দিকে এগিয়ে গেল নিয়তি, সাথে-সাথে হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। ওপরে তাকিয়ে দেখে, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে একজোড়া চোখ। আরও কয়েক পা এগোতেই দৌড়ে পালাল ওই চোখের মালিক–একটা বানর।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মেয়েটা। এর অর্থ, লকেটের ক্ষমতা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। হয়তো পরিমাণে ছোটো বলে, বড়ো এলাকা পর্যন্ত ওটার প্রভাব বিস্তৃত নয়। কিন্তু কিছুটা হলেও আছে এখনও!

লকেটটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল সে–ঠান্ডা, ধাতব একটা অনুভূতি পেল হাতে। শির শির করে উঠল ওর দেহ। এদিকে রাফসানের নজর মূর্তিটার ওপর। ওটার কাছে গিয়ে ঝুঁকল যুবক। অদ্ভুত একটা মূর্তি, মাথার জায়গায় সাপের ফনা। গল্পের বই পড়ে যুবক, সেই সঙ্গে মিথলজির প্রতি রয়েছে অদ্ভুত টান। কেন যেন মূর্তিটাকে দেখে মিশরীয় বলে মনে হলো ওর। প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের দেবতাদের দেহ তো মানুষের আদলে তৈরি মনে করত, কিন্তু মাথার জায়গায় সবসময় বসাত কোনো-না-কোনো প্রাণীকে।

এই দেবীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সুন্দর করে খোদাই করা হয়েছে এক রমণীর দেহ, কিন্তু তার মাথার জায়গায় রয়েছে একটা সাপের

মস্তক।

কাঁপা কাঁপা হাতে ওটাকে তুলে নিলো রাফসান। কে জানে, কবে এই মন্দিরটা এখানে স্থাপন করেছে পথহারা এক মিশরীয়! পথহারাই হবে, কেননা মিশরীয় কোনো ব্যক্তির এখানে আসার কথা না।

হাতের ভেতর আশ্চর্য নরম মনে হলো মূর্তিটাকে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, এটা আসলে নকল। আসলটা অনেক আগেই চুরি করেছে উমা। নিয়তির দিকে তাকাল ও। মেয়েটা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে লকেট আর গাছের দিকে।

'কী করবে?' কয়েক মিনিট চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর জানতে চাইল যুবক।

'লকেটটা নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম।' জানাল নিয়তি। 'কিন্তু এখন বুঝতে পারছি না যে কী করব। এই গাছের ডাল নিয়ে গেলে কাজ হবে কিনা জানি না, এমনিতেই মরা-মরা দেখাচ্ছে আগের চাইতে।' একটা ফল ছিঁড়ল নিয়তি। 'শুধু এতে যে কাজ হবে না, সেটাও তো জানি।'

'আমি বলি কী,' যোগ করল রাফসান। 'এটাকে এখানেই রেখে যাও। আমরা শুধু একটা ফল বা গাছের একটা ডাল নিয়ে যাই। যদি কাজ না হয়, তাহলে ফিরে এসে লকেটটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

বেশ কিছুক্ষণ ভাবল নিয়তি। একদিকে বনের সব পশু এবং উরগদের স্বাস্থ্য, অন্য দিকে দায়িত্ব। ও জানে, সালেহা বেগমকে সব বললে, উরগ গোত্রের চিকিৎসা আবার আগের মতোই সফলভাবে সম্ভব হবে। কিন্তু তাহলে উমার মৃত্যু, ওর মায়ের মৃত্যু–এসব তো বিফলে যাবেই...সেই সঙ্গে বিশ্ব হারাবে অসাধারণ এক আবিষ্কারকে। পেনিসিলিনের পর, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার হতে যাচ্ছে নিমা ভাইরাসটা!

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে মুখ খুলল মেয়েটা। 'নাহ, আমরা এটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এখানে রেখে গেলে উমার খুনিদের হাতে জিনিসটা পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তারচেয়ে বড়ো কথা–মানবজাতির এই আবিষ্কারটা বড়ো দরকার।'

মানুষের যে নিমা ভাইরাসের অ্যাক্টিভেটেড ফর্মটা দরকার, তা জানে রাফসান। নিজেও যে ডাক্তার, তাই ক্যান্সারের প্রকোপ কতটুকু–সে কথা অন্য কারও কাছ থেকে শোনার দরকার নেই ওর। কিন্তু তারপরও কেন যেন মানতে চাইছে না ব্যাপারটা। প্রত্যেকটা জীবনই সম্মানিত–এ কথা ডাক্তার হবার সময়ই শপথ করে বলেছিল। তাই মানবজাতির স্বার্থে, ছোটো একটা গ্রামের এবং এই জঙ্গলের পশুপাখিদের উৎসর্গ করাটা মেনে নিতে পারছে না। পারছে না নিয়তির এই রূপটা দেখে আগের নিয়তির সাথে মেলাতেও।

তবে হ্যাঁ, মেয়েটার একটা কথায় যুক্তি আছে ঠিকই। সন্দেহ নেই–শত্রুপক্ষ পেছনে লেগেছে। আশা করা যায়, ওরা এখানে আসার আগেই ফিরে যেতে পারবে রাফসানরা। কিন্তু যদি লকেটটাকে এখানে রেখে যায়, আর ওটা শত্রুদের হাতে পরে, তাহলে আর কোনো আশাই থাকবে না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হলো নিয়তির প্রস্তাব।

ডাল কাটতে সময় লেগে গেল বেশ। সবচেয়ে সতেজ ডালটাই কাটল ও, সেটার সাথেই ঝুলছিল লকেটটা। কয়েকটা ফলও ছিঁড়ে ফেলল, সবগুলো একটা ঝোলায় পুড়ে নিয়ে রওনা দিল সামনের দিকে। দুই ঘণ্টা শেষ হয়ে গিয়েছে, কোনো দিক দিয়ে তা বলতেও পারবে না। এখুনি ফিরে আসবেন সালেহা বেগম, ওদেরকে নেওয়ার জন্য।

ফেরার পথে কী মনে করে তুলে নিলো মূর্তিটাকে। মুচকি হেসে ওটার গলায় পড়িয়ে দিল লকেটটা। তারপর পা রাখল বাইরে, প্রাঙ্গণে।

‘হ্যান্ডস আপ!’ বাইরে পা রাখা মাত্র শুনতে পেল কঠোর কণ্ঠের একটা আদেশ। চমকে উঠে আরেকটু হলে ফেলেই দিয়েছিল সবকিছু। ‘রাম-দাটা ফেলে দাও।’ পরিচিত আরেকটা কণ্ঠ আদেশ দিল এবার, পাশ থেকে।

বুঝতে পারল রাফসান, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদের। চুপচাপ আদেশ পালন করল ও। তিক্ত কণ্ঠে বলল, ‘আমার আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল। এসবের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একজন শত্রুপক্ষের চর না হয়ে যায় না!’

মুচকি হাসলেন দ্বিতীয় আদেশকারী।

লোকটার দিকে এতক্ষণ কষ্ট নিয়ে তাকিয়ে ছিল নিয়তি। এবার বলল, ‘কেন? কেন করলেন কাজটা, মেহেদি কাকু?’

ছয়

একদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন মেহেদি আর নিয়তি। এদিকে শিকদারের হুমকি শুনে হাত থেকে রাম দা ফেলে দিয়েছে রাফসান। ঝড় বইছে ওর মাথার ভেতর, ঝোলায় কী কী নিয়ে এসেছে তা ভাবতে চাইছে। রাম দা, কার্বলিক এসিড, কিছু রশি আর একটা ম্যাচ। এছাড়া তো আর কিছুই নেই! তবে পায়ের কাছে যে অস্ত্রটা পড়ে আছে, সেটা প্লাস-পয়েন্ট।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছে শিকদার। যাকে মারতে গিয়েছিল, সেই মাস্টারনি আর অহিংংশের এজেন্ট যে পূর্ব-পরিচিত–তা জানা ছিল না। পর্দার ওপাশ থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিল লোকটা, তখনও খুব একটা অবাক হয়নি। হবেই বা কেন? একে তো চেনেই না!

এখন বুঝতে পারছে, এই লোকটা আসলে অনেক গভীর জলের মাছ। নিজে রাফসানকে নিরস্ত্র করলে হয়তো খেয়াল রাখত। কিন্তু নাটকীয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে এক শিষ্যকে ইঙ্গিত করল সে। বোঝাতে চাইল যে যুবকের ঝোলাটা নিয়ে আয়। তারপর মন দিল সামনে ঘটতে থাকা নাটকে।

‘উমা আপনাকে আপন-চাচার মতো সম্মান দিত। আর ওকেই কিনা আপনি?’ বলতে-বলতে ধরে এলো নিয়তির কণ্ঠ। ‘জানেন? আপনার নামটা পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করেনি ও? ডায়েরিতে পর্যন্ত ইঙ্গিত দিয়েই চুপ থেকেছে। অথচ চাইলেই নাম বলে দিতে পারত।’

বিভ্রান্তি খেলে গেল মেহেদির শক্ত চেহারায়। তবে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। মুখ খুললেন তিনি, ‘সেন্টিমেন্ট। এই সেন্টিমেন্টই দুনিয়াকে খেল। অথচ লাভ হয়েছি কি কখনও এর ফলে? বউ-বাচ্চার জান

বাঁচাবার জন্য ধার নেবার সময় জমি বন্দক রাখে মানুষ। তখন তাদের মনে থাকে না যে ওটা তার পূর্ব-পুরুষের জমি। অথচ যখন জমি ক্রোক করতে যাওয়া হয়, তখন সেন্টিমেন্টের ঝরনা বহে। তাজ্জব এক দেশ।'

প্রথম-প্রথম কিছুই বুঝতে পারল না রাফসান, পরক্ষণেই মনে পড়ল লোকটার অতীতের কথা। বুঝতে পারল, পিতার কথা বলছেন তিনি।

'অথচ জীবনে উন্নতি করার জন্য দরকার নিয়ম মেনে চলা, নির্দেশ মেনে চলা। আসল সফলতা কোথায়, জানো? আসল সফলতা হলো সঠিক প্রভুকে বেছে নেওয়ায়। এমন একজনকে বেছে নিতে হবে, যিনি মানবজাতির ভালাইয়ের জন্য নেবেন সব সিদ্ধান্ত। চিন্তা করতে পারো? দুনিয়াতে নেই হানাহানি, কোনো লড়াই কিংবা যুদ্ধ। না খেয়ে মরছে না কেউ, বিনা চিকিৎসায় কাউকে চিরতরে চোখ মুদতে হচ্ছে না। যেখানে নেই সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ।

'এসব সম্ভব একমাত্র শক্তিশালী এক নেতার অধীনে কাজ করলে। সম্ভব শুধু কঠোর হাতে বিশ্বের সব মোড়লদের দমন করার মাঝে। কিন্তু তোমার বান্ধবী উমার চিন্তা-ভাবনা এতটা বিস্তৃত নয়। জীবনে একবারও সে বিগ পিকচারটা দেখতে পায়নি। সব সময় থেকেছে তার ছোটো, গোছানো দুনিয়াতে। রোগ মুক্তির পেছনে ছুটে কী লাভ? যদি না সেই রোগকেই চিরতরে দূর করা হয়?' শ্বাস নেবার জন্য থামলেন তিনি।

সেই সুযোগে কথার হাল ধরল রাফসান। পিঠের ঝোলাটা আগেই দিয়ে দিয়েছে শিকদারের শিষ্যকে। হাতে ধরা ছিল রাম দা, সেটাও ফেলে দিয়েছে। অন্য হাতের কার্বলিক অ্যাসিডের বোতল থেকে কিছুটা সবার অলক্ষ্যে ঢেলে নিয়েছে পায়ে। এবার সেটার মুখ বন্ধ করে বোতলটাকেও পায়ের কাছে রেখে দিল। 'আপনি এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছেন?'

কথা বলার নেশায় পেয়েছে যেন মেহেদিকে। রাফসানের দিকে এক নজর তাকিয়েই তিনি যোগ করলেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। অহিংশ আমাকে সেই পথ দেখিয়েছে।'

'অহিংসা?' হতবাক নিয়তি জানতে চাইল।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন মেহেদি। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল শিকদার। 'বস, দাঁড়ান তো। আগে একটা কথা বলে নেই।' বলে ফিরল সে রাফসানের দিকে। 'তোদের সঙ্গে একটা বুড়ি আসছিল না? কোথায় সে?'

ভয়ে কেঁপে উঠল নিয়তি। শুধু-শুধু সালেহা বেগমকে এত বড়ো বিপদের মাঝে টেনে এনেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। এক বৃদ্ধা মহিলা এই চার ষণ্ডার সামনে টিকতেই পারবেন না। 'কোন বুড়ি?'

বিরক্তি ছেয়ে গেল শিকদারের চেহারায়। এগিয়ে এসে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিয়তির গালে আঘাত করল ও। ওই এক আঘাতেই কেটে গেল মেয়েটার ঠোঁট। রাফসান নড়ে উঠতেই ওর দিকে এগিয়ে গেল এক অস্ত্রধারী শিষ্য। পেটে রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা দিল তীব্র গতিতে। ব্যথার তীব্রতায় নীল হয়ে গেল রাফসান।

'আগেরবার সময় নষ্ট করছিস ভান ধরে, মাস্টারনি।' বলল শিকদার। 'এবার আর সেই সুযোগ দিচ্ছি না।'

এগিয়ে গেলেন মেহেদি। 'মারার কোনো দরকার নেই–'

সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল শিকদারের। 'আপনি চুপ করেন,' রাম ধমক দিয়ে উঠল সে। 'অহিংশের এজেন্ট হোন আর যা-ই হোন, আপনার যে এসবের অভিজ্ঞতা নাই তা পরিষ্কার। আমাকে আমার কাজ করতে দেন।' বলে আবার নিয়তির দিকে মন দিল ও। 'দেখ মাস্টারনি, কম জ্বালাস নাই। তোর আর তোর নাগরের জন্য তিনজন কাছের

মানুষকে হারাইছি আমি। বেঁচে ফিরতে পারবি, সে আশা করিস না। কিন্তু যদি আমার কথার উত্তর না দিস,' মেয়েটার শরীরে নজর বুলাল সে। 'ওই বুড়ার কথা জানি না, কিন্তু আমরা তিনজন হাট্টা-কাট্টা জোয়ান। বাকিটা বুঝে নে।'

একবিন্দু তেজ কমেনি নিয়তির, বরঞ্চ হুমকি শুনে যেন আরও জ্বলে উঠল সে। 'যদি ভেবে থাকিস যে–' কে জানে, কী সব হুমকি দিতে যাচ্ছিল মেয়েটা। কিন্তু তার আগেই থামিয়ে দিল রাফসান।

'আশপাশেই আছে কোথাও,' বলে বসল সে। আশা ছাড়েনি এখনও। সুন্দরবনের এই জঙ্গলে, এই চাঁদের আলোয় যে বৃদ্ধা সালেহা বেগম শহুরে কয়েক গুন্ডাকে ঘোল খাওয়াতে পারবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর মনে। আপাতত তথ্য সংগ্রহে মন দিতে চায় ও। চারপাশে পাতার ওপর দেহ ঘষটানোর শব্দ কান এড়ায়নি তার। আশা জেগে উঠছে মনে, ভাগ্য পক্ষে থাকলে এখান থেকেও বেঁচে বেরোতে পারবে। তাই চাইছে, মেহেদি কথা বলুন।

'ওই, সাকিইব্যা।' রাইফেলধারী এক শিষ্যের দিকে ইঙ্গিত করল শিকদার। 'দেখ, তো বুড়িরে পাস কিনা। পাইলে আর জিন্দা রাখার দরকার নাই। আর হ্যাঁ, তোর জিনিসটা দিয়া যাইস।'

জিনিস মানে পিস্তল। কোমরে গোজা অস্ত্রটা বের করে আনল যুবক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা মশাল নিয়ে রওনা দিল সে।

অস্ত্র হাতে নিয়ে রাফসানদের মুখোমুখি দাঁড়াল লোকটা। দুইটা পক্ষ হয়ে গিয়েছে এখন। একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন মেহেদি, শিকদার ও তার শিষ্য। অন্যদিকে রাফসান আর নিয়তি। মেহেদি ও শিকদারের হাতে পিস্তল। অন্য শিষ্যের হাতে রাইফেল, কাঁধে রাফসানের ঝোলা।

'অহিংসা-টহিংসা কী যেন বলছিলেন?' জানতে চাইল রাফসান।

‘অহিংসা নয়, অহিংশ।’ শুধরে দিলেন মেহেদি। ‘সুমহান এক আদর্শ নিয়ে হাজারো বছর ধরে কাজ করে আসছি আমরা। এতটাই ছড়িয়ে গিয়েছি যে, বাংলাদেশের মতো জায়গাতেও আছে আমাদের হাত। অবশ্য কিংবদন্তি যদি সত্য হয়, তাহলে হয়তো এই দেশ থেকেই হয়েছে সব কিছুর শুরু। কে জানে, হয়তো সামনের ওই মন্দিরটাই আমাদের প্রতিষ্ঠাতা, মহান ওয়াজেথের বানানো।’ শ্রাগ করলেন মেহেদি।

‘আপনি তো মুসলমান,’ যতটা সম্ভব সূত্র বের করে আনতে চাইছে রাফসান, তাই নিয়তির চোখ পাকিয়ে তাকানোটাও অগ্রাহ্য করছে। যে মেয়ে একটু আগে পুরো একটা গোত্র আর একটা বনকে বৃহত্তর স্বার্থে কুরবানি দিল, একই কাজ করার জন্য তার কাছ থেকেই বকাবকি শোনাটা ওর পোষাবে না। ‘তাহলে হিন্দু দেবীর অনুসরণ করছেন যে?’

‘অহিংশ কোনো ধর্মের বাঁধনে আবদ্ধ নয়। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান এসবে ভেদাভেদ নেই তার কাছে। হয়তো আদি প্রতিষ্ঠাতা, তেমনটা ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন? এখন অহিংশের লক্ষ্য একটাই। সুশাসন প্রতিষ্ঠা। বিশ্ব থেকে সব অনিষ্ঠ, সব অনাচার দূর করার জন্য চাই একের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি আমরা!’ চোখ চকচক করে উঠল মেহেদির; যেমনটা আদর্শের আফিমে বুঁদ হয়ে থাকলে, মানুষের চোখে দেখা যায়। আগেও এই দৃষ্টি দেখেছে রাফসান। ভুল আদর্শের বলি হওয়া মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয়।

হে আল্লাহ, সাহায্য করো আমাকে। বড়ো ধরনের ধার্মিক নয় রাফসান, কিন্তু আল্লাহয় বিশ্বাস করে ঠিক। আরেকটু কাল ক্ষেপণের সিদ্ধান্ত নিলো সে। ‘আর সেজন্য চাই উমার আবিষ্কার? যেন আপনাদের আইন মানতে যারা রাজি হবে না, তাদেরকে শায়েস্তা

করতে পারেন? আচ্ছা, আর দশটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন...নিদেনপক্ষে অন্যান্য কাল্টের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্যটা কি বলতে পারবেন?'

ফুটন্ত তেলে যেন পানি ঢালা হলো প্রশ্নটা করে। রেগে গেলেন মেহেদি। 'অহিংশকে আর দশটা কাল্টের মতো মনে করলে ভুল করবে হে অর্বাচিন। কী দিতে চায় অন্য সব কাল্ট? তোমার বলা অন্য সব টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন? আমরা মৃত্যুর পর কী হবে, সেই গল্প বলে কাউকে দলে টানি না। আমাদের লক্ষ্য এই দুনিয়াতেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।' একটু শান্ত হয়ে এলেন তিনি। 'আর সেজন্য যদি বৃহত্তর স্বার্থে দুয়েকটা প্রাণ যায়, তাহলে ক্ষতি কী? বিশ্বের ইতিহাস তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেবে।'

আড়চোখে নিয়তির দিকে তাকাল রাফসান। একই ধরনের কথা একটু আগে বলছিল মেয়েটাও, তবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করেনি। রূপালি আলোতেও দেখতে পেল, সাদা হয়ে গিয়েছে সে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে এই রকম কথা একটু আগে ওর নিজের মুখ দিয়েই বেরোচ্ছিল!

'তাই নাকি?' প্রশ্ন করা ছাড়ল না রাফসান। 'এখানকার পথ পেলেন কীভাবে? উরগ গ্রামের কাউকে ধরে এনেছেন নিশ্চয়ই?' লোকটা কথা বললেন না দেখে বুঝতে পারল রাফসান, ওর সন্দেহ সত্যি। 'ওর কী অবস্থা? বেঁচে আছে? নাকি শহিদের মর্যাদা লাভ করেছে?' কণ্ঠের ব্যঙ্গ ইচ্ছা করেই চাপা দিল না।

লাল হয়ে গেল মেহেদির চেহারা। 'দেখ–' মুখ খুললেন তিনি। কিন্তু তার আগেই রাফসানের প্রার্থনা শুনলেন আল্লাহ।

একটু আগেই পাতার ওপর দেহ ঘষটে চলার আওয়াজ শুনেছিল রাফসান। মনে আছে ওর, কীভাবে গাছের ডালটাকে ঘিরে ধরেছিল

সাপগুলো। উমার ডায়েরিতে লেখা কথাগুলোও মনে আছে– আম্বাইহেক্সিয়ামের প্রতি অস্বাভাবিক টান অনুভব করে সাপ।

তাই যখন অস্ত্রধারী লোকটা এসে টান দিয়ে ঝোলা নিয়ে নিলো, তখনই বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। বুদ্ধি না বলে আশা বলাই ভালো। আলতো করে নিজের পোশাক ভিজিয়ে নিয়েছিল কার্বলিক অ্যাসিডে, যেন সাপ ধারে-কাছেও না আসে। তখন থেকেই মনে-মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল ও। ফল পেল এতক্ষণে।

বেশ কয়েকটা সাপই এগিয়ে যাচ্ছিল অস্ত্রধারীর দিকে। একটা সাহস করে উঠতে শুরু করল লোকটার পা বেয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেহেদি আর রাফসানের কথা শুনছিল ছেলেটা। প্রথমবার কেবল পা ঝাড়া দিল সে। সাপটাও সম্ভবত শান্ত ছিল, তাই মাটিতে আছড়ে পড়েও কিছু করেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার ঝাড়া খেয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল প্রাণীটার। ফণা তুলে ছোবল বসিয়ে দিল অস্ত্রধারীর পায়ে। চিৎকার করে আছড়ে পড়ল লোকটা মাটিতে।

গভীর মনোযোগে সব কথা শুনছিল শিকদারও। সে নিজে অহিংশের ঘুঁটি হলেও, সংস্থার ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না। মেহেদিও কথার নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন। ছেলেটার চিৎকারে তাই কেঁপে উঠল সবাই, নজর চলে গেল সেদিকে।

এই একটা মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিল রাফসান। ঝুঁকে বসে কার্বলিক অ্যাসিডের বোতলটা তুলে নিলো হাতে। অন্ধকারে ওটাকে পানির ক্যান্টিন মনে করে শিকদার-শিষ্য সরিয়ে নেয়নি আর। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে ছুড়ে দিল শিকদারকে লক্ষ্য করে। আড়চোখে খেয়াল করেছে, নিয়তি সামলে নিয়েছে নিজেকে। এগিয়ে যাচ্ছে মেহেদির দিকে।

নিয়তির কারাতে দক্ষতার ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই রাফসানের।

বোতল ছুড়েই ছুট লাগাল ও শিকদারের দিকে লক্ষ্য করে। এদিকে শিকদারও পিছিয়ে নেই। আজ সে ডন বটে, কিন্তু এক কালে রাস্তাঘাটে ছিনতাই-খুন করে বেড়াত। এখনও শরীর-চর্চা করে নিয়মিত। নিখুঁত ওর রি-অ্যাকশন টাইম।

শিষ্যের দিকে মাত্র এক সেকেন্ড তাকিয়েছিল ও, পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে নজর ফেরায় রাফসানের দিকে। ছুটে আসা বোতলটা ঠিক দেখতে পেয়েছে, মাথাও সরিয়ে নিয়েছে সময়মতোই। তবে ঠিক পিছু পিছু রাফসানের ছুটে আসার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। ছেলেটা এত বড়ো ঝুঁকি নেবে তা বুঝতে পারেনি। তাই অস্ত্রের নল নেমে গিয়েছিল নিচের দিকে। উড়ন্ত বোতলের সামনে কেউ এতকিছু ভাবতেও পারে না। আধ-সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল অস্ত্রটা তুলতে।

এই আধ-সেকেন্ডেই কাছে চলে এলো রাফসান, অস্ত্রটাকে উঠতে দেখেছে; একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুরিয়ে দিল শরীর। শিকদারের ছোড়া গুলিটা কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? অ্যাড্রেনালিন এমন এক জিনিস, যার প্রভাবে গাড়ি পর্যন্ত তুলে ফেলে মানুষ। গুলির ধাক্কাও সহ্য করে নিলো রাফসান, কাঁধ দিয়ে আঘাত হানল লোকটার স্টার্নামে। একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল দুইজনে। শুরু হলো ঝাপটা-ঝাপটি।

বাইসেপ ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে গুলি, কিন্তু এখনও ব্যথার স্রোতটা ঠিক আঘাত হানেনি রাফসানকে। অস্ত্র সাথে এনেছিল ও, কিন্তু সেটাও রয়ে গিয়েছে ঝোলায়। তাই অনেক আগে শেখা পদ্ধতিগুলো কাজে লাগাতে চাইল যুবক। আহত হাতটায় জোর পাচ্ছে না বলে, এক ঝটকায় কেড়ে নিতে পারল না অস্ত্রটা। তাই আঙুল ঢুকিয়ে দিল ট্রিগারের পেছনে, যেন ওটা চাপতে চাইলেও না পারে শিকদার। প্রচণ্ড

ব্যথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ও। জানে, আঙুলটা ভেঙেও যেতে পারে।

হলোও তাই। বাঁ হাতের তর্জনীটা শিকদারের জোরে টিপে ধরা ট্রিগারের চাপ সহ্য করতে পারল না। মট করে ভেঙে গেল ওটা।

এদিকে গুন্ডা সর্দার কল্পনাও করতে পারেনি যে রাফসান এমন কিছু করতে পারে। না ছোটো গুন্ডা থাকা অবস্থায়, আর না ডন হওয়া অবস্থায় এমন ঝাপটা-ঝাপটি করতে হয়েছে ওকে। ডন বনার পর তো শিকার করেছে রসিয়ে রসিয়ে। তাই নতুন টেকনিকের কিছুই জানা নেই ওর। পরপর দুইবার ট্রিগার চাপার পর, একটু শিথিল হলো শিকদারের হাতের মুঠি। ধরেই নিয়েছে যে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে রাফসানের।

কিন্তু ট্রিগার টেপা হলেও যে শব্দ হয়নি, সেটা বুঝতে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় নিলো শিকদারের মস্তিষ্ক। রাফসানের প্রশিক্ষণের ফসল–এই সময়টুকু লাগল না ওর; ঝটকা টানে ছিনিয়ে নিলো অস্ত্রটা। এরপর তাক না করেই চালিয়ে দিল গুলি।

মাথায় নিজের বন্দুকের গুলি নিয়ে লুটিয়ে পড়ল বাংলাদেশের ডন।

অস্ত্র হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াল রাফসান। কিন্তু পুরোপুরি ওঠার আগেই পেটে খেল হাতুড়ির বাড়ি। অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, চাঁদের আলোয় কালচে বর্ণ ধারণ করছে ওর শার্ট। এক মুহূর্ত চন্দ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল রাফসান। দেখতে পেল, নিয়তির কপাল কেটে রক্ত ঝরছে ঝর-ঝর করে। মেয়েটিকে সামনে রেখে, পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন মেহেদি। ডান হাতের অস্ত্রটা ওর দিকেই তাক করা, বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন নিয়তিকে। ওর গলার ঠিক নিচে দিয়ে হাত বের করে, চেপে ধরে রেখেছেন নিজের দেহের সঙ্গে।

শিকদারের অস্ত্রধারী শিষ্য পড়ে রয়েছে পাশেই। বেচারার খিঁচুনি হচ্ছে থেকে থেকে। সম্ভবত তীব্র বিষধর কোনো সাপ কেটেছে ওকে। অথবা, কে জানে, হয়তো আম্বাইহেক্সিয়ামের লকেটের প্রভাব এটা। কাছে থাকলেই ওটার রশ্মি বাড়িয়ে দেয় সাপের বিষে থাকা নিউরো টক্সিনের প্রভাব!

এতকিছু ভাবতে এক মুহূর্ত লাগল কেবল রাফসানের। আগেই গুলি খেয়েছে, তারপর ধস্তাধস্তি...তারপর আবার পেটে আরেকটা গুলি। ধপাস করে আছড়ে পড়ল ও মাটিতে।

এক পা এক পা করে ওর দিকে এগিয়ে এলেন মেহেদি। এখনও নিয়তিকে ঢাল বানিয়ে আছেন। অস্ত্রটা তোলার চেষ্টা করল রাফসান, কিন্তু শক্তি পেল না একদম। শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল নিজের মৃত্যু দূতকে।

কাছাকাছি এসে থামলেন তিনি। মুচকি হাসলেন রাফসানের দিকে চেয়ে। নিয়তির চোখ দিয়ে পানি ঝরছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রাফসান। হালকা নড়ে উঠল মেয়েটা, ওকে বাঁচাতে চাইছে সম্ভবত। নিয়তিকে সাবধান করার জন্য আবারও অস্ত্রটা ওর গলায় চেপে ধরলেন মেহেদি।

আর একটা মুহূর্ত, তারপরেই সাঙ্গ হবে ওর খেলা–বুঝতে পারল রাফসান।

ঠিক সেই মুহূর্তেই, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল এক বাঘ!

*

রাফসান ও নিয়তিকে মন্দিরে রেখে, একটু পাশের একটা জায়গায় এসে বসেছেন সালেহা বেগম।

লেখাপড়া করেননি তিনি। তবে তাই বলে বোকা নন একেবারে। এসবের মাঝে যে কোনো কিন্তু আছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তিনি। সেজন্যই মাঝখানে একবার পথ ভুল করার ভান করেছিলেন। ছেলেমেয়ে দুই জনকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন এখানে।

এই কূপের অস্তিত্ব খুব কম মানুষই জানে। তিনিও জানতেন না আগে, হঠাৎ করেই জেনেছেন। একবার পথ ভুলে চলে আসেন এদিকে। আরেক পা দিলেই পড়ে যেতেন ভেতরে। আর ভেতরে যা রয়েছে, তা দেখেই বোঝা যায় যে একবার পড়লে আর ফিরতে হতো না!

অজস্র সাপে কিলবিল করছে কূপের ভেতরটা।

উরগ গোত্রের ইতিহাস অতি-প্রাচীন। গোত্র-প্রধান থেকে গোত্র-প্রধান জানতে পারে সেই ইতিহাস। গোত্রের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন এক পরিবারের শেষ জীবিত কন্যা সালেহা বেগম। তার আদি পূর্বপুরুষের নাম ছিল পদ্মা, তার কন্যা শুশ্রূষা। সেই কন্যার ঘরের মেয়ে সালেহা বেগম।

কবে, কখন, কীভাবে তার পূর্বপুরুষ মুসলমান হয়েছিল, জানা নেই সালেহার। তাতে খুব একটা কিছু যায়-আসে না তার। মন্দিরের ভেতরের ওই গাছটাকে আল্লাহর এক কুদরত বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। আরোগ্যদায়ী ওই ফলই সুস্থ করে তুলছে তাদেরকে–এই ছিল তার বিশ্বাস। তাই মূর্তি নিয়ে মাথা ঘামাননি খুব একটা। আছে, থাকুক না। কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না কারও। উমার চুরি করাটাও ধরতে পারেননি।

কিংবদন্তিতে বলে, এই কূপের ভেতর পুরো একরাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন পদ্মার স্বামী। মৃত্যুর সময় একটা লকেট দিয়েছিলেন শুশ্রূষাকে। বলেছিলেন, যেন আজীবন এর সংরক্ষণ করেন তিনি।

শুশ্রূষা বলেছিলেন তার কন্যাকে, তিনি তার কন্যাকে। এভাবেই মায়ের মুখ থেকে সব জেনেছেন সালেহা বেগম। জেনেছেন–একদিন আরও দুজন মানুষ আসবে। তাদের কাছেও থাকবে এরকম লকেট। সেদিন যেন তাদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়।

তবে ওসব গল্পে বিশ্বাস নেই তার। হাজার বছরে যে এলো না, সে আর কোনোদিন আসবেও না। তাই যখন ছেলের জীবন বাঁচাল উমা, তখন নিজের একমাত্র সম্পদটাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন মেয়েটার গলায়।

একটাও কন্যা সন্তান নেই তার। পুত্রবধূ হলেও চলত। কিন্তু ভাগ্য সেই সুযোগও কেড়ে নিলো তার কাছ থেকে। ঠিক করেছেন, আর কাউকে এই অসম্ভব গাল-গল্প না শুনিয়েই চলে যাবেন দুনিয়া ছেড়ে। সাপ স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকতেই পছন্দ করে। এরকম কূপ খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে।

তবে আজ রাতে আরেকটু হলেই বিশাল বড়ো এক পাপ করে বসেছিলেন তিনি। নিয়তি নামের মেয়ে আর রাফসান নামের ছেলেটার ওপর সন্দেহ হওয়ায়, তাদেরকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন এদিকে। উদ্দেশ্য ছিল, কূপের ভেতর ফেলে দেবেন। কিন্তু না, শুভ বুদ্ধি উদয় হয়েছে ঠিক সময়েই। তাই কাজটা আর করেননি।

চাঁদের দিকে তাকালেন একবার। অসম্ভব পরিষ্কার একটা রাত, চাঁদও উঠেছে তার পূর্ণ আকার নিয়ে। দুই ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে, ভেতরে ঘড়িটা জানাল তাকে। তাই উঠে রওনা দিলেন মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

ধারে-কাছে আসতেই, কানে ভেসে এলো কয়েকটা পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ। চলার গতি কমে গেল তার, আলতো পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। মহিলার নিঃশব্দে চলাফেরা দেখে বিড়ালও লজ্জা পাবে।

ওই, সাকিইব্যা। আচমকা শুনতে পেলেন তিনি। দেখ তো বুড়িরে পাস কিনা। পাইলে আর জিন্দা রাখার দরকার নাই। আর হ্যাঁ, তোর জিনিসটা দিয়া যাইস।

উমার হত্যাকারী দলটা যে তাদের পিছু নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত, তা আর কাউকে বলে দিতে হলো না। ওর পেছনেও যে শিকারি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাও টের পেলেন।

মুচকি হাসি খেলে গেল বৃদ্ধার ঠোঁটে। আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে জানেন না, তার দরকারও হয় না। চাইলে হাতের বর্শা দিয়েও ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারেন ওই শিকারির। কিন্তু বুঝতে পারছেন, এই সময় চাই নীরবে কাজ সারা। তাই ঠিক করলেন, শিকারির শিকারিতে পরিণত হবেন।

ছোকরা যে বনে চলতে একেবারেই দক্ষ না, তা পরিষ্কার টের পাচ্ছেন সালেহা বেগম। ইচ্ছা করেই শুকনো ডালের ওপর পা দিলেন তিনি। আওয়াজটা শুনতে পেল সাকিব নামের ছেলেটা। অস্ত্র উঁচিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। ততক্ষণে সরে গিয়েছেন সালেহা বেগম ওখান থেকে। কিছুটা দূরে এসে আবার শব্দ করলেন।

বোকা ছেলেটা সেই শব্দ অনুসরণ করে এগোতে লাগল, একবারও ভাবল না যে এটা ফাঁদ হতে পারে! অনভিজ্ঞতা আর অস্ত্রের গর্বের মাশুল চুকাতে হলো ওকে শীঘ্রই।

অচিরেই শিকারিকে মৃত্যুকূপের কাছে নিয়ে এলেন সালেহা বেগম। প্রথম-প্রথম আগ্রহ নিয়ে এগিয়েছে ছেলেটা। তাই ফিরে কীভাবে

যাবে, সেই পথ চিনে রাখেনি। এখন বুঝতে পারছে, কী ভুলটা করেছে।

কূপের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সাকিব। ভয়ে কাহিল অবস্থা ওর। বার-বার এদিক-ওদিক করছে অস্ত্রের নল। ওর খুব কাছেই আছেন সালেহা। অপেক্ষা করছেন, কখন পা বাড়াবে ছেলেটা।

কিন্তু না, জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে সাকিব। বেশ অনেকক্ষণ পর, অস্ত্রের নল নিচে নামাল ও। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। হাত তুলে সেটা মোছার প্রয়াস পেল বেচারা।

কাজে নামলেন সালেহা বেগম। সাকিবের অগোচরে চলে এলেন ওর কাছে, তারপর আর কি? একটা ধাক্কা মাত্র। হয়তো শেষ মুহূর্তে তার উপস্থিতি শুনতে পেয়েছিল সাকিব, হয়তো পায়নি। তাতে কিছু যায় আসে না। একটা গুলিও ছুড়তে পারল না সে। তার আগেই সাপের দংশনে জর্জরিত হয়ে গেল ওর শরীর।

একজনের ব্যবস্থা করে আবার মন্দিরের দিকে এগোলেন সালেহা বেগম। জানেন না, এর মাঝেই কী অনর্থ ঘটে গিয়েছে ওখানে।

কাছে এসে দেখেন, নিয়তির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। মেয়েটার গলায় পিস্তল ধরে আছে লোকটা। সামনেই পড়ে আছে রাফসান নামের ছেলেটা। হাতের মুঠোয় ধরে আছে একটা পিস্তল।

কী করবেন, বুঝে পেলেন না সালেহা বেগম। কিন্তু কিছু না করতে পারলে, চোখের সামনে কমপক্ষে একটা মৃত্যুর ঘটনা দেখতে হবে তাকে। হয়তো দুটো!

আচমকা একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। এতে নিজের ওপর যেমন মনোযোগ টানা হবে না। তেমনি হয়তো একটা সুযোগ করে দেওয়া যাবে ছেলেটাকে।

লম্বা করে দম দিলেন তিনি, তারপর হাঁক ছাড়লেন।

গোত্রের সেরা হরবোলা সালেহা বেগম, বাঘের ডাক ডেকে কাঁপিয়ে তুললেন অস্ত্র ধরা লোকটাকে।

*

সুন্দরবনে যে বাঘ থাকে, সেই কথা যেন ভুলে গিয়েছিলেন মেহেদি। এখন মনে পড়ল। চমকে উঠলেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্য নরম হলো নিয়তিকে ধরে রাখা হাতের বাঁধন।

এই একটা মুহূর্তই দরকার ছিল নিয়তির। সামনা-সামনি লড়াইতে পারেনি। তবে আত্মরক্ষার জন্য শেখা পদ্ধতিগুলোয় আসলে শক্তির চেয়ে বেশি দরকার হয় টেকনিক। তাই বিনা দ্বিধায় কাজে নেমে পড়ল সে।

বাঘ-টাঘ পরে দেখা যাবে।

আপাতত মানুষকেই বেশি ভয় হচ্ছে ওর।

ডান হাত দিয়ে ওকে ধরে আছেন মেহেদি। এবার নিজের ডান হাত দিয়ে লোকটার হাতের পাঞ্জা শরীরের সাথে চেপে ধরল ও, সেই সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে মাথা। ওর নড়াচড়া টের পেয়ে নিজেও নড়ে উঠতে শুরু করলেন মেহেদি। কিন্তু সেই সুযোগ দিল না নিয়তি, বাঁ হাতের কনুই ব্যবহার করে অস্ত্র ধরা হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল পেছনে।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় হচকচিয়ে গিয়েছেন মেহেদি, তাল সামলাতে না পেরে ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে। আচমকা চাপ লেগে বেরিয়ে

গেল একটা গুলি। কিন্তু আসমানের দিকে ছুটল সেটা। নিয়তি কনুই দিয়ে আঘাত করেই মোচড় কেটে সরে গিয়েছে নলের সামনে থেকে।

মেশিনের মতো নড়ছে মেয়েটার দেহ। শত-শতবার প্রাকটিস করেছে এই কায়দা। পিস্তলের নল ওর দিক থেকে সরে যেতেই, ঝুঁকি মুক্ত হয়ে গিয়েছে নিয়তি। এবার মেহেদির শরীরটাকে বাইরের দিকে রেখে, আঁকড়ে ধরল পিস্তল ধরা হাতটা। ব্যারেলের ওপর গিয়ে পড়েছে ওর ডান হাত। বাঁ হাতের কনুই পেছন দিকে ছুড়ে দিয়ে আরেকটা মোক্ষম আঘাত হানল লোকটার কানে। অস্ফুট আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, জায়গামতো লেগেছে আঘাতটা।

এরপর হ্যাঁচকা এক টানে ছিনিয়ে নিলো অস্ত্র।

এক মুহূর্তও নষ্ট না করে মেহেদির হাঁটু লক্ষ্য করে টিপে দিল ট্রিগার।

পায়ে গুলির আঘাত নিয়ে কোঁকাতে লাগল লোকটা।

পরক্ষণেই ছুটে এলো ও রাফসানের পাশে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হতে শুরু করেছে যুবক। মৃদু হাসল কেবল। ‘দুশ্চিন্তা করো না। আমি আরও কিছুক্ষণ বাঁচব।’ বলল ও। ‘শরীরের ডান দিকে ঢুকেছে গুলি। লিভার স্পর্শ করতে পারেনি। বেরও হয়ে গিয়েছে।’ বলে আবার হাসার প্রয়াস পেল।

একটানে রাফসানের শার্ট ছিঁড়ে ফেলল নিয়তি, ওটাকে দলা-পাকিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল রাফসানের পেটের সাথে। ‘একটু দাঁড়াও,’ বলে ছুটে গেল শিকদারের কাছে। লোকটার পকেট থেকে বের করে আনল স্পিডবোটের চাবি।

ততক্ষণে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন সালেহা বেগম। পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন মেহেদির মাথার কাছে। মহিলার পাশে এসে

দাঁড়াল নিয়তি। 'বাঘ–' ও বলতে শুরু করতেই থামিয়ে দিলেন মহিলা।

'বাঘ-টাঘ কিচ্ছু না। আমিই ডাকছি।' জানালেন তিনি।

আর কিছু বলল না নিয়তি।

ওকে পাশে রেখে, রাফসানের কাছে চলে গেলেন সালেহা বেগম। ক্ষতটা দেখে বললেন, 'এরে জলদি ডাক্তারের কাছে নিতে অইব। নইলে বাঁচব না।'

দিশেহারা বোধ করছে নিয়তি। যাকে ভালোবাসে, তার প্রাণ বাঁচাতে হলে এখনই রওনা দেওয়া দরকার। এদিকে আবার মেহেদি নামের এই নরপিশাচটাকে রেখে যাওয়াও সম্ভব না। নইলে আজীবন তাড়িয়ে বেড়াবে ওদেরকে।

আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, পড়ে থাকা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে তুলে ধরল অস্ত্র।

'নাহ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রাফসান। 'ওকে খুন করো না, নিয়তি। মানুষের জীবন নেওয়া যে কতটা ভয়ংকর ব্যাপার তা তুমি জানো না। অনুরোধ করছি তোমার কাছে, মিনতি করছি–কাজটা করো না।'

মেহেদির চেহারার দিকে তাকাল নিয়তি। এই লোকটা ওদেরকে স্কুলে নিয়ে যেত, নিয়ে আসত। অনেক আবদার শুনেছে, আপন চাচার মতোই লোকটাকে দেখত ওরা। তারচেয়ে বড়ো কথা, রাফসানের যে অবস্থা তাতে ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে নিয়তিকে। এর প্রতি নজর রাখার সময় মিলবে না। শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল।

এদিকে এক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মেহেদি। তার চোয়াল শক্ত হয়ে যাওয়াটা নজর এড়াল না লোকটার। মৃদু হাসলেন তিনি। মুখ খুললেন, 'অহিংশের জয়–'

গর্জে ওঠা পিস্তল তাকে কথাটুকু শেষ করতে দিল না।

সাত

রাফসানের জ্ঞান ফিরল খুলনা মেডিকেল কলেজের কেবিনে।

এখানে কীভাবে এসেছে, তা জানা নেই ওর। জানে না, মেহেদিকে হত্যা করার পর, দ্রুত নৌকা নিয়ে উরগ গ্রামে ফিরে এসেছিল নিয়তি। শেষ উপায় দেখে সঙ্গে করে আনা ফল তরল করে খাওয়ানো হয়েছে ওকে। গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল লকেট। সালেহা বেগম চোখ ছোটো করে দেখেছেন দৃশ্যগুলো, কিছু বলেননি।

কপাল ভালো ওর, লঞ্চের একজন স্পিডবোট চালাতে জানত। তাকে সাথে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন সালেহা বেগম। স্পিডবোট সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেই সাথে তুলে এনেছেন আরও কিছু ফল। ওগুলোকে সঙ্গে-সঙ্গে জুস বানিয়ে, রাফসানকে নিয়ে রওনা দিয়েছে নিয়তি।

ডাক্তাররা প্রথম কিছুক্ষণ গাইগুই করছিলেন, পুলিশ কেস বলে হাত দিতে চাননি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া। উপন্যাস বা সিনেমায় দেখা যায়, গুলির কেস হোক বা বিষের, রোগী আসামাত্র সে ঢুকে যায় অপারেশন থিয়েটারে। কিন্তু তা কি আর বাস্তবে হয়? পুলিশকে না জানানো পর্যন্ত রোগীর দেহে হাত পর্যন্ত লাগানোর অনুমতি নেই ডাক্তারদের।

জান বাঁচাবার জন্যও না।

তবে নিয়তি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে এসেছে। খুলনায় নামা মাত্র ফোন করেছে সৈয়দ মারুফকে। তার নির্দেশ পেয়ে প্রায় সাথে-সাথেই এসে উপস্থিত হয়েছে স্থানীয় ওসি।

এসব কিছুই জানে না রাফসান। জানে না, জমে-মানুষে টানাটানি হয়েছে তিন দিন ওকে নিয়ে। ডাক্তাররা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, এমনভাবে গুলি খাওয়ার প্রায় একদিন পরও কীভাবে বেঁচে থাকে মানুষ?

কারণটা অবশ্য আন্দাজ করতে পারছে নিয়তি।

এই তিনটা দিন এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে যায়নি সে রাফসানের পাশ। নির্ঘুম তিনটা রাত কাটিয়েছে। রাফসানের মা-ও এসেছেন। কিন্তু তাকে কিছুই করতে দেয়নি মেয়েটা। সব কিছু একা হাতে সামলেছে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমে হাসপাতালের একদা সাদা ছাদ নজরে এলো রাফসানের। একটু নড়ে উঠতেই হা-হা করে ছুটে এলেন ওর মা, সেই সঙ্গে নিয়তিও। মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রাফসান, কিন্তু নিয়তিকে দেখে মিলিয়ে গেল সেই হাসি।

ওর মা অবশ্য এতকিছু খেয়াল করেননি। তিনি বারবার নিয়তির প্রশংসা করেই চলছেন। ‘এমন ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি...’ তার কথা কানে ঢুকছে না রাফসানের।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন মা থামলেন, তখন রাফসান বলল, ‘আমার নিয়তির সঙ্গে কিছু কথা আছে। কী হলো শেষ পর্যন্ত, তা জানাই হলো না।’ মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। ‘একটু বাইরে যাবে? রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, বোঝই তো?’

খ্যাপে গেলেন মিসেস রোখসানা। ‘অনেক হয়েছে রাষ্ট্রীয় কাজ। এই শেষ। আমার জান থাকতে তোকে আর এসবে জড়াতে দেব না।’ বললেন বটে, কিন্তু বেরিয়ে গেলেন ঠিকই।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল নিয়তি, কথা বলছে না কোনো। কথা বলছে না রাফসানও।

মিনিট দুয়েক পর, একসঙ্গে মুখ খুলল দুইজনেই। হেসে ফেলল নিয়তি। 'তুমিই আগে বলো।'

রাফসানের মুখে অবশ্য হাসি নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল সে, 'আমার জীবন রক্ষার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিস নিয়তি। অনেক করলেন আমার জন্য, আর দরকার নেই।'

থমকে গেল বেচারি। 'কী হয়েছে রাফসান? তুমি এমনভাবে কথা বলছ কেন?'

'কী হয়েছে?' আরেকটু হলেই চ্যাঁচিয়ে উঠত রাফসান। 'তুমি ঠান্ডা মাথায় একজনের জীবন নিয়েছ। নিরস্ত্র এক মানুষের জীবন।' আদনানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। চোখ দিয়ে দর দর করে পড়তে শুরু করল পানি। 'কেউ যদি তোমাকে খুন করতে আসে, আত্মরক্ষার্থে নাহয়...কিন্তু নিরস্ত্র একজন মানুষকে তুমি খুন করলে কীভাবে?'

স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিয়তি। 'কীভাবে...কীভাবে এই প্রশ্নটা করতে পারলে তুমি? মেহেদি যখন কথা বলছিল, তুমি কি তখন ওখানে ছিলে না? নিজের কানে শোননি লোকটার কথা-বার্তা?'

'সব শুনেছি,' মানল রাফসান। 'যদি ধস্তাধস্তির সময় গুলি লেগে মারা যেত লোকটা, তাহলেও আমার আপত্তি ছিল না। আমি কি নিজেই শিকদারকে হত্যা করিনি?' একদৃষ্টিতে নিয়তির দিকে তাকাল ও। 'কিন্তু তুমি কী করেছ? আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছ। সিনেমার ডায়লগ শোনাচ্ছে? শোনাতে পারে, কিন্তু এটাই সত্যি। এমনকী বাংলাদেশের আইনও তোমাকে ঠান্ডা মাথার এই হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে। জানো সেটা?'

‘তাহলে আর সমস্যা কোথায়?’ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল নিয়তি। ‘ধরিয়ে দাও আমাকে পুলিশের হাতে। মুক্তি পাও তুমি।’

চুপ করে রইল রাফসান। অনেকক্ষণ পর বলল, ‘একটা অনুরোধ রাখবে?’

‘রাখব,’ বলে দরজার দিকে চলে গেল নিয়তি। বাইরে এক পা রেখে ফিরে তাকাল ভেতরে, বলল, ‘এটাই তো চাইছিলে, তাই না?’

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে চলে গেল সে!

*

খুলনা মেডিকেল থেকে ঢাকার একটা স্বনামধন্য হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয়েছে রাফসানকে। ও ঢাকা মেডিকেলেই থাকতে চাইছিল। কিন্তু বাসা থেকে দূরে আর প্রতিদিন মা-এর যাওয়া-আসায় কষ্ট হবে ভেবে, কাছের একটা বেসরকারিতে শিফট করেছে।

দিন পনেরো থাকতে হলো ওকে হাসপাতালে। প্রায় প্রতিদিনই আসেন সৈয়দ মারুফ। তার মুখ থেকেই শুনতে পেল–উমা চক্রবর্তীর আবিষ্কারের কথা শুনে চমকে উঠেছে সারা বিশ্ব। কিন্তু আফসোসের কথা, ওর রিসার্চ ডকুমেন্টটা কোথাও পাওয়া যায়নি। অহিংশ নামের যে সংগঠনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে রাফসানরা, তার হাত অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্মেলনের আহ্বায়ক, জ্যাক ক্লেমেন্সকে হত্যা করেছে কে বা কারা! একমাত্র তার কাছেই থাকলে থাকতে পারত উমার রিসার্চ পেপার। তার কম্পিউটার আর ল্যাপটপ সাথে করে নিয়ে গিয়েছে হত্যাকারীরা। তাই সেদিক থেকেও কোনো তথ্য মেলেনি। পাওয়া যায়নি বিশেষভাবে বানানো ওই দেবী মূর্তিও। এখন

সারা বিশ্বে আম্বাইহেক্সিয়াম বলতে ওই লকেট। জিনিসটা অবশ্য আগেই সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে রাফসান, যেদিন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সেদিনই। কেন ওটা গলায় ঝুলছিল, সেটাও জানে না।

চুপচাপ সব শুনেছে রাফসান। মন্তব্য করেনি কোনো। নিয়তির ওই ট্রিগার চেপে ধরার দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে ওর। নিজেকে বারবার বোঝাতে চায়, যা করেছে তা ঠিকই করেছে মেয়েটা। বোঝেও, কিন্তু কেন যেন মানাতে পারে না কিছুতেই।

সুস্থ হবার এক সপ্তাহ পর, হঠাৎ ওকে ফোন করলেন প্রীতম চক্রবর্তী। জানালেন, সুখবর আছে কিছু। ব্যক্তিগতভাবে ওকে জানাতে চান। তাই দেখা করার অনুরোধ করলেন।

একবার ভেবেছিল, না করে দেবে। জীবনের ওই অধ্যায়কে আর মনে করতে চায় না ও। তারপর কী ভেবে মেনে নিলো।

দুপুরের দিকে শাকসব্জী দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে, বিশ্রাম নিলো কিছুক্ষণ। আজকাল কী যেন হয়েছে ওর, মাংসের গন্ধ পেলেই গা গুলিয়ে আসতে চায়। বিকালের দিকে উঠে, রওনা দিল প্রীতম চক্রবর্তীর বাড়ির দিকে।

*

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর অফিস ঘরে বসে আছে রাফসান। আজ অবশ্য ডেস্কের এপাশে বসে আছে ও। ওপাশে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন প্রীতম চক্রবর্তী।

ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে, ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। চোখের নিচে বসে গিয়েছে কালি। মুখে হাসি নেই একটুও।

'দেখ,' কুশলাদি বিনিময় হয়েছে আগেই। এখন কাজের কথায় এসেছেন তিনি। 'উমার আবিষ্কারটা যে যুগান্তকারী ছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোটোছোটো কয়েক জিনিস মিস করে গিয়েছে ও।'

'দেখুন, স্যার,' বলে উঠল রাফসান। 'আমি আসলে এই ব্যাপারে–'

'পুরোটা শোনই না আগে।' ওকে থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। মায়া হওয়ায়, আর বাধা দিল না রাফসান। 'ওর ওই নিমা ভাইরাসের ব্যাপারে ভুল করেছিল উমা। নিজের দেহ থেকে ভাইরাস নিয়ে সেগুলোর কালচার করেছিল ও। যেহেতু ও নিজে ছিল ক্যান্সারে আক্রান্ত, তাই ওর দেহের ভাইরাসগুলোর মিউটেশনও হয়েছিল সেভাবে। শুধু ক্যান্সারের বিরুদ্ধেই কাজে লেগেছিল ওগুলো। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা প্রমাণ করে যে...'

'আমার ব্যাপার মানে?' অবাক না হয়ে পারল না রাফসান।

'তুমি জানো না?' এবার অবাক হবার পালা প্রীতম চক্রবর্তীর। 'তুমি যখন গুলি খেলে পেটে, তখন জবাই করা পশুর মতো রক্তপাত হচ্ছিল ক্ষত থেকে। মন্দির থেকে আনা ফল খাওয়ানো হয়েছিল তোমাকে। সম্ভবত সেজন্যই এতটা সময় পর অপারেশন হওয়া সত্ত্বেও বেঁচে গিয়েছিলে তুমি।'

চুপ করে রইল রাফসান, নিয়তি ওর জীবন বাঁচিয়েছে–জানত ও। কিন্তু ভেবেছিল, সেটা কেবল হাসপাতালে নিয়ে আসার মাঝেই সীমাবদ্ধ। সরাসরিই যে বাঁচিয়েছে, তা কল্পনাও করেনি।

'তা তোমার ক্ষেত্রে যেহেতু সমস্যা ছিল ভিন্ন, তাই ফলও এসেছে ভিন্ন। তোমার দেহের অভ্যন্তরে যেসব ক্ষত হয়েছিল, সেগুলো মেরামত করেছে নিমা।' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে যোগ করলেন। 'তাই আমাদের, মানে আমার আর নিয়তির ধারণা, ভাইরাসগুলো আসলে

স্টেম-সেল হিসেবে কাজ করে! নিদেনপক্ষে তাদের প্রভাবে শরীরের অন্য কোষগুলো স্টেম-সেলে পরিণত হয়।’

হতবাক হয়ে গেল রাফসান। যদি ধারণা সত্যি হয়, তাহলে যুগান্তকারী এক আবিষ্কার হতে যাচ্ছে এটা। স্টেম-সেলের খোঁজে পাগলের মতো গবেষণা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ওটা আবিষ্কার হলে, মানুষকে আর ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে হবে না। যকৃত পচে মারা যাবে না কেউ; হার্ট-ফেইলর, কিডনি রোগ, প্যারালাইসিস–এগুলোতেও আক্রান্ত হতে হবে না। শুধু তাই না, স্টেম-সেলকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে, শরীরের অঙ্গ হারানো লোকগুলোকেও ফিরিয়ে দেওয়া যাবে সেগুলো।

‘কিন্তু আমাদের তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য দরকার আরও গবেষণার।’ দম ফেললেন প্রীতম। ‘এদিকে আম্বাইহেক্সিয়াম আছে শুধু সরকারের হাতে। যতদূর জানি, বহির্বিশ্ব থেকেও চাপ আসছে খুব–ওদের হাতে ওটাকে তুলে দেবার জন্য। তাই যা করার দ্রুত করতে হবে আমাদেরকে। নতুন একটা প্রতিষ্ঠান খুলেছি আমি। তোমাকে আর নিয়তিকে সঙ্গে নিয়ে সেটার শেয়ার হোল্ডার আমি। ফান্ডিং আমিই জোগাড় করব। মাল্টিন্যাশনাল কয়েকটা কোম্পানির সঙ্গে কথাও হয়েছে।’ বলে একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন তিনি। ‘তবে কাজ যা করার তোমাকে আর নিয়তিকেই করতে হবে। বুঝতেই পারছ, কত বড়ো ব্যাপার হতে যাচ্ছে এটা।’ মিনতি ঝরে পড়ল বৃদ্ধের কণ্ঠ দিয়ে। ‘না কোরো না।’

মাথা নিচু করে রইল রাফসান। না করতে চাইছে, কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। নতুন জানা এই তথ্যটা ধাক্কা দিয়েছে ওকে।

‘এক কাজ করি,’ বললেন প্রীতম। ‘নিয়তিকে ডেকে আনি, ওকেও আসতে বলেছি। তোমরা কথা বলো।’ রাফসানকে কোনো সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আচমকা সিগারেটের প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়ে বসল যুবকের। ছেড়েই দিয়েছিল আগে, আবার নতুন করে ধরেছে। কিন্তু কেন যেন কয়েকদিন হলো স্বাদ পাচ্ছে না ধোঁয়ার। মুচকি হাসল সে। শাকসব্জী খাবার আগ্রহের কারণ আন্দাজ করতে পারছে ও। সেই সাথে সিগারেটের অকস্মাৎ এই স্বাদ হারিয়ে ফেলার কারণটাও।

হাতে ধরা ফাইলটার দিকে তাকাল একবার। বলিহারি নাম দিয়েছেন প্রীতম চক্রবর্তী তার প্রতিষ্ঠানের–Advanced Human Intelligence and Sagacity, মানুষকে বুদ্ধিমত্তা আর প্রজ্ঞার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিষ্ঠান।

হাহ, মানুষের আবার প্রজ্ঞা। আপনমনে ভাবল ও। মনের মধ্যে কিছু একটা খচখচ করতে শুরু করেছে ওর। সিগারেট আর না ধরালেই না।

কিন্তু বাইরে যাবে? সেটাও যে ইচ্ছা করছে না। প্রথম-প্রথম বাপের ভয়ে যেভাবে লুকিয়ে বাথরুমে গিয়ে খেত সিগারেট, সেটাই করবে বলে ঠিক করল। বয়স্ক মানুষ প্রীতম চক্রবর্তী। তার সামনে তো আর সিগারেট ফোঁকা যায় না!

অফিস ঘর, মাঝে-মাঝেই এখানে লম্বা সময় কাটান প্রীতম চক্রবর্তী। তাই এখানে একটা টয়লেট না থেকে যায়ই না।

উঠে দাঁড়িয়ে খুঁজতে শুরু করল ও। ওই যে, ঘরের এক কোনায় একটা দরজা দেখে যাচ্ছে। ওটাই হবে ভেবে এগিয়ে গেল সেদিকে।

দরজার সামনে এসে ঠেলা দিল যুবক। কিন্তু না, বন্ধ ওটা। হাতল ধরে ঘোরাল একবার। নাহ, তা-ও খুলছে না। আচমকা উলটোপাশে নজর পড়ল ওর। আরেকটা দরজা। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। ভুল বুঝতে পেরে হাসল রাফসান। পূজার ঘর যে এখানে

আছে একটা, সেটা ভুলেই গিয়েছিল। বন্ধ ঘরটা নিশ্চয়ই পূজার ঘরই হবে।

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে কী যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। পকেট থেকে প্যাড আর কলম বের করে নামটা লিখল আবার–Advanced Human Intelligence and Sagacity.

অনেকক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে রইল রাফসান। তারপর কী মনে করে ইনিশিয়ালগুলো লিখল কেবল।

A.H.I.S.

আচমকা বুঝতে পারল, কেন নামটা বিরক্ত করছিল ওকে। ওদের প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানের, সেটার নামও A.H.I. সম্ভবত এজন্যই পরিচিত মনে হচ্ছিল নামটা।

পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে যাবে প্যাডটা, এমন সময় উমা হত্যাকাণ্ডের প্রথম সন্দেহভাজন, নেকটার অ্যান্ড সালভের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওদের ইনিশিয়াল লিখল নিচে।

N.S.A.

কাঁপা কাঁপা হাতে যোগ করল দুইটা ইনিশিয়াল।

A.H.I.N.S.A.

অহিংশ!

কাঁপতে শুরু করল ওর হাত। নিজেকেই বোঝাতে চাইল–প্যারানয়া পেয়ে বসেছে ওকে। আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে শুরু করেছে। কে জানে, এটা হয়তো নিমা ভাইরাসের সাইড-ইফেক্ট।

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করল বেচারা। নতুন একটা জিনিস বারবার খোঁচাচ্ছে ওকে। নেকটার অ্যান্ড সালভের অদ্ভুত ইনিশিয়াল। সালভ অক্ষরের প্রথম দুটো অক্ষর– S আর A ব্যবহার করেছে ওরা।

Advanced Human Intelligence and Sagacity.

প্রতিষ্ঠানের নামটা আবারও দেখল রাফসান। আবারও কাঁপতে শুরু করল ওর হাত। এই নামের শেষের শব্দটার দিকে বারবার নজর যাচ্ছে ওর। সাগাসিটির প্রথম দুই অক্ষরও তাই–এস আর এ।

সাথে-সাথে তার আগের অক্ষরের দিকেও নজর গেল ওর। নতুনভাবে লিখল নামটাকে। তারপর আবার ইনিশিয়াল বানাল।

Advanced Human INtelligence and SAgacity.

A.H.I.N.S.A.

অসম্ভব। এ হতেই পারে না। ভুল হচ্ছে আমার, নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে।

ছিটকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো বেচারা। ডেস্কের দিকে এগোবে, এমন সময় নতুন এক সন্দেহ জাগল মনে। শক্ত করে ঘোরাল ও বিপরীত দিকের দরজার হাতল।

কাজ হলো এবার, খুলে গেল দরজাটা।

ভেতরে উঁকি দিল রাফসান।

সঙ্গে-সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল সব।

কেন পাওয়া যায়নি উমার রিসার্চ...

কেন ডায়েরিতে নাম লেখেনি মেয়েটা...

কেন সেই কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল মেহেদি...

...সব।

পকেট থেকে মোবাইল বের করল রাফসান। একটা বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করল।

*

প্রীতম চক্রবর্তী যখন ফিরে এলেন নিয়তিকে সাথে নিয়ে, তখন চেয়ারে ফিরে চুপচাপ বসে রয়েছে রাফসান। উত্তেজনা দাবিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। বারবার পা নাচাচ্ছে।

নিয়তিকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে একবার চাইল কেবল। তারপরই মন দিল প্রীতমের দিকে। 'স্যার, কোন কোম্পানি যেন ফাইন্যান্স করবে বললেন?'

আচমকা প্রশ্নে একটু আশ্চর্যই হলেন প্রখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট। 'আমেরিকান একটা কোম্পানি।'

'নেকটার অ্যান্ড সালভ না তো?'

'নাহ, কিন্তু হলেই বা সমস্যা কী?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ওরা তো রিসার্চ ডোনেশন দিচ্ছে। আমাদের ফাইন্ডিংস তো প্রকাশ করব জনসম্মুখে। কাউকেই একচেটিয়া ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না!'

'ল্যাবের লোকেশন হবে কোথায়?' আবার প্রশ্ন করল রাফসান।

'ডাল যেটা এনেছ, সেটা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারিনি।' জবাব দিলেন প্রীতম। 'তাই সুন্দরবনেই একটা ল্যাব স্থাপনা করা হবে।'

'এতদিন পরেও কী গাছটা ঠিক আছে?'

‘এটাই তো আসল কথা। প্রায় মরমর অবস্থা ওটার। কিন্তু এখনও টিকে আছে। এইজন্যই তো তাড়াহুড়ো এত। এবার তুমি রাজি হলেই হয়।’

আচমকা দরজা বাড়ি খাবার আওয়াজ হলো পেছন থেকে। চমকে গিয়ে সেদিকে তাকাল রাফসান। পূজার ঘরের দরজা বেখেয়ালে খোলাই রেখে এসেছিল। বাতাসের ঝাপটায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওটা।

সরাসরি প্রীতমের চোখে চোখ রাখল রাফসান। ধরা পড়ে গেলাম নাকি? ভাবল ও।

ক্লান্ত হাসি হাসলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। ডেস্কের নিচে ছিল হাত এবার সেটা ওপরে নিয়ে আসলেন। ডান হাতে শোভা পাচ্ছে একটা পয়েন্ট থার্টি এইট।

হতবাক হয়ে গেল নিয়তি। বলে উঠল, ‘আংকেল...এসব কী?’

উত্তরটা দিয়ে দিল রাফসান। ‘নিয়তি, বাংলাদেশে অহিংশের প্রধানের সঙ্গে পরিচিত হও।’

*

স্তম্ভিত হয়ে গেল নিয়তি। ‘আঙ্কেল? কথাটা সত্যি।’

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝালেন প্রীতম। ‘কীভাবে বুঝলে? মূর্তি দেখে?’ রাফসানের কাছে জানতে চাইলেন তিনি।

‘না,’ জানালো রাফসান। ‘আপনি প্রতিষ্ঠানের যে নাম দিয়েছেন, সেটার ইনিশিয়ালে একটু কারুকাজ করতেই তা অহিংশ হয়ে গেল।

তারপরও সন্দেহ করিনি। ভেবেছিলাম, আমারই ভুল হচ্ছে। কিন্তু পূজার ঘরটা খোলার পর...'

'হুম,' মাথা নাড়লেন প্রীতম। 'ভুলই হয়েছে আমার। ওঘরে আমি ছাড়া কেউ যায় না। তাই ভেবেছিলাম...কিন্তু ওটা যে মা মনসার মূর্তি না, উমার আনা মূর্তি–তা কীভাবে বুঝলে?'

'নকল মূর্তিটা মন্দিরে রেখে এসেছিল উমা।' বলল রাফসান। 'সেটা দেখে বুঝেছি।'

'নকল মূর্তি?' অবাক দেখাল প্রীতমকে। 'কোন নকল মূর্তি?'

উমার বুদ্ধিমত্তায় আরেকবার চমৎকৃত হলো রাফসান। বলল, 'আপনার মেয়ে প্রথমবার নিয়ে এসেছিল নকল এক মূর্তি। পরেরবার সেটাকে মন্দিরে রেখে, আসল মূর্তি নিয়ে আসে। আমার ধারণা, আপনাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল সে। তাই এই কাজ। এখন বুঝতে পারছি, কেন ডায়েরিতে আপনার নাম লেখেনি মেয়েটা। ভেবেছিল, যদি আপনাকে ফেরাতে পারে? ডকুমেন্টেশনের ক্ষমতা সম্পর্কে ভালোমতোই জানে উমা। তাই কোথাও আপনার নাম লিখতে চায়নি। আর আমি ধরে নিয়েছিলাম, সে কিনা মেহেদিকে রক্ষা করতে চাইছে! এখন যখন সেই একই মূর্তি আপনার পূজার ঘরে দেখতে পেলাম, আর সন্দেহ রইল না। কে আর ভাবতে যাবে–যেখান থেকে চুরি হয়েছে, সেখানকারই কোথাও লুকিয়ে আছে চোরাই মাল?'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রীতম। 'যখন জানতে পারি, আমার একমাত্র মেয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত, আমার দুনিয়া পুরো ধসে পড়েছিল, বুঝলে? চিকিৎসা, পরীক্ষা, সাধু, পীর, বাবা–কিছুই বাদ দেইনি। স্ত্রীকে তো হারিয়েছিলাম আগেই। মেয়েকেও হারাতে হবে, তা ভাবতেও পারিনি। তখন দৃশ্যপটে আগমন হলো বাবা

পরমেশ্বর, এবং তার হাত ধরে অহিংশের। জানতে পারলাম, সংস্থাটার ফাউন্ডিং ফাদারের বংশধর আমি! সরাসরি তার বংশধর!’

অবাক হয়ে গেল রাফসান, এ কথা ওর মাথাতেও আসেনি।

‘আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখিয়ে আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিল ওরা, সেই সঙ্গে পুরোপুরি হাত করে নিলো আমাকে। উমাটাও এমন, এত বড়ো আবিষ্কারের স্বরূপ কখনওই আমাকে বলেনি। শুধু জানতাম, নতুন এক আবিষ্কার করেছে ও, যা ক্যান্সার নিরাময়ে কাজে লাগবে, সেই সঙ্গে ওটাকে ব্যবহার করে বানানো যাবে ভয়ংকর এক মারণাস্ত্রও। ফাউন্ডিং ফাদারের বংশধর হলেও, অহিংশ পুরোপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে। পাঁচ সদস্যের সুপ্রিম কমিটি। আমিও তার সদস্য। পাঁচটি দেশে বসে চালায় তারা সংগঠন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো, যেভাবেই হোক এই আবিষ্কার হাতে আনতে হবে।

‘অহিংশ ততদিনে আমার জান-প্রাণ হয়ে গিয়েছে। আমি জানি না, উমা রোগমুক্ত না হলে কীভাবে আমাকে দলে টানত। হয়তো অন্য কোনো উপায় ব্যবহার করত তখন। কিন্তু জানোই তো, উপাস্যের মাঝে উপাসক খামতি খুঁজে পায় না। বাবা পরমেশ্বর আমার উপাস্যের কাছে পৌঁছাবার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালেন। তার নির্দেশকে আমি মহান প্রভুর নির্দেশ ভেবেই মান্য করতাম।’

‘আর সেজন্য, নিজের মেয়েকেও খুন করে ফেললেন?’ তীব্র শ্লেষ ঝরে পড়ল নিয়তির কণ্ঠ থেকে।

‘না, না। উমাকে হত্যার নির্দেশ আমি দেইনি। সুপ্রিম কাউন্সিল থেকে এসেছিল। অহিংশ যেনতেন সংগঠন না। বাংলাদেশ, ভারত, দুবাইসহ বিশ্বের অনেকগুলো আন্ডারওয়ার্ল্ড তাদের দখলে। যেখানে অপরাধ জগতের দখল নিতে পারেনি, সেখানে সরকারের উচ্চপদে রেখে দিয়েছে নিজের এজেন্ট। আমি তো উমাকে নিরাপদেই রাখতে

চেয়েছিলাম। তাই ও ফিরে আসবে, এটা নিশ্চিত করার জন্য সঙ্গের মূর্তিটাকে আমার কাছে রেখে দেবার জন্য বাধ্য করেছিলাম। এমনকী ওর কাজ যেন বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য আমার লকেটটা পুঁতে এসেছি গাছের নিচে!'

'আপনার লকেট মানে?'

'সত্যিকার অর্থে আম্বাইহেক্সিয়ামের লকেট আছে মোট তিনটি।' ব্যাখ্যা করলেন প্রীতম চক্রবর্তী। 'আমার আদি পিতার ছিল তিন সন্তান। একজন মেয়ে, তারই বংশধর হচ্ছেন এই সালেহা নামের মেয়েটি। একজন আমি, আরেকজন কে জানা নেই। সম্ভবত বেঁচেও নেই সেই বংশ। একমাত্র আমাদের তিনজনের কাছেই আছে আম্বাইহেক্সিয়ামের তৈরি লকেট। আমার লকেটটা যে সেই জিনিস, তা নিজেও জানতাম না। উমার গলার লকেট দেখেও বুঝতে পারিনি। কিন্তু নিয়তির কাছে যখন তোমাদের সব ঘটনা জানতে পারলাম, তখন বুঝেছি। এরপর আর দেরি করিনি।'

'উমাকে জেনেভা যেতে বাধা দেননি কেন?' প্রশ্ন করল রাফসান।

'লাভ কী? অহিংশের তো ট্রিটমেন্ট নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ওদের মাথাব্যথা মারণাস্ত্রটার দিকে।'

'খুনের ব্যাপারে বলুন। খুব তো মেয়ে মেয়ে করতেন, তা একমাত্র মেয়েকে খুন করতে হাত কাঁপল না?' আবারও প্রশ্ন করল নিয়তি।

'বললাম তো, আমি খুন করিনি।' জবাব দিলেন প্রীতম। 'এমনকী জানতামও না যে ওকে খুন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মেহেদির সঙ্গেও যে ওরা যোগাযোগ করেছিল, তা জানতে পারি খুনের পর। ওই ভণ্ড পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। বুঝতেই তো পারছ,' রাফসানের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমাদের নিরাপত্তা সংস্থা এ.এইচ.আই. এবং নেকটার অ্যান্ড সালভ, দুটোই আসলে অহিংশের।

ওখান থেকেই নাকি বেছে নেওয়া হয়েছিল ওই সিকিউরিটি গার্ডকে। আগেও নাকি এমন কার্ড নিয়ে বাড়িতে চলে যেত ছেলেটা। নেকটার অ্যান্ড সালভকে ব্যবহার করে চেষ্টা করেছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফর্মুলাটা নেবার। কিন্তু উমাকে কেউ মানাতে পারেনি। এমনকী আমিও না।'

'সেজন্য খুন করে ফেললেন?' এবার রাগ দেখা গেল রাফসানের কণ্ঠে। 'প্রত্যেক গল্পের প্রত্যেক খলনায়কই দাবি করে, তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আসলে তারও একটা গল্প আছে, যে গল্পে সে খলনায়ক না! সে-ই প্রধান নায়ক। আপনিও তো তাই করছেন! নিজের মেয়ের ওপরে স্থান দিয়েছেন ধর্মকে! কেন? আপনি পারতেন না উমার মৃত্যুর পর সবকিছু কর্তৃপক্ষকে জানাতে? পারতেন না, মূর্তিটাকে নিয়ে গিয়ে মেহেদিকে ধরিয়ে দিতে? নিয়তির মাকে তাহলে আর মরতে হতো না, বেঁচে থাকত শিহান। কেন গেলেন না আপনি?'

মাথা নিচু করে বসে রইলেন প্রীতম চক্রবর্তী। রা নেই তার মুখে।

'পিস্তল বের করেছেন তো কাজটা সেরেই ফেলুন,' কথা শেষ হয়নি রাফসানের। 'আরও দুজনকে হত্যা করতে নিশ্চয়ই আপনার হাত কাঁপবে না? তবে শুনে রাখুন, রেহাই পাবেন না আপনি।' দূর থেকে ভেসে আসছে পুলিশের সাইরেন। 'শুনতে পাচ্ছেন? আমি আগেই পুলিশকে ফোন করে দিয়েছি। ওরা আসছে আপনাকে নেওয়ার জন্য।' চেয়ারে হেলান দিল ও। 'চালান গুলি, শেষ করে দিন আমাদের দুইজনকে। কথা দিচ্ছি, বাধা দেবার চেষ্টা করব না।'

বেশ কিছুক্ষণ পর নিয়তির দিকে তাকালেন প্রীতম। অঝোর ধারায় কাঁদছে মেয়েটা। 'নিয়তি, মা-রে...' কিছু একটা বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নিলো মেয়েটা।

'যাও,' অবশেষে রাফসানকে বললেন তিনি। 'ওকে নিয়ে চলে যাও। জানি না বিশ্বাস করবে কিনা, তবে বলি–আমি চেয়েছিলাম মেহেদিকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু আমাকে সাবধান করে জানানো হলো–কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নিলে, নরক নামিয়ে আনবে তারা বাংলাদেশে। যেদিন মারণাস্ত্র হাতে পাবে, সেদিন পরীক্ষা করার জন্য বেছে নেবে বাংলাদেশকেই।'

উঠে দাঁড়াল রাফসান। শক্ত হয়ে গিয়েছে ওর মুখ। 'যে দেশ নয়মাস প্রায় খালি হাতে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে, যে দেশের উন্নতির হার তাকে দাবিয়ে রাখা দেশটার চাইতেও বেশি, যে দেশ স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে আছে প্রতিবেশী বিশালাকার দেশের চেয়ে... যে দেশ জন্ম দিয়েছে উমার মতো বিজ্ঞানী আর প্রীতম চক্রবর্তীর মতো ফার্মাকোলজিস্ট, সেই দেশ একটা সংস্থার সামনে হার মানবে? যা-ই বলুন না কেন, স্যার। আপনার যে অপরাধ, সে অপরাধ মাফ হবার মতো নয়।' একটু থেমে যোগ করল যুবক। 'ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, স্যার। এমনকী আপনিও বলবেন–আপনার গল্পের খলনায়কও আপনিই।'

নিয়তির হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাফসান।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে, এমন সময় কান ফাটানো পিস্তলের শব্দে কেঁপে উঠল নিয়তি।

পরিশিষ্ট

হঠাৎ কলিংবেলের শব্দে চমকে উঠল রাফসান। দরজা খুলে দেখতে পেল নিয়তিকে। বর্ষণ মুখর এই সন্ধ্যায় যে মনে-মনে মেয়েটিকেই চাইছিল ও, তা তো অন্যজনের জানার কথা নয়! তাহলে? অনেক ভেবেছে রাফসান। বুঝতে পেরেছে–যা করেছে নিয়তি, তা পরিস্থিতির শিকার হয়েছে বলেই করেছে। ওই মুহূর্তে রাফসানকে বাঁচাবার জন্য আর কিছু করার সুযোগ ছিল না মেয়েটার সামনে। আহত ওকে সামলে আবার বিপজ্জনক মেহেদির ওপর নজর রাখা–এক কথায় অসম্ভব। এদিকে লোকটাকে ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। নইলে আবার ওদের পেছনে লাগত অহিংশের ওই এজেন্ট।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এখনই যাবে মেয়েটার সাথে দেখা করতে। কিন্তু আচমকা বৃষ্টি নামায় আর বেরোয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টি, ভাবা যায়! প্রীতম সাহেবের উইল থেকে জানা গিয়েছে, সব সম্পত্তি তিনি একটা ট্রাস্ট ফান্ডে দিয়ে গিয়েছেন। সেই ফান্ড চালাবার দায়িত্ব দিয়েছেন নিয়তির হাতে। বান্ধবীর রক্তমাখা হাতের দান নিতে চায়নি মেয়েটা। কিন্তু যখন বুঝতে পারল, অন্তত এই টাকাগুলো দিয়ে অনেক মানুষের উপকার করতে পারবে–তখন আর মানা করেনি।

যাই হোক প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা। দ্বিধা কাজ করছে তার মাঝে। সুন্দর সৌষ্ঠবটা যেন কিছু বলতে চায়। তবে সেটা কী–তা জানার জন্য রাফসানের ওর দিকে তাকাবার দরকার নেই। মেয়েটির চোখের তারায় খেলতে থাকা প্রচণ্ড আবেগ সেসব কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এক হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলো পাখির মতো কাঁপতে থাকা নিয়তিকে। চওড়া বুকের মাঝে যেন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেল মেয়েটি। থুতনিতে আঙুল স্পর্শ করে

মেয়েটির মুখটা ওপরে তুলে আনল রাফসান। বৃষ্টির ফোঁটা সুন্দর নাকটার ওপরে হীরক খণ্ডের মতো ঝুলে আছে, নরম ঠোঁটগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে নিবিড় স্পর্শে। রাগে গা যেন জ্বলে উঠল রাফসানের, ওই ঠোঁট জোড়াকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করার অধিকার আর কারও নেই। এমনকী বৃষ্টিরও না! হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা মুছে দিল রাফসান।

ফুলে আছে, রক্তিম আভা ধারণ করেছে নিয়তিরগুলো। যেন প্রিয়জনের বিরহে কাতর হয়ে উঠেছে কোনো অচিন পাখি! কিছু একটা বলার জন্য একবার মুখ খুলল মেয়েটা। আবার বন্ধ করে ফেলল।

হেসে ফেলল রাফসান। তারপর ঘরের ভেতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আম্মা, তোমার পুত্রবধূ এসেছে! বরণ করবে না?'

*

বিশেষ মিটিং বসেছে আজ।

অহিংশের সুপ্রিম কমিটির একজন আত্মহত্যা করেছেন। সেজন্যই এই মিটিং। আজকে নতুন একজনকে পদন্নোতি দিয়ে সুপ্রিম কমিটির সদস্য বানানো হবে। এমন ঘটনা বারবার ঘটে না। শেষ ঘটেছিল প্রীতম চক্রবর্তীকে কাউন্সিলার বানাবার সময়। শুধু তাই নয়, সেই সাথে সদ্য ঘটা বিপর্যয়টা কী করে সামলানো যায়–তা নিয়েও দরকার আলোচনার।

জেনে হোক আর না জেনে, অনেকেই কাজ করে অহিংশের হয়ে। অহির অংশ–অহিংশ। সাপের এক মিশরীয় পূজারী থেকে জন্ম এই

সংগঠনের। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসেছে আজ এই অবস্থানে। জন-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার লক্ষ্যই একটা: অহিংশের রাজত্ব কায়েম করা।

ফাউন্ডিং ফাদার অরুণের কথা আজ অনেকেই জানে না। সুপ্রিম কাউন্সিলে এতদিন ছিল মাত্র দুইজন নীল রক্তের মানুষ। এরা দুজনেই ওয়াজেথের দুই ছেলের বংশধর। এক ছেলের বংশ শুরু করেছিল অহিংশের যাত্রা। আরেক ছেলের বংশ অনেক দিন পরে এসে যোগ দিয়েছে।

প্রীতম চক্রবর্তী জানতেন না, তারই আরেক জ্ঞাতিভাই এই সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য। আসলে বংশানুক্রমিকভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন বাকি চারজন কাউন্সিলার, পঞ্চম সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ফার্মাকোলজিস্ট। অন্য চার সদস্য একে-অন্যকে দেখেননি জীবনে।

ঘড়ি দেখলেন কাউন্সিলার, এখন একমাত্র তিনিই সরাসরি ওয়াজেথের বংশধর। সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্যদের নিজেদেরকে সেই দাবি করার যোগ্যতা নেই। হ্যাঁ, সেই আদি পিতার বংশধর হয়তো তাদের দুয়েকজন, কিন্তু সরাসরিভাবে নয়।

নিজ অফিসেই বসে আছেন তিনি, পরনে স্যুট-টাই। তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেই কারো। আলাদা একটা ক্যাবিনেট আছে তার, জরুরি জিনিসপত্র রাখার জন্য। সেখান থেকে আস্বাইহেক্সিয়ামের লকেটটা বের করে গলায় পরে নিলেন। আগে এটাকে শুধু পারিবারিক স্মৃতি হিসেবেই জানতেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন, এটার দাম কত বেশি!

ঘড়ি দেখলেন তিনি, নির্ধারিত সময়ের এখনও মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার পাশে। এখান থেকে ঢাকার,

বিশেষ করে মহাখালীর রাস্তা দিয়ে হাঁটা-চলায় ব্যস্ত মানুষদেরকে দেখতে তার ভালোই লাগে।

আচমকা তার ট্যাবে থাকা A বাটনটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। শুরু হতে যাচ্ছে মিটিং। তবে খেয়াল করেননি তিনি।

'অহিংশের জয় হোক।'

পরিচিত শব্দটা শুনে সম্বিত ফিরল তার। দ্রুত এসে বসলেন চেয়ারে, টেবিলের সামনে।

সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্য তিন সদস্যের অবয়বের দিকে তাকিয়ে হাসলেন সাজিদ রহমান। জানেন, ওরাও শুধু তার অবয়বই দেখতে পাচ্ছেন। চরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন তিনি।

'অহিংশের জয় হোক।'

সংযুক্তি

বইটি লেখার সময় বিভিন্ন উৎসের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু-কিছু জিনিস ব্যবহার করতে হয়েছে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই।

পদ্মপুরাণ: বইয়ের প্রাচীন সময়, অর্থাৎ ওয়াজেথের গল্প পুরোটাই বানানো। তবে চম্পক নগরী, চাঁদ সওদাগর এবং মনসা দেবীর উত্থান সংক্রান্ত অনেক তথ্য নেওয়া হয়েছে পদ্মপুরাণ থেকে।

সুন্দরবনের বর্ণনা: এই অংশটুকু পুরোপুরিই কল্পনা। টিয়ার চর বলে আসলেই একটা জায়গা আছে। কিন্তু তার আশপাশের চর, আসা-যাওয়ার বর্ণনা, খুলনা থেকে যাওয়া-আসা; এসবই কল্পনা।

আম্বাইহেক্সিয়াম: এই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা—**১২৬**। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি। ধারণা করা হয়, এই মৌল অনেক আগে হয়তো পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় বিকিরণ করতে-করতে বর্তমানে বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায়!

আহুরা মাজদা ও আস্তো ভিদাত: পারস্যের পুরাণ অনুযায়ী আস্তো ভিদাত হচ্ছেন প্রাণসংহরণের দেবতা। আর আহুরা মাজদা হচ্ছেন জরাথ্রুস্টের প্রচারিত ধর্মের প্রধান দেবতা বা ঈশ্বর। যেহেতু গল্পের চরিত্র ওয়াজেথ বড়ো হয়েছে পারস্যে, তাই তাদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

আয়ুর্বেদ: আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বা চিকিৎসা প্রণালীর ব্যাপারে যা-যা বলা হয়েছে বইতে, সবই প্রাথমিক ধারণা থেকে উদ্ভূত। আয়ুর্বেদ অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহার

করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি যে বইটির সাহায্য নিয়েছি সেটা পাবলিক ডোমেইন থেকে নেওয়া বই।

পৌরাণিক চরিত্র: খাণ্ডব দাহন ভারতীয় পুরাণের বেশ বিখ্যাত একটা ঘটনা। অগ্নিদেবের অরুচি মেটাবার জন্য খাণ্ডব দাহনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এ কাজে সাহায্য করেন অর্জুন এবং কৃষ্ণ। খাণ্ডব দাহনের সময় স্থানীয় নাগা বা নাগ সম্প্রদায়ের লোক সেখানে বাস করত যারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কাহিনির সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে বিধায় সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

***